কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের

৬

ডিটেকটিভ উপন্যাস



কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের

৬ ডিটেকটিভ উপন্যাস ১

৬টি উপন্যাসের সংকলন



অন্ধকারের বন্ধু
হেমেন্দ্র কুমার রায়
ছিন্নমস্তার মন্দির
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
তিব্বত ফেরত তান্ত্রিক
অখিল নিয়োগী
বিজয় অভিযান
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ছায়া কালো কালো
বুদ্ধদেব বসু
হারানো বই
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

KANCHANJANGHA SERIES
6 DETECTIVE NOVELS-I

Code No. 55K 21
Juvenile Literature
A Collection of Six Detective Novels
Price : Rs. 100.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel : 2350-4294/4295/7887

প্রথম সংস্করণ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ ১৪১৪

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স্
প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর
২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণসংস্থাপন :
লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-১১

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত
দাম ঃ ১০০ টাকা

অন্ধকারের বন্ধু



হেমেন্দ্র কুমার রায়



তারপর অনুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

অন্ধকারের বন্ধু—



অন্ধকারের বন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

হেমন্ত চৌধুরীকে আমি ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ মানুষ বলে মনে করে আসছি।

পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে আমরা দুজনে বরাবরই একসঙ্গে শিখেছি লেখাপড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত ওঠবার পরেও জীবনের যাত্রাপথে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়নি—সাধারণত যা হয়ে থাকে। তার কারণ, আমরা দুজনেই ছিলুম স্বাধীন।

আরো নানান দিকেই আমাদের দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আমরা দুজনেই ধনীর সন্তান এবং দুজনেই শৈশবে বাপ-মাকে হারিয়েছি। দেহচর্চার দিকে আমাদের দুজনেরই একান্ত ঝোঁক—কুস্তি, যুযুৎসু, 'বক্সিং' (সঙ্গে-সঙ্গে লাঠি তলোয়ার খেলা) কিছুই শিখতে বাকি রাখিনি—যদিও প্রতিযোগিতায় বরাবরই হেমন্ত হয়েছে প্রথম এবং আমি হয়েছি দ্বিতীয়। আমরা দুজনেই দেশে-দেশে বেড়াতে ভালোবাসি এবং এই যৌবনেই য়ুরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। আমরা দুজনেই বিবাহ করিনি এবং ঘটকরা বাড়ির চৌকাঠ মাড়ালেই ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে যাই।

কিন্তু আমাদের দুজনের দিন ও সময় কাটাবার উপায় একরকম নয়। কারণ, হেমন্ত করে শখের গোয়েন্দাগিরি, আর আমি করি শখের সাহিত্য-সাধনা।

আমার সাহিত্য-সাধনার কথা নিয়ে এখানে কিছু বলবার দরকার নেই। আমি আজ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি অন্য কারণে।

গোয়েন্দাগিরিতে আজকাল হেমন্ত এমন সুনাম কিনেছে যে, আমার মুখ থেকে নানা লোকে তার কাহিনি শোনবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এজন্যে হেমন্তেরও কাছে অনেকে ধর্ণা দিতে ছাড়েন না। কিন্তু একদিক দিয়ে সে হচ্ছে বেজায় লাজুক—নিজের বাহাদুরির কথা নিজের মুখে জাহির করতে রাজি হয় না কিছুতেই। তখন সবাই আমাকে নিয়ে টানাটানি করেন এবং আমাকেও নিরুপায় হয়ে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। কিন্তু বারে-বারে নানা জনের কাছে মুখে-মুখে হেমন্তের কত গল্প আর বলব? তাই এবার স্থির করেছি, লোকের আগ্রহ নিবারণের জন্য হেমন্তের কীর্তি-কাহিনি ছাপার হরফে প্রকাশ করব একে-একে।

যন্ত্রপাতি এবং দেওয়ালের তাকে-তাকে সাজানো হরেকরকম তরল ও চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ-ভরা কাচের জার, শিশি ও বোতল।

আর-একখানি ঘর হচ্ছে একসঙ্গে তার বৈঠকখানা ও লাইব্রেরি। তার চারিদিকের দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বড়-ছোট, রোগা-মোটা কেতাব-ভরা আলমারি এবং মাঝখানে ধব্‌ধবে চাদর-বিছানো নরম বিছানা-ভরা চৌকি, চেয়ার, সোফা, কৌচ্, ছোট-ছোট টেবিল প্রভৃতি।

সেদিন বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি কৌচে বসে হেমন্ত কোলে-পাতা একখানা বইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চেয়ারে বসে পড়ে বললুম, "কি হে ভায়া, অত মন দিয়ে কি বই পড়া হচ্ছে?"

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, "বই পড়ছি না ভাই, ছবি দেখছি! এখানা হচ্ছে 'ক্যালকাটা পুলিশ জার্নাল'।

পুলিশ জার্নালের ছবি? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কোনো স্যাঙাতের—অর্থাৎ চোর কি খুনির চেহারা?'

"না রবীন, তোমার রসিকতা মাঠেই মারা গেল। এ-ছবি দেখে আমি এক পৃথিবীবিখ্যাত অমর শিল্পীর কথা ভাবছি।"

"কি সর্বনাশ! পুলিশের শনির দৃষ্টি আজকাল কি শিল্পীদেরও ওপরে গিয়ে পড়েছে?"

"রবীন, পুলিশের ওপরে অকারণে তুমি এতটা নির্দয় হোয়ো না। আর পুলিশের দৃষ্টি শিল্পীদের ওপরে পড়বেই-বা না কেন, শুনি? শিল্পী মানেই কি সাধু? ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি ভিলন কি চোর আর খুনি ছিলেন না? ইতালির সিজিস্‌মোন্দো মালাতেসার নাম শুনেছ?"

"না। কে তিনি?"

"কবি, পণ্ডিত, ললিত-কলার উপাসক। মধ্য যুগে তার জন্ম। কিন্তু তার মতো দুর্নীতিপরায়ণ ক্রিমিনাল তুমি কলকাতায় কোনো কফিখানা বা বস্তি খুঁজলেও পাবে না। ও-সব কথা যাক্। আমি এখন কি দেখছি, জানো? তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান বাদ্‌শার পাঞ্জা।"

"দেখি।" বইখানি হাতে নিয়ে দেখলুম, একখানি ছবিতে ছাপা সম্রাট সাজাহানের ডানহাতের ছাপ।

হেমন্ত বললে, "সেকালে মোগল-সাম্রাজ্যের সমস্ত মূল্যবান্ কাগজ-পত্রের ওপরে সম্রাটের পাঞ্জার ছাপ থাকত। কারণ, মোগলরা জানত, সিলমোহর বা হাতের সই জাল হতে পারে, কিন্তু পাঁচ-আঙুলসুদ্ধ করতল বা পাঞ্জার ছাপ জাল হওয়া অসম্ভব।

পৃথিবী কোনো দুজন মানুষের পাঞ্জার ছাপ এক-রকম হতে পারে না। বাংলা পুলিশের স্যর উইলিয়ম হার্সেল সাহেব পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে আসামীদের আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এই সেদিন—১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। আজ এই পদ্ধতির আদর পৃথিবীর দেশে-দেশে। কিন্তু ভারতে এই পদ্ধতির জন্ম বহুকাল আগে। কেবল মোগলদের পাঞ্জার ছাপ নয়, হিন্দুরাও প্রাচীনকাল থেকে দলিলের ওপরে নাম সইয়ের বদলে আঙুলের টিপ-সই করে আসছে। সুতরাং আধুনিক পুলিশের আবিষ্কারের ভেতর কোনোই বাহাদুরি নেই।....

"কিন্তু রবীন, সাজাহান বাদ্‌শার পাঞ্জার ছাপ দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?"

"হচ্ছে বৈকি! মনে হচ্ছে, এ হাতের ছাপ দেখলে সাজাহানকে স্মরণ হয় না!"

"ঠিক বলেছ। দিল্লি-আগ্রার নানা প্রাসাদে, মসজিদে, স্মৃতিসৌধের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে যে শিল্পী সাজাহানের সৌন্দর্য-প্রীতি দেখলে অভিভূত হয়ে যেতে হয়, এই কি তার নিজের হাতের ছাপ? আধুনিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের আঙুলের গড়ন দেখলে তার প্রকৃতি আর পেশা বোঝা যায়। কিন্তু সাজাহানের আঙুলের গড়ন দেখ! শিল্পীর আঙুলের গড়ন এ-রকম হওয়া উচিত নয়—যে-কোনো সাধারণ লোকের হাতের ছাপ এ-রকম হতে পারে। বসে বসে এই কথাই ভাবছিলুম।"

পুলিশ জার্নালখানা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমি বললুম, "ভাই, উত্তরদিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দি। এই দুর্জয় শীতের ওপরে কাল আবার বৃষ্টি হয়ে ঠান্ডা আরও বেড়ে উঠেছে। চট্ করে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দাও।"

কৌচের উপরে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে হেমন্ত বললে, "তা যেন দিচ্ছি! কিন্তু দুর্জয় শীতকে যদি এতই ভয়, তবে আজ তুমি গঙ্গাপার হয়ে বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলে কেন?"

চমৎকৃত হয়ে বললুম, "একথা তুমি কেমন করে জানলে? কেউ বলেছে বুঝি?"

"তুমি তো সিধে ওপার থেকে এপারে নেমেই ধুলোপায়ে আমার বাড়িতে আসছ! এর মধ্যে খবর আর কে দেবে? কেমন যা বলছি, সত্যি কি না?"

"হ্যাঁ ভাই, সত্যি। কিন্তু আমি কোনো বাগানে বেড়াতে যাইনি! তুমি তো জানো, বেলুড়ে আমার ভগ্নীপতি থাকেন। তাঁর অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। তবে তাঁর বাড়ির সামনে একটা বেশ বড় বাগান আছে বটে! কিন্তু এ-সব কথা তোমার তো জানবার নয়, তুমি তো কখনো সেখানে যাওনি।"

"না, তা যাইনি। কিন্তু তুমি তো এ-কথা জানো বন্ধু, সর্বদা আমার চোখ খোলা রাখি বলে কোথাও না গিয়েও আমি অনেক কথাই বলতে পারি।"

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, কোন্ সূত্র ধরে হেমন্ত আমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে পারলে? নিজের জামার বোতাম-ঘরে যে 'কার্নেশান্' ফুলটি গুঁজে রেখেছিলুম, হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলুম, হেমন্তের আবিষ্কারের মূল আছে এই ফুলটিতেই।

হেমন্ত অর্ধমুদ্রিত চোখে আমার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল! হাসতে-হাসতে যেন অন্তর্যামীর মতোই বললে, "না, বন্ধু না। তুমি যা ভাবছ, তা নয়! জামার বোতাম-ঘরের ঐ ফুলটি তুমি কলকাতার, কোনো বন্ধুর বাড়ি বা ফুলের দোকান থেকেও সংগ্রহ করতে পারতে! ঐ দেখেই আমি এত কথা আন্দাজ করিনি। তোমার জুতোর দিকে তাকালেই দেখবে, ওর নীচের দিকটায় লেগে রয়েছে ভিজে এঁটেল মাটি। ও-রকম মাটি কলকাতার কর্দমাক্ত পথেও পাওয়া যায় না! দেখলেই বোঝা যায়, ও হচ্ছে গঙ্গামাটি! জুতো পরে তুমি নিশ্চয়ই স্নান করবার জন্যে গঙ্গাগর্ভে নামোনি। সুতরাং আন্দাজে বুঝলুম, তুমি নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হয়েছ আর ভাটার সময় বলে নৌকা ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছ ঘাট থেকে খানিক দূরে, গঙ্গামাটির ওপরেই। তোমার বোতাম-ঘরের ফুলটি খুব তাজা রয়েছে, সুতরাং বুঝতে পারলুম, ওটি তুমি কলকাতা থেকে সঙ্গে করে ওপারে নিয়ে যাওনি, তাহলে এতক্ষণে ফুলটি অল্পবিস্তর নেতিয়ে পড়ত। অতএব ফুলটিও তুলেছ অল্পক্ষণ আগে, গঙ্গার ওপারে গিয়েই—খুব সম্ভব কলকাতায় ফেরবার সময়। আর বিলাতি মর্সুমী-ফুল 'কার্নেশান্' তো ওপারের পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ফোটে না, সুতরাং ধরে নিলুম, ওটি চয়ন করেছ তুমি কোনো বাগান থেকেই। তোমার জুতোর গঙ্গামাটি এখনো শুকোবার সময় পায়নি। ঐ ভিজে মাটি দেখেই বুঝেছি, তুমি নৌকা থেকে নেমেই সিধে আমার বাড়িতে এসে উঠেছ! দেখছ বন্ধু, একটু চেষ্টা করলেই মানুষ দেখে কত কথা আবিষ্কার করা যায়?"

আমি বললুম, "তুমি আশ্চর্য লোক, হেমন্ত! আমার সঙ্গে অনর্গল গল্প করতে-করতে এত খুঁটিনাটি লক্ষ আর সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা করেছ।"

হেমন্ত বললে, "সবই অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। আর মানুষের মন আর মুখ এক নয়। সে মুখে যখন এক কথা বলে, তার মন তখন অন্য কথা ভাবতে পারে।"

আমি বললুম, "কিন্তু চা কই—আমার চা?....এই মধু! জলদি এক কাপ চা নিয়ে আয়!"

মধু হচ্ছে হেমন্তের চাকরের নাম।

হেমন্ত বললে, "দালানে পায়ের শব্দ শুনছি। যখন খবর না দিয়েই আসছে, নিশ্চয় তখন চেনা লোক।"

বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন সতীশবাবু এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি ভদ্রলোক—পরনে তাঁর কোট-পেন্টালুন।

"এই যে সতীশবাবু! আসুন, আসুন" বলেই হেমন্ত জিজ্ঞাসু চোখে পিছনের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালে।

সতীশবাবু বললেন, "ওঁকে চেনেন না বুঝি? উনি হচ্ছেন এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ এ. দত্ত!"

"মিঃ এ. দত্ত? অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত? নমস্কার, নমস্কার! সতীশবাবু, উনি তো শুধু ডাক্তার নন, উনি যে রসায়নশাস্ত্র নিয়েও গবেষণা করেন, ইংরেজি কাগজে প্রবন্ধ লেখেন! মিঃ দত্ত, এই কালকেই একখানি পত্রিকায় মানুষের দেহের ওপর Butyl chloride-এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলুম।"

সতীশবাবু বললেন, "আপনি এত খবরও রাখেন!"

মিঃ দত্ত লজ্জিতভাবে বললেন, "হেমন্তবাবুর মতো পণ্ডিত লোকের মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে আমি গর্ব অনুভব করছি!"

হেমন্ত অট্টহাস্য করে বলে, "আমি আবার পণ্ডিত নাকি? মোটেই নয়—মোটেই নয়! জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি খালি নুড়ি কুড়োবার চেষ্টা করি! তা, আমার পোড়াকপালে নুড়িও সহজে জোটে না! ওকি, আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন, বসুন—ওরে মধু, আরো কাপ দুয়েক চা আন্ রে!"

সতীশবাবু ও মিঃ দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

এখানে সতীশবাবুর একটুখানি পরিচয় দরকার। সতীশবাবু হচ্ছেন কলকাতা পুলিশের একজন নাম-করা ইন্‌স্পেক্টার এবং হেমন্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমতো বন্ধুত্বে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন এবং অপরাধতত্ত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে যান। অনেক সাধারণ পুলিশের লোকের মতো নিজেকে তিনি একজন সবজান্তা ও মস্ত-বড় মনুষ্য-রত্ন বলে বিবেচনা করেন না। কোনো জটিল মামলা হাতে পেলে, হেমন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে কুণ্ঠিত হন না একটুও।

চায়ের বারকোশ হাতে করে মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, লিপ্টনের 'গ্রিন্-লেবেল' চায়ের লোভে আজ আমি এখানে আসিনি। আমি মহাসমস্যায় পড়েছি, তাই এসেছি আপনার কাছে সুপরামর্শ নিতে।"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, "সুপরামর্শ দেওয়া আর দাবা-বোড়ের ওপর চাল দেওয়া দুইই খুব সহজ। সুতারং সুপরামর্শ চেয়ে আপনাকে হতাশ হতে হবে না!"

সতীশবাবু চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, "না হেমন্তবাবু, ব্যাপারটাকে আপনি হাল্‌কাভাবে নেবেন না। আমার থানার এলাকায় শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি খুন হয়েছেন আর চুরি গিয়েছে আশি হাজার টাকা।"

হেমন্ত সোজা হয়ে বসে বললে, "কে খুন হয়েছে আর কার টাকা চুরি গিয়েছে?"

"হত ব্যক্তির নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। টাকা চুরি গেছে তাঁরই।"

"হ্যাঁ, ও-নাম আমি শুনেছি বটে। তিনি তো যদুগোপাল বসু স্ট্রিটে থাকতেন?"

"হ্যাঁ। খুনি ধরা পড়েনি।"

"কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি?"

"সূত্রও পেয়েছি কিছু কিছু, কিন্তু এত এলোমেলো যে, কাজে লাগাতে পারছি না। সন্দেহ করবার মতো লোকও পেয়েছি, তবু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।"

হেমন্ত আবার কৌচের উপর পা তুলে কুশনের উপর হেলে পড়ল। তারপর দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, "তাহলে আগে সব কথা শুনি। মিঃ দত্ত, চোখ মুদেছি বলে ভাববেন না, আমি ঘুমোবার ফিকিরে আছি। সতীশবাবু আমার অভ্যাস জানেন, চোখ মুদলে আমার শোনবার আর চিন্তা করবার শক্তি দ্বিগুণ হয়ে উঠে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যাকাহিনি

সতীশবাবু বলতে লাগলেন ঃ

"মতিলাল মুখোপাধ্যায় খুব ধনী লোক। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর টাকা জমা আছে, তাছাড়া, কলকাতায় তাঁর বড়-বড় বাড়িও আছে অনেকগুলো।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি নিঃসন্তান। বছর-দুই আগে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে। মতিবাবুর এক ভগ্নে আছেন, তাঁর নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে মতিবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, ইদানিং তিনি 'ক্রনিক্' অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পারিবারিক-চিকিৎসক হচ্ছেন ডাক্তার এ. দত্ত—যিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। মিঃ দত্ত কেবল মতিবাবুর চিকিৎসক নন, তাঁর বিশেষ বন্ধুও। মতিবাবু লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে মোটেই ভালোবাসতেন না, এত ধনী হয়েও তাঁর বন্ধুর সংখ্যা তিন-চার জনের বেশি নয়। ওঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মিঃ দত্ত। কোনো কোনো দরকারী বিষয় নিয়ে পরামর্শের দরকার হলে মতিবাবু আগে মিঃ দত্তকে আহ্বান করতেন।

প্রাচীন বয়সে স্ত্রীর শোকেই হোক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্যই হোক, কিছুকাল থেকে মতিবাবুকে নানারকম বাতিকে ধরেছিল।

কলকাতার বাড়িগুলো তিনি একে-একে বিক্রি করে ফেলেছিলেন। সেই বাড়ি-বিক্রির টাকা দিয়ে কিনে রাখছিলেন কোম্পানির কাগজ।

গতকল্য বৈকালেও একখানা বাড়ি বিক্রি করে তিনি আশি হাজার টাকা এনে নিজের শোবার ঘরের সিন্দুকের ভিতরে পুরে রেখেছিলেন। হাজার টাকার আশিখানা নোট।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই মতিবাবুর আর এক খেয়াল হয়েছিল। কিন্তু সেটা বলবার আগে তাঁর বাড়ির কিছু বর্ণনার দরকার।

মতিবাবুর বসত-বাড়িখানা মস্ত বড়—তার তিনটে মহল। প্রথম—অর্থাৎ সদর মহলটা যদুগোপাল বসু স্ট্রিটের উপরেই। সর্বশেষের তৃতীয় মহলের পিছনে আছে কালী বিশ্বাস লেন। সেদিকেও একটা দরজা আছে।

এখন তাঁর খেয়ালের কথা বলি। মতিবাবু আগে থাকতেন প্রথম মহলে, কিন্তু স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকেই বড়-রাস্তার ধার ছেড়ে তৃতীয় মহলে এসে বাস করতেন। তিনি অন্য কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না, যে তিন-চারজন বিশেষ বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, তাঁরা আসতেন ঐ কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে, তৃতীয় মহলে। এদিকেও আলাদা একটা সিঁড়ি আছে।

তৃতীয় মহলে ঢোকবার নীচেকার দরকায় কোনো দ্বারবান থাকে না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই মতিবাবুর ঘরের সামনে যে বারান্দা বা দালান পাওয়া যায়, সেখানে দিনরাত বাঁধা থাকে প্রকাণ্ড এক মাস্টিফ কুকুর। তাকে এড়িয়ে মতিবাবুর ঘরে ঢোকাবার উপায় নেই। সে কেবল কামড়ায় না, অচেনা লোক দেখলেই বিষম চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তোলে।

বাড়ির প্রথম দুই মহলে বাস করেন মতিবাবুর ভাগিনেয় বিনোদলাল ও অন্যান্য কয়জন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

মাতুলের সম্পত্তির অল্পবিস্তর তত্ত্বাবধান ছাড়া বিনোদবাবু আর কোনো কাজ করেন না। তবে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, বিনোদবাবুর ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে যথেষ্ট, এবং গোপনে এই নেশায় মেতে তিনি অনেক টাকা নষ্ট করেছেন, ফলে বাজারে তাঁর ধারও সামান্য নয়!

তাঁর মাতুল এ-সব কথা জানতেন না, কিন্তু কথাগুলো জানতে পারেন আমাদের এই মিঃ দত্ত। তিনি এ-পরিবারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, কাজেই সব জেনেশুনেও চুপ করে থাকতে পারলেন না, মতিবাবুর কানে সব কথা তোলেন।

শুনেই তো মতিবাবু মহা ক্ষাপ্পা!—একেই তো তিনি বেজায় কড়া লোক, তার উপরে জীবনে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন যারা 'রেস' বা জুয়া খেলে তাদের। তখনি বিনোদলালের তলব হল। মামার কাছ থেকে বিষম বকুনি ও গালাগালি খেয়ে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি মতিবাবুকে দু-এক কথা শুনিয়ে দিলেন। মতিবাবু রেগে অজ্ঞান হয়ে চিৎকার করে বললেন, "জুয়াড়িকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সাও দেব না! আমি নতুন উইল করব।"

এই ব্যাপারটা হয়ে গেল কাল দুপুর-বেলায়। তারপর মতিবাবু বেরিয়ে অ্যাটার্নি-বাড়িতে যান। সেখান থেকে আশি হাজার টাকা নিয়ে বৈকালে ফিরে আসেন।

সন্ধ্যার পর তাঁর শরীর কিছু খারাপ হয়। তিনি একটু সকাল-সকালই বিছানায় আশ্রয় নেন এবং শোবার আগে নিজের হাতে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন। আপনারা জানেন, কাল সন্ধ্যায় অকাল বর্ষা নেমেছিল। বৃষ্টি হয় ঘণ্টাখানেক ধরে।

বৃষ্টি থামে রাতে ন'টার সময়। বাড়ির নিয়মমতো রাত সাড়ে-দশটার সময় দারোয়ান এসে কালী বিশ্বাস লেনের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

আজ সকালে দেখা যায়, মেঝের উপরে মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরুবার সব দরজাই বন্ধ।

খবর পেয়ে আমি গিয়ে যা দেখলুম তা হচ্ছে এই ঃ

বিনোদলাল বালকের মতো অধীর হয়ে কাঁদছেন আর মিঃ দত্ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন।

মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ঠিক খাটের তলায়। তাঁর মুখের উপরে দারুণ যাতনা ও ভয়ের চিহ্ন—সেই সঙ্গে রয়েছে বিষম বিস্ময়েরও আভাস।

তাঁর গলায় উপরে একটা নীল দাগ। বিছানার উপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। মতিবাবুর দেহের পাশে ছড়ানো রয়েছে একটা ভাঙা কাচের গেলাসের ছোট-বড় টুক্‌রো—কোনো কোনো কাচ রক্তাক্ত।

আর একটা আশ্চর্য জিনিসও পেয়েছি। খুব পুরু পশমের একটা দস্তানা!

ঘরের মেঝেতে কাদা-মাখা জুতোর দাগ আছে—দু'রকম জুতোয়। কিন্তু কোনো দাগ এত স্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয় যে, নিখুঁত মাপ বা ছাঁচ নেওয়া যেতে পারে। তবে দুজন লোক যে বৃষ্টির পরে এই ঘরের ভিতরে এসেছিল, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই যে একজন লোক দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, তার একজোড়া জুতোর স্পষ্ট ছাপ দেখেই সেটা অনুমান করা যায়। তার খাঁজ-কাটা সোলের ছাপ দেখলে আরো বোঝা যায়, সে এসেছিল রবারের জুতো পরে। ঘরের মেঝেতেও এমনি রবারের জুতোর আংশিক ছাপ আছে। সুতরাং

বুঝতে দেরি লাগে না যে, প্রথম একজন ঘরে ঢোকবার পরে সেও ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। দরজার বাইরেকার এই রবারের জুতোর ছাপ আমি নিয়েছি।

মতিবাবুর মৃতদেহ দেখলে মনে হয়, কেউ বা কারা গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছে।

তাঁর লোহার সিন্দুক খোলা, মতিবাবুর নিজের চাবি দিয়েই সেটা খোলা হয়েছে। ভিতর থেকে কেবল আশি হাজার টাকার নোটই অদৃশ্য হয়নি। মতিবাবুর টাকা খাটানোর ঝোঁকও ছিল। হ্যান্ডনোটেও তিনি টাকা ধার দিতেন। সিন্দুকের ভিতরে কতকগুলো হ্যান্ডনোটও ছিল, সেগুলোও আর নেই। আর পাওয়া যাচ্ছে না মতিবাবুর পকেট-বইখানা। তাঁর রোজ ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে?

খুনি যে বাহির থেকে আসেনি তার প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমত বাড়ির সব বাইরের দরজাই ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। দ্বিতীয়ত বারান্দায় মাস্টিফ-কুকুরটা কোনো সাড়াশব্দ দেয়নি—তার মানে, খুনি তার অচেনা নয়।

বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কথা ছেড়ে দি। পুরুষ-আত্মীয় আছে মোট চারজন। বিনোদলাল, একজন প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো, একজন বাতে-পঙ্গু লোক, আর একটি পনেরো বছরের ছোকরা। বাকি সবাই চাকর-দ্বারবান প্রভৃতি। যদি ধরা যায়, টাকার লোভে তারা মনিবকে খুন করেছে, তাহলেও একটা প্রশ্ন জাগে। খুনিদের পায়ে জুতো ছিল, চাকর-দ্বারবানরা বাড়ির ভিতরে জুতো পরে না, পরলেও চুপি-চুপি কাজ সারবার জন্যে তারা খালি পায়েই আসত। তারা ডায়ারি চুরি করত না, আর দস্তানাও পরত না।

বাড়ির ভিতর মতিবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হবেন কেবল বিনোদলালই। খুনের দিনই তাঁর সঙ্গে মতিবাবুর ঝগড়া হয়েছিল এবং তাঁর মামা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন বলে শাসিয়েছিলেন। তাঁর অনেক টাকা ধার, নগদ টাকার বিশেষ দরকার। তাঁকে অনায়াসে সন্দেহ করা যায়। হয়তো তাঁর আহ্বানেই মতিবাবু নিজে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কুকুর তাঁকে চেনে, তাই চ্যাঁচায়নি।

কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনির একজন সঙ্গীও হাজির ছিল। সে লোকটি কে? সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখেছি, রবারের জুতোর সঙ্গে কারুর মাপ মেলে না। রবারের জুতোও বাড়ির কারুর নেই।

হেমন্তবাবু, এই পর্যন্ত আমার কথা। এখন আপনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন। মিঃ দত্তকে সঙ্গে করে এনেছি, তিনি অনেক বিষয়ে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন মতিবাবুর পুরোনো বন্ধু!"

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, "লাশ কি শব-ব্যবচ্ছেদাগারে চালান করে দিয়েছেন?"

"না। ইচ্ছে করলে এখনো ঘটনাস্থলেই লাশ দেখতে পারেন।"

হেমন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। রবীন তুমি এস।"

আমি হচ্ছি সাহিত্যিক মানুষ। লাশ-ফাশ দেখলে আমার প্রাণ হাঁসফাঁস করে, নাড়ি ছাড়ি-ছাড়ি হয়! তবু হেমন্তের কথা এড়াতে পারলুম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটনাস্থলে

আমরা কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলুম।

হেমন্ত আগে সমস্ত বাড়িখানা ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে দেখলে। তারপর মতিবাবুর শয়ন-গৃহের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবারের জুতোর-ছাপটা লক্ষ করলে। মাস্টিফ- কুকুরটা আমাদের দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং মাঝে-মাঝে গর্জন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম মতিবাবুর মৃতদেহটা।

হেমন্ত লাশের পাশে বসে পড়ে বললে, "মিঃ দত্ত, আপনি তো ডাক্তার। আপনার কি বিশ্বাস? মতিবাবুকে কেউ কি গলা টিপে মেরে ফেলেছে?"

"তা ছাড়া আর কি বলি বলুন?"

"তাহলে ওঁর গলার ওপরে ঐ নীল দাগটা কিসের? ওটা তো আঙুলের দাগ নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন ওটা কোনো স্বচ্ছ ব্যান্ডেজ! আঙুলের দাগ ও-রকম হয় না।"

"আমার বোধ হয়, আঙুলের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। ওটা কালশিরার দাগ।"

"সম্ভব। শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পরেই টের পাওয়া যাবে। আচ্ছা সতীশবাবু, বাংলাদেশেও শীতকালে কোনো বাঙালি হাতে দস্তানা পরে নাকি?"

সতীশবাবু বললেন, "আমি তো জানি, পরে না। অন্তত এ-বাড়ির কেউ কোনোদিন দস্তানা ব্যবহার করেনি বলেই জেনেছি।"

মেঝে থেকে দস্তানাটা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, "অতিরিক্ত পুরু সাদা পশমের দস্তানা। এর ওপরেও রক্তের দাগ রয়েছে। হুঁ, গেলাস-ভাঙা কাচে দস্তানার খানিকটা কেটে গিয়েছে দেখছি। কাচের গেলাসটাও ভাঙা, গেলাসের টুকরোর ওপরে রক্তের দাগ, আশ্চার্য!"

সতীশবাবু বললেন, "কেন, আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কি কারণে?"

হেমন্ত আগে লাশটাকে একটু তুলে তার তলাটা পরীক্ষা করলে। তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কাচের গেলাসটা কি মতিবাবুর?"

"হ্যাঁ, ঘরে ঐ কোণে গেলাসটা কুঁজোর মুখে বসানো থকত। দেখুন না, কুঁজোর মুখ এখন আদুড়।"

বিছানার ওপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, খুনিদের সঙ্গে মতিবাবু কিছুক্ষণ যুঝেছিলেন। ঘরের আর কোথাও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। ধরুন, খুনিরা মতিবাবুর গলা টিপে ধরেছে, মতিবাবু ঝটাপটি করতে-করতে মেঝের ওপরে এসে কাবু হয়ে পড়লেন—কিন্তু গেলাসটা ভেঙেছিল তার আগেই, কারণ লাশের পিঠের তলাতেও ভাঙা কাচ রয়েছে।.... কিন্তু গেলাসটা ভাঙল কেন? আর গেলাসের কাচে খুনির হাতই-বা কাটল কেন? গেলাসটা তো আর হঠাৎ জ্যান্তো হয়ে পাখির মতো পক্ষ বিস্তার করে কুঁজোর মুখ ছেড়ে খুনিদের আক্রমণ করতে আসেনি? যদি বলি, ধস্তাধস্তির সময়ে খুনিদের কারুর হাতে গেলাসটা ছিল, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, গলা-টেপার সঙ্গে কাচের গেলাসের সম্পর্ক কি?"

সতীশবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ঠিক। হেমন্তবাবু, আপনি একটা মস্ত-বড় সূত্র আবিষ্কার করেছেন! এ কথা তো এতক্ষণ আমি ভেবে দেখিনি!"

হেমন্ত বললে, "গেলাসের নীচের দিকটা এখনো অটুট আছে দেখছি। কিন্তু ওর ভিতরটা একেবারে শুকনো। তবু ওটাকে একবার পুলিশের পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। হয়তো ওর মধ্যে কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। ওর গায়ে খুনির আঙুলের ছাপও থাকা সম্ভব।"

সতীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা আমিও আগে-থাকতেই স্থির করেছি।"

"আর, এই দস্তানাটা কি আমাকে আজকের মতো ধার দিতে পারেন?"

"তা নিন না। কিন্তু কেন?"

"আমি দস্তানাটার রক্ত পরীক্ষা করব?"

মিঃ দত্ত কৌতূহলী স্বরে বললেন, "তাতে কোনো লাভ হবে নাকি?"

"হবে বৈকি, মিঃ দত্ত। আপনি ডাক্তার, এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, medico legal মতানুসারে মানুষের দেহের রক্ত মাত্র চার গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। আপাতত আমি পরখ করে দেখতে চাই, দস্তানার রক্ত কোন্ গ্রুপে বা শ্রেণিতে পড়ে। তাহলে খুনি গ্রেপ্তার হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বলা যেতে পারবে, এ রক্ত তারই দেহ থেকে বেরিয়েছে কিনা।"

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আমি জানতুম না যে, এদেশে গোয়েন্দার কাজে কেউ এমন বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আপনি অবাক করলেন দেখছি। আজ বড় দুঃসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আরো ভালো করে আলাপ করতুম।"

হেমন্ত বিনীতভাবে বললে, "আমি খুব রঙিন ফানুস নই মিঃ দত্ত, দয়া করে আমাকে এত-বেশি আকাশে তুলবেন না। আর আমার সঙ্গে যদি ভালো করে আলাপ

করতে চান, তাহলে অধীন সর্বদাই আপনার দ্বারদেশে হাজির থাকতে রাজি আছে।"

মিঃ দত্ত হেমন্তের একখানা হাত ধরে বললেন, "দ্বারদেশে নয় হেমন্তবাবু, একেবারে আমার দোতলার ড্রাইংরুমে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে চাই। কাল বৈকালেই আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, রাজি তো?"

"এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার ঠিকানা তো আমি জানি না!"

"দশ নম্বর পরেশ মিত্র লেন। এখান থেকে ছ-সাত মিনিটের পথ।"

সতীশবাবু বললেন, "মিঃ দত্ত বেশ লোক যা হোক্! আমরা পড়লুম বাদ! এক যাত্রায় পৃথক ফল।"

মিঃ দত্ত বললেন, "নিশ্চয়ই নয়! আপনিও যাবেন, রবীনবাবুও যাবেন!"

আমার কিন্তু গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল। সামনে পড়ে রয়েছে একটা খুন-করা মানুষের মৃতদেহ, বাড়ির ভিতর থেকে আসছে আত্মীয়দের বুক-চাপা কান্না—এইখানে দাঁড়িয়ে কিনা নিমন্ত্রণের কথা! তারপরেই বুঝলুম, মিঃ দত্ত হচ্ছেন ডাক্তার—মড়া কেটে-কেটে আর লোকের মৃত্যু দেখে-দেখে তাঁর মন হয়ে গেছে কঠিন; এবং সতীশবাবু হচ্ছেন, পুলিশের পুরনো লোক—জীবনে বহু নিহত মানুষের ভয়াবহ দেহ ঘেঁটে-ঘেঁটে এসব দৃশ্য তাঁর চোখে হয়ে গেছে নেহাৎ সহজ, সুতরাং তাঁরও মনের বিকার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন শ্মশানের মুদ্দোফরাসরা—মৃতদেহ ভস্মসাৎ হলে পর তাদের তো চিতার আগুনেই হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রাঁধতে দেখা যায়।

মিঃ দত্ত নিজের হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সাড়ে আটটা বাজল! সতীশবাবু, আর তো আমার থাকবার উপায় নেই—নটায় ভেতরেই আমাকে এক রোগীর বাড়ি যেতে হবে। হেমন্তবাবু, আমাকে কি আর আপনার দরকার আছে?"

হেমন্ত বললে, "না মিঃ দত্ত, আপনি অনায়াসেই যেতে পারেন।"

মিঃ দত্ত প্রস্থান করলেন। হেমন্ত খানিকক্ষণ লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করলে। তারপরে বললে, "সতীশবাবু, এর চাবি কোথায়?"

"চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় খুনির কাছে আছে। একগোছা চাবি। বাড়ির ভেতরের লোকই যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত আছে, এও তার আর একটা প্রমাণ। বাইরের খুনি চাবি নিয়ে যাবে কেন? যে চাবি নিয়ে গেছে, নিশ্চয় তার আরো কোনো বদ্‌মতলব আছে।"

হেমন্ত কিছু বললে না। নীরবে ঘরের মেঝের একদিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর উঠে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে এক টুক্‌রো শুক্‌নো কাদার মতন কি কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা পরীক্ষা করে বললে, "সতীশবাবু, বলুন দেখি এটা কি?"

"এক টুক্‌রো শুক্‌নো কাদা!"

"হুঁ। ভিজে পথ দিয়ে হাঁটবার সময়ে খুনিদের কারুর জুতোর গোড়ালি আর 'সোলের' খাঁজে এই কাদাটা লেগে গিয়েছিল। তারপর মতিবাবুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে কাদার টুক্‌রোটা গোড়ালি আর 'সোলের' খাঁজ থেকে খসে পড়েছে।"

আমি বললুম, "তুমি কি করে জানলে যে, ওটা আমাদেরই কারুর জুতো থেকে খসে পড়েনি?"

"দুটি কারণে। প্রথমত আজ সকাল থেকে শহরের পথ-ঘাট শুক্‌নো খট্‌খটে! এ-ঘরে যারা ঢুকেছে তাদের কারুকেই কর্দমাক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, আমি খালি-চোখেই যতদূর দেখছি, এই কাদার ভেতরে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে।"

সতীশবাবু বললেন, "খুনিদের একজনের পায়ে ছিল রবারের জুতো। তার গোড়ালি সমতল, সুতরাং এ-রকম কাদার তাল জমবার উপায় নেই।"

"ঠিক! অতএব এটি সংলগ্ন ছিল অন্য খুনির জুতোর সঙ্গে। একে আমি এখন সযত্নে পকেটস্থ করলুম, বাড়িতে গিয়ে অণুবিক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করব।....সতীশবাবু, একবার বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে কি?"

"নিশ্চয়ই হবে!" সতীশবাবুর হুকুমে তখনি একজন লোক বিনোদলালকে খবর দিতে গেল।

খানিক পরে একটি যুবক ভীত হরিণের মতো চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। ফর্সা রং, ছিপছিপে দেহ, মুখ-চোখ সুন্দর। যুবকটি যে খুব শৌখিন, দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু তার মাথার কেয়ারি-করা চুল আজ স্নান ও চিরুনির অভাবে এলোমেলো, চাকচিক্যহীন। পরনে দামি রেশমি জামা ও মিহি দেশি কাপড়, কিন্তু সেগুলোও মলিন পারিপাট্যহীন। তার চোখ ফোলা-ফোলা, দুই গালেও শুক্‌নো অশ্রুর দাগ।—যেন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের 'হিরো'!

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, তারা যেন যুবকের মনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে!

সেই তীব্র দৃষ্টি সইতে না পেরে যুবক মাথা নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। তারপর কম্পিতস্বরে বললে, "আপনারা কি আমায় ডেকেছেন?"

হেমন্ত বললে, "আপনার নাম কি?" তার স্বরের কঠোরতা দেখে বিস্মিত হলুম।

"শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

"কাল সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আপনি কি করেছেন?"

"কাল সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত আমি থিয়েটারে ছিলুম।"

"বাড়ি ফিরেছেন কখন?"

"রাত দেড়টার সময়ে।"

"মোটরে করে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"কোন্ থিয়েটারে গিয়েছিলেন?"

"নাট্য-নিকেতনে।"

"কোন্ দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছেন?"

"সদর দরজা দিয়ে।"

"দরজা বন্ধ ছিল?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"কে খুলে দিয়েছিল?"

"দরোয়ান।"

"কোন্ জামা পরে থিয়েটারে গিয়েছিলেন?"

"যে জামাটা পরে আছি।"

"থিয়েটার থেকে আপনি সোজা বাড়িতে এসেছিলেন?"

একটু ইতস্তত করে যুবক বললে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

হেমন্ত ধমকে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা!"

"আজ্ঞে—"

"চুপ! থিয়েটার থেকে আপনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে খাবার খেয়েছেন, নেশা করেছেন। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না!"

বিনোদলালের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো হলদে এবং তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

হেমন্তের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবার অত্যন্ত কোমল হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সে বললে, "বিনোদবাবু, ভবিষ্যতে আর কখনো মদ খাবেন না। মদ হচ্ছে মানুষের সব-চেয়ে বড় শত্রু—মানুষকে সে যে-কোনো মুহূর্তে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখবেন, কোনো পশুও মদ খায় না—কারণ সেটা স্বাভাবিক পানীয় নয়। যে-জিনিসে পশুর রুচি নেই, মানুষ যদি তা খায় তাহলে তাকে কি পশুরও অধম বলব না? আর একটা কথা মনে রাখবেন। কোনো ভদ্রলোকেরই মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। মদ খাওয়া যে পাপ আপনিও তা জানেন। তাই সে পাপ লুকোবার জন্যেই মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যে পাপ ভদ্রলোককে মিথ্যে বলতে বাধ্য করে, তার চেয়ে হীন আর কিছুই নেই। এমন আপনি যান, আমি আর কিছু জানতে চাই না।"

দারুণ আতঙ্কে একবার হেমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই বিনোদলাল তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "হেমন্তবাবু! আপনি যে বিনোদকে চিনতেন এ-কথা তো একবারও আমাকে বলেননি?"

হেমন্ত বললে, "চিনতুম মানে? আজ আমি এই প্রথম বিনোদকে দেখলুম, আজ সকালেও এর নাম পর্যন্ত জানতুম না।"

প্রায় হতভম্বের মতো মুখ করে সতীশবাবু বললেন, "তবে আপনি কেমন করে বিনোদের এত গুপ্তকথা জানলেন?"

"খুব সহজেই! ইচ্ছে, বা চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারতেন! বিনোদ যখন বললে যে, 'নাট্য-নিকেতন' থেকে মোটরে রাত বারোটার সময় বেরিয়ে বাড়ি ফিরেছে দেড়টার সময়ে, তখনি বুঝলুম সে সোজা বাড়িতে আসেনি। কারণ, 'নাট্য-নিকেতনের' দূরত্ব এখান থেকে এক মাইলের বেশি নয়। মনে প্রশ্ন উঠল, এই দেড় ঘণ্টা সময় সে কোথায় কাটিয়েছে? লক্ষ করে দেখলুম, তার জামার হাতায় তরকারির হল্‌দে দাগ। জামায় পানেরও ছোপ রয়েছে, জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, কাল তার গায়ে ছিল এই জামাটাই। তরকারির দাগ থেকে অনুমান করলুম, থিয়েটার থেকে বাড়িতে আসবার আগে সে কোনো হোটেলে গিয়েছিল। কারণ, সাধারণত থিয়েটার দেখে অত রাত্রে কেউ অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তারপর চিন্তা করে দেখলুম, সিগারেটের আগুনের ফিন্‌কি লেগে জামার নানা জায়গা পুড়ে যাওয়া, তরকারির দাগ আর পানের ছোপ লাগা—এ-সব হচ্ছে অজ্ঞানতা আর অসাবধানতার লক্ষণ। নেশা না করলে কেউ এমন বেহুঁশ হতে পারে না। সেইজন্যেই আন্দাজে বিনোদকে ঐসব প্রশ্ন করেছি!"

সতীশবাবু বললেন, "অদ্ভুত আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি! বিনোদকে দেখেই তার আসল চরিত্র আবিষ্কার করে ফেললেন! কিন্তু কাল রাত দশটা পর্যন্ত বিনোদ কি করেছে, এ-কথা আপনি জানতে চাইলেন কেন?"

হেমন্ত সহাস্যে বললে, "এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সময় এখনো হয়নি, আমাকে দয়া করে মাপ করবেন!"

সতীশবাবু অনেকটা যেন নিজের মনে-মনেই মৃদুস্বরে বললেন, "হুঁ, বিনোদ খালি জুয়াই খেলে না, নেশাও করে! হয়তো তার আরও গুণ আছে!"

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা, সতীশবাবু, বিনোদ কাল কখন বাড়িতে ফিরেছে, দরোয়ানের কাছে সে খোঁজ নিয়েছেন কি?"

"নিয়েছি। রাত দেড়টার সময়েই।"

"উত্তম। আর আমার কিছু দেখবার শোনবার নেই। নমস্কার—"

সতীশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "এখনি যাবেন? কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?"

হেমন্ত বললে, "এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে উচিত নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতরে আমি দু-একটি আলোক-রেখা দেখতে পেয়েছি বটে! চল রবীন, পলায়ন করা যাক্।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় বিলাতী 'ফগ'!

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলুম, আজ শহরের এ কী অবস্থা!

চারিদিক ঢাকা পড়ে গিয়েছে যেন কুয়াশার ঘেরাটোপে! কলকাতায় যে এমন কুয়াশা হতে পারে, কখনো কল্পনা করিনি!

মুখ তুললে বোঝা যায় না, মাথার উপরে লক্ষ তারার চুম্‌কি বসানো নীলাকাশ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে। এদিকে-ওদিকে যেদিকে তাকাই—সমস্ত দৃশ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে পুরু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার জঠরে। যেখানে-যেখানে গ্যাস-পোস্ট আছে, সেখানকার কুয়াশা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ হযে উঠেছে মাত্র, আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু পথিকরা অদৃশ্য।

হেমন্ত বললে, "ও রবীন, এ হল কি হে! লন্ডনের বিখ্যাত বিলাতী 'ফগ' কি আমাদের দেশের প্রধান শহরে বেড়াতে এসেছে?"

হেমন্ত রয়েছে আমার কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, কিন্তু তাকেও দেখাচ্ছে যেন আবছায়ার মতো!

একে মতিবাবুর বাড়ির পিছন-দিককার এই সরু গলিটা সাধারণতই নির্জন, তার উপরে শীতার্ত রাত, এই ভয়াবহ কুজ্ঝটিকা! মনে হচ্ছে, আমরা চলেছি নিস্তব্ধ এক অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো!

পিছনে আবার একাধিক অদৃশ্য জুতোর শব্দ হল।

আমি সাড়া দিয়ে বললুম, "কে আসে—সাবধান! আমাদের দেহের ওপরে হোঁচট্ খাবেন না!"

পরমুহূর্তেই মাথার ওপরে অনুভব করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত এবং চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল রাশি-রাশি সমুজ্জ্বল সর্ষে-ফুল এবং তার পরেই হারিয়ে ফেললুম জ্ঞান!...

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই শুনলুম হেমন্তের কণ্ঠস্বর—"রবীন, রবীন!"

"অ্যাঁ? কি বলছ? উঃ!"

"উঠে বোসো!"

হেমন্ত আমাকে ধরে তুলে বসিয়ে বললে, "তোমার মাথা ফেটে গেছে। এখনি ব্যান্ডেজ করা দরকার। তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে যেতে পারবে?"

"বোধহয় পারব। কিন্তু কে আমাকে আক্রমণ করলে?"

"এখন কোনো কথা নয়, আগে বাড়িতে চল।"

নিজের বাড়িতে ফিরে হেমন্ত আমার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে বললে, "বড় বেঁচে গিয়েছ রবীন, আর একটু হলেই আঘাতটা মারাত্মক হয়ে উঠত।" সে তাড়াতাড়ি জল দিয়ে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ঔষধ প্রয়োগ করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বসল।

"কিন্তু হেমন্ত, হঠাৎ আমার ওপরে গুন্ডার আক্রমণ কেন?"

"গুন্ডা নয় রবীন, হত্যাকারী!"

"হত্যাকারী?"

"হ্যাঁ। এ হচ্ছে, মতিবাবুর হত্যাকারীর কীর্তি! খালি তোমাকে নয়, আমাকেও আক্রমণ করেছিল।"

"তুমি তাদের দেখতে পেয়েছ?"

"আবছায়ার মতো দেখেছি। দেখলেও চিনতে পারতুম না, তারা মুখোশ পরে এসেছিল।"

"কিন্তু, কেন?"

"তারা আমার পকেট থেকে সেই দস্তানাটা চুরি করে পালিয়েছে।"

বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিনোদের ওপরে। নিশ্চয় সে পাশের ঘরে লুকিয়ে বসে দস্তানা সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনেছে।"

"তারপর তার কোনো অনুচরের সঙ্গে আমাদের পিছু নিয়েছে!"

"হুঁ। আজকের বিদঘুটে কুয়াশা তার পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ।"

"দুর্যোগও হতে পারে রবীন।।"

"দুর্যোগ?"

"হ্যাঁ, খানিকটা তাই বৈকি!"

"মানে?"

"এই দেখ!" হেমন্ত হাসতে-হাসতে পকেট থেকে একখানা পকেট-বুক বার করে সামনের টেবিলের উপরে রাখলে!

"পকেট-বুক!"

"হ্যাঁ।" পকেট-বুকখানা খুলে দু-একপাতা উল্টে সে একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "না, যা ভেবেছিলুম তা তো নয়!"

"কি তুমি ভেবেছিলে?"

"ভেবেছিলুম, এর মধ্যে দস্তানা-চোরের নামধাম গুপ্তকথা পাব। এখন দেখছি এখানা হচ্ছে, মতিবাবুর ডায়ারি!"

"অ্যাঁঃ! তবে কি এইখানাই মতিবাবুর ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছে?"

"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

"এখানা তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"পিক-পকেট যেখান থেকে চিরকালই গুপ্তধন আহরণ করে।"

"হেমন্ত, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।"

"শোনো। কুয়াশায় গা ঢেকে আজ আমাদের একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দু'জন লোক। খুব সম্ভব তাদের হাতে ছিল খাটো লোহার ডাণ্ডা। তারা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করতে আসেনি, এসেছিল খালি ঐ দস্তানাটাই হাতাবার জন্যে। বোধ হয় এই দস্তানা কেউ-কেউ চেনে, দস্তানাটা দেখলে তারা মালিকের পরিচয় দিতে পারে। কিংবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সে-কথা যাক।.....একজন তোমাকে আক্রমণ করে, আর-একজন আমার মাথা লক্ষ্য করে ডাণ্ডা মারে, কিন্তু ফস্কে যায়। সে আবার ডাণ্ডা তোলবার আগেই আমি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার বুক-পকেটে অনুভব করি এই ডায়ারিখানির অস্তিত্ব। তুমি জানো রবীন, খুব বিপদেও আমার মাথা গুলিয়ে যায় না। চোখের নিমেষ পড়বার আগেই আমি এক-হাতে তাকে জড়িয়ে সাঁৎ করে তার পকেটে আর এক হাত চালিয়ে ডায়ারিখানা তুলে নিলুম—কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্য লোকটা তোমাকে ছেড়ে আমারও মাথায় মারে ডাণ্ডা, আমিও মাটির ওপরে পড়ে যাই। আমার মাথা ফাটেনি বটে, কিন্তু আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলুম। আমাকে সেই অবস্থায় পেয়ে, দস্তানাটা নিয়ে তারা সরে পড়ে। আমি যে পকেট মেরেছি, এটা নিশ্চয়ই তারা জানতে পারেনি।"

"চোরের ওপরে আচ্ছা বাট্‌পাড়ি করেছ বটে!....কিন্তু হেমন্ত, ডায়ারি আর চাবির গোছা চুরি দেখে সত্যি-সত্যিই সন্দেহ হয় যে, বাড়ির ভেতরের কোনো লোকই মতিবাবুকে খুন করেছে। হ্যাঁ, সন্দেহ কেন, একরকম নিশ্চিতভাবেই এ-কথা বলা যায়। বাইরের লোক খুন আর টাকা চুরি করেই তুষ্ট হত—পরে মতিবাবুর চাবির গোছা আর ডায়ারি কোনো কাজেই লাগতে পারত না।"

ডায়ারির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হেমন্ত অন্যমনস্কভাবে বললে, "হ্যাঁ, সতীশবাবুরও ঐ মত।"

মিনিট পাঁচ-ছয় হেমন্ত ডায়ারি থেকে আর মুখ তুললে না। তারপর হঠাৎ উৎসাহিত-কণ্ঠে বললে, "পেয়েছি রবীন, ডায়ারি চুরির কারণ পেয়েছি! এই পাতাখানা ছাড়া ডায়ারির অন্য কোথাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কোনো দরকারি কথা নেই। শোনো—" বলেই পড়তে লাগল ঃ

"আমার শোবার ঘরের বড় টেবিলের ডানদিকের টানার পিছনের কাঠে একটি গুপ্তস্থান আছে। বাঁ-কোণের শেষপ্রান্তে খুব ছোট একটি স্প্রিং আছে। সেটি টিপ্‌লেই গুপ্তস্থানটি বেরিয়ে পড়বে। ওর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার হীরা, চুনি, পান্না, আর মুক্তা আছে। বৃদ্ধ হয়েছি, স্বাস্থ্য দিনে-দিনে খারাপ হচ্ছে, হঠাৎ যদি মারা পড়ি সেই ভয়ে আমার উত্তরাধিকারীর জন্যে এখানে এই কথাগুলি লিখে রাখলুম।"

"রবীন, খুনি জানত যে, ডায়ারির মধ্যে এই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে!"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "তাহলে এই খুনি নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরের লোক। এইজন্যেই সে চাবি চুরি করেছে! কাল তাড়াতাড়িতে ডায়ারি পড়তে পারেনি, খুব শীঘ্রই সে কাজ হাসিল করবে!"

"করবে নাকি? দেখা যাক্!" বলেই হেমন্ত উঠে 'টেলিফোনে'র 'রিসিভার' তুলে নিয়ে থানার নম্বর বললে।

"কে? সতীশবাবু? থানায় ফিরে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি হেমন্ত। শুনুন। মতিবাবুর দেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো? বেশ। তাঁর শোবার ঘর বন্ধ আছে। উত্তম। কিন্তু একটা জরুরি কথা মনে রাখবেন। ও-ঘরের দরজার সামনে সর্বদাই যেন পাহারা রাখা হয়—কেউ যেন কোনো কারণেই ও-ঘরে ঢুকতে না পায়। কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনো প্রকাশ করবার সময় হয়নি। রাগ করবেন না, যথাসময়ে সমস্তই বলব।....

.....বলেন কি? যে কনস্টেবল ভাঙা কাচের গেলাস নিয়ে একলা আসছিল, হঠাৎ পথে কারা তাকে আক্রমণ করেছে? তারপর? গেলাসটা ছিনিয়ে নিতে পারেনি? শুনে সুখী হলুম। কনস্টেবল কারুকে চিনতে পারেনি? হ্যাঁ, কলকাতার আজকের কুয়াশাটা আশ্চর্য বটে। অভূতপূর্ব! কি বললেন? মিনিট-দুয়েক আগেই গলির মোড়ের কাছে কনস্টেবল আর-এক পথিকের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ে? কে সে? বিনোদ? অত কুয়াশায় ওখানে সে কি করছিল? মাথা ধরেছে বলে বেড়াতে বেরিয়েছিল? এই বিশ্রী কুয়াশায়? আশ্চর্য ওজর তো! তাকে গ্রেপ্তার করবেন কিনা ভাবছেন? আপনার কর্তব্য আপনিই ভালো বোঝেন, আমি আর কি বলব? এ-পথে আমি শিক্ষানবিশ ছাড়া তো আর কিছুই নই!.....হ্যাঁ, আমার কাছেও একটা নতুন খবর আছে। আমাকে আর রবীনকেও আজ কারা আক্রমণ করেছিল। রবীনের মাথা ফেটে গেছে। বেচারি! আমার খুব বেশি লাগেনি বটে, কিন্তু সেই দস্তানাটা লুট হয়ে গেছে—কনস্টেবলের মতো আমার ভাগ্যও ভালো নয়। না, চিনতে পারিনি। একে কুয়াশা, তার ওপরে উপন্যাসের দুরাত্মাদের মতো তারা মুখোশ পরে এসেছিল। না, না, এত রাত্রে আমাদের আর দেখতে আসতে

হবে না, আমরা ভালোই আছি। আচ্ছা নমস্কার।" আমার দিকে ফিরে সে বললে, "রবীন, সব শুনলে তো?"

অভিভূত-কণ্ঠে বললুম, "ভাই হেমন্ত, এ যে আমরা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি। কাল খুন, আশি হাজার টাকা চুরি, আজ আমাদের আর কনস্টেবলকে আক্রমণ। আমি ভাই কালি-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এত গোলমাল আমার ধাতে সহ্য হবে না তো!"

হেমন্ত বললে, "হুঁ, আমিও জানতুম, বটতলার ডিটেক্‌টিভ-নভেলেই এমন সব হৈ-হৈ কাণ্ড ঘটতে পারে!..... কিন্তু রবীন, বুঝতে পারছ কি, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো সরাবার জন্যে খুনিরা কি-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে! উপন্যাসকেও সত্য করে তুলতে চাইছে? কিন্তু কে তারা—কে তারা? কিছুই ধরতে পারছি না যে!"

আমি বললুম, "আচ্ছা, সতীশবাবুর কাছে তুমি একটা কথা ভাঙলে না কেন?"

দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাসতে-হাসতে হেমন্ত বললে, "কি কথা?"

"মতিবাবুর ডায়ারির কথা?"

হেমন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "রবীন, আমার এ লুকোচুরি মার্জনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এইটেই হবে আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কেস'। পুলিশের কাছে এর সমস্ত বাহাদুরিটা আমি একলাই অর্জন করতে চাই। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, আমি এ মামলাটার কিনারা করতে পারব। অবশ্য তারপরে আমি সরে দাঁড়াব যবনিকার অন্তরালে—জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিশকে ষোল আনা সুখ্যাতি আদায় করবার অবসর দিয়ে।"

"কিন্তু এ আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে, আমাদের প্রাণ যেতেও পারে।"

"দেহের ভিতর থেকে এত চট্‌পট্ প্রাণবায়ু যাতে বহির্গত না হয় সে-চেষ্টার ত্রুটি আমি করব না। কিন্তু...কি আশ্চর্য, আমি যে একটা বড় কথা ভুলে গিয়েছি রবীন!" বলেই হেমন্ত টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিলে।

"কি খুঁজছ তুমি?"

"এইটে।" হেমন্ত বার করলে সেই কাগজের মোড়কটা—যার ভিতরে সে পুরে রেখেছিল খুনির জুতো-থেকে-খসা খানিকটা শুক্‌নো কাদা।

মোড়কটা খুলে হেমন্ত আশ্বস্ত-স্বরে বললে, "আঃ, বাঁচা গেল; কাদার টুকরোটা ধস্তাধস্তিতে গুঁড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি!"

আমি বললুম, "ঐ এক টুকরো কাদাকে তুমি এমন অমূল্য নিধি বলে ভাবছ কেন? ওর ভেতর থেকে তুমি কি খুনিকে আবিষ্কার করতে চাও?"

"আশ্চর্য কি? আমার সঙ্গে পরীক্ষাগারে এস।"

হেমন্ত তার পরীক্ষাগারে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর অণুবীক্ষণ ও সেই মোড়কের শুক্‌নো কাদার গুঁড়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

এ-রকম পরীক্ষার মধ্যে আমি কিছু রস্‌-কস্‌ পাই না। ঘরের এককোণে মাটি দিয়ে তৈরি একটি গায়ের ছাল-ছাড়ানো মানুষ-মূর্তি দাঁড় করানো ছিল—আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। শিল্পী কেবল মুর্তিই গড়েনি, স্বাভাবিক সব রং বুলিয়ে, নরদেহের ত্বকের তলায় যে-সমস্ত বিশেষত্ব থাকে, তার প্রত্যেকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। এ-সব দেখলে বেশ বোঝা যায়, পঞ্চভূত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরি করতে বসে প্রকৃতি-দেবীকে কত মাথা খাটাতে, কত শিল্প-চাতুরি প্রকাশ করতে হয়েছে। আশ্চর্য ও রহস্যময় হচ্ছে মানুষের দেহের ভিতরটা!

এমন সময়ে হেমন্ত আমাকে ডেকে বললে, "এই শুক্‌নো কাদার ভেতরে কি-কি আছে, জানো?"

জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু বললুম, "কি-কি আছে?"

"এর মধ্যে আছে চুন আর বালি, সুরকি আর কয়লার গুঁড়ো। এগুলো মেশানো আছে কলকাতায় পথের সাধারণ ধুলোর সঙ্গে।"

আমি বললুম, "চুন, বালি, সুরকি আর কয়লাও মেলে কলকাতায় যেখানে-সেখানে। এর কোনোটাকেই আমি অসাধারণ বলে মনে করি না।"

"কর না নাকি? ও!" এই বলেই হেমন্ত একেবারে চুপ মেরে গেল। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত একমনে যে যেন কোনো মহা-দরকারি কথা চিন্তা করছে।

খানিক পরে আমি বললুম, "দেখ ভায়া, এটা ভারি বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। শুক্‌নো কাদার গুঁড়ো, অর্থাৎ ধুলো নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের অপব্যবহার!"

হেমন্ত আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "প্রিয় রবীন, তুমি হচ্ছ একটি প্রাকাণ্ড উজবুগ!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্রবীভূত বাতাস

পরদিন বৈকালে চললুম পরেশ মিত্র লেনে, মিঃ দত্তের চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে।

বিশেষ করে কলকাতার উত্তর অঞ্চলে শহরের শিরা-উপশিরার মতো যে-সব

ছোট ছোট গলি দেখা যায়, পরেশ মিত্র লেনও হচ্ছে ঠিক সেইরকম। গলিটি চওড়ায় ছয়-সাত হাতের বেশি নয়, সাপের মতো এঁকে-বেঁকে পাক খেয়ে ভিতর দিকে চলে গিয়েছে।

গলিটা প্রথম যেখানে মোড় ফিরেছে, সেখানে বড় রাস্তা থেকে দেখা গেল, একখানা নূতন বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

একটা জিনিস আমি বরাবরই লক্ষ করেছি, ছেলেবেলা থেকেই সর্ববিষয়েই হেমন্তের কৌতূহল হচ্ছে অসীম। হয়তো এটা ভালো ডিটেক্‌টিভের একটা বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু ঠিক এই কারণেই তার সঙ্গে পথ-চলা অনেক সময়ে কেবল বিরক্তিকরই নয়, নিরাপদও ছিল না।

একদিনের কথা বলি।

বাগবাজার দিয়ে যাচ্ছি আমরা দুইজন। রাস্তায় একটা বিড়িওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে-করতে কে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল হেমন্ত। তিন, চার, ছয় মিনিট কেটে গেল, সেখান থেকে সে আর নড়বার নাম করে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "কি হে, ব্যাপার কি? এই দুপুর রোদে মাথার চাঁদি গরম হয়ে উঠল যে, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

হেমন্ত আমাকে একটু তফাতে টেনে এনে বললে, "রবীন, তুমি ওর দাঁত লক্ষ করেছ?"

"দাঁত! কার দাঁত?"

"ঐ যে লুঙ্গিপরা লোকটা এখনি হা-হা করে হেসে উঠল? দেখ-দেখ, আবার ও হাসছে! ওর দাঁত দেখ!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "যাও যাও, বাজে বোকো না। পথে-পথে লোকের দাঁত দেখে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়, চল!" বলেই তার হাত ধরে টান মারলুম।

কিন্তু হেমন্তকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারলুম না। সে বললে, "ওর শ্বদন্তগুলো কি রকম অসম্ভব বড় আর লম্বা দেখেছ?"

"শ্বদন্ত? শ্বদন্ত আবার কি?"

"মূর্খ রবীন, তুমি সাহিত্য-চর্চা ছেড়ে দাও। তুমি ভালো গোয়েন্দা বা সাহিত্যিক কিছুই হতে পারবে না। মাতৃভাষা জান না? শ্বদন্ত অর্থাৎ canine tooth।"

"সাহিত্যিকের কাজ নয় শ্বদন্ত নিয়ে তদন্ত করা। চলে এস।"

"অসাধারণ ওর শ্বদন্ত। তার ওপরে ও আবার চৌকো-চোয়ালের অধিকারী। যে-সব বড় বড় পণ্ডিত অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা বলেন যে—"

"তাঁরা কি বলেন, আমি শুনতে চাই না। এখন আগে আসবে কিনা বল!"

"উঁহু, এখন আমি যাব কোথায়? আমি আগে ও-লোকটার পরিচয় জানতে চাই! .....ঐ দেখ, লোকটা এগিয়ে চলল! মস্ত-বড় লম্বা শ্বদন্ত, তার ওপরে চৌকো-চোয়াল—সোনায় সোহাগা! এস রবীন, আমরাও ওর পিছনে-পিছনে অগ্রসর হই!" হেমন্ত এমন বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতের কব্জি চেপে ধরল যে, তার হাত ছাড়ানো অসম্ভব!

বাগবাজারের মোড়ে এসে লোকটা চড়ল চিৎপুর রোডের বাসে। আমরাও বাসে চেপে কিনলুম টিকিট।

আমি চুপি-চুপি বললুম, "এ যে, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে! ওর পরিচয় জেনে আমাদের কি লাভ?"

"লাভ হয়তো কিছুই হবে না, হতাশ-মুখে ফেরার সম্ভাবনাই প্রবল! কিন্তু আমি হচ্ছি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের মতামতগুলো মেকি কি না, যাচাই করবার চেষ্টা করব না?"

মনে-মনে হেমন্তের অপরাধ-বিজ্ঞানকে পাঠাতে চাইলুম জাহান্নামে। মশাই, কি আপদ বলুন তো! চৈত্রমাসের তপ্ত দুপুর, পথের কুকুরগুলোও এখন ধুঁক্‌তে-ধুঁক্‌তে ঠান্ডা আশ্রয় খুঁজছে! কোথায় বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে বিজলিপাখার তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসে বরফ-দেওয়া সরবৎ পান করতে-করতে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ব, না ছুটে চলেছি এক মহাপাগলের সঙ্গে কোন্ শ্বদন্ত ও চৌকো-চোয়ালের পিছনে! গ্রহের ফের আর কাকে বলে?

হতচ্ছাড়া শ্বদন্ত বাস থেকে নামল হ্যারিসন রোডের মোড়ে। তারপর খানিক এগিয়ে একটা কফিখানায় গিয়ে ঢুকল।

হেমন্ত রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে, "লোকটার পরিচয় এখনো জানা হল না তো! আমরাও কফিখানার খরিদ্দার হব নাকি?'

"ভাই হেমন্ত, এইবার দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও! তোমার শ্বদন্তের নাম-ধাম বংশ পরিচয় তো আমার কাছে নেই, আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রও নই। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কর কেন?"

হেমন্ত মাথা চুলকোতে-চুলকোতে ভাবছে, অতঃপর কি করা কর্তব্য, এমন সময়ে বড়বাজার থানার এক ইন্‌স্পেক্টার সেখানে এসে হাজির হলেন।

"আরে, আরে, হেমন্তবাবু যে! এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন কেন?"

হেমন্ত কফিকানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, "ঐ লোকটাকে দেখছি! ঐ যে, পরনে ডোরা-কাটা সব্‌জে লুঙ্গি, গায়েও ডোরা-কাটা লাল গেঞ্জি, বসে বসে গোগ্রাসে মাংস গিলছে!"

ইন্‌স্পেক্টার প্রায় মিনিটখানেক ধরে ভালো করে লোকটাকে দেখলেন, তারপর

সবিস্ময়ে বললেন, "ব্যাটার সাহস তো কম নয়! দিনের বেলায় এখানে প্রকাশ্যে বসেই ফুর্তি করে খাবার খাচ্ছে! ধন্যবাদ হেমন্তবাবু, ওকে দেখিয়ে দিয়ে ভারি উপকার করলেন!"

"কে ও?"

"আবদুল মিয়া, মেছোবাজারের গুন্ডা, দাগি আসামী, সাতবার জেল খেটেছে! আজ তিন দিন ধরে একটা খুনের মামলায় ওকে আমরা সারা কলকাতা-ময় খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর ও কিনা আমাদের হাতের কাছেই খোশ-মেজাজে সশরীরে বর্তমান।"

আবদুল তখনি ধরা পড়ল!

হেমন্তের দুই চোখ যেন নাচতে লাগল। বাড়ি ফেরবার জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে বললে, "ভায়া হে, অপরাধ-বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো?"

....পরেশ মিত্র লেনের সেই প্রায় সম্পূর্ণ বাড়িখানা হঠাৎ হেমন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে!

মিনিট-দুয়েক ধরে বাড়িখানা দেখে সে বললে, "দেখ রবীন, আজ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশে নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। 'স্কাইস্ক্রেপার' নামে এক অদ্ভুত—এমন কি, বেয়াড়া ধরনের বাড়ি আমরা আমেরিকায় দেখে এসেছি। আমেরিকার বায়স্কোপওয়ালারা এই 'কনারক মন্দির' আর 'তাজমহলের' দেশে এসেও সেই ঢঙে 'মেট্রো' সিনেমার বাড়ি তৈরি করেছে! সেটা আমাদের চোখকে আঘাত দিলেও 'মেট্রোর' কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে চাই না। কারণ, তারা হচ্ছে সেই দেশের লোক, যারা বিদেশের ঠাকুর ফেলে, স্বদেশের কুকুর ধরে আদর করে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু আজকাল বাঙালিরাও দেখছি কলকাতার পথে-পথে স্কাইসক্রেপারের নকলে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে লজ্জিত হয় না। এই নতুন বাড়িখানার দিকে চেয়ে দেখ। এই বিদেশি আদর্শের বদ-হজম সহ্য করা অসম্ভব। এমন অনুকরণপ্রিয় জাতি কোনোদিনই স্বাধীন হতে পারবে না।"

বিরক্ত চোখে হেমন্ত আরো কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললুম, "তোমার স্থাপত্যের সমালোচনা রেখে এখন দশ নম্বরের বাড়ি খোঁজো। পাঁচটা বাজে যে, চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!"

"যাক্ গে উত্তীর্ণ হয়ে! এও অনুকরণ! আমরা কি ইংরেজ যে এই সময়ের মধ্যে আমাদেরও চা খেতে হবে?"

"এস, এস, ও-সব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন!"

কিছুদূর এগিয়েই দশ নম্বরের বাড়ি পাওয়া গেল। দ্বারবানের উপরে বোধহয় আদেশ ছিল আমাদের নাম শুনেই সে দোতলায় যেতে অনুরোধ করলে।

মিঃ দত্ত তাঁর দোতলার বৈঠকখানায় বসে সত্য-সত্যই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলুম, সতীশবাবু আমাদের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন।

মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, রবীনবাবু! কাল আপনারা কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন, সতীশবাবুর মুখে তা শুনে স্তম্ভিত হয়েছি। রবীনবাবুর মাথায় এখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে যে! নিশ্চয় ওঁর খুব লেগেছে।"

আমি বললুম, "লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে। মধু খেলে মিষ্টি লাগে, ডাণ্ডা খেলে কষ্ট পেতে হয়। প্রকৃতির এই-ই স্বাভাবিক নিয়ম।"

মিঃ দত্ত বললেন, "কিন্তু, কে এই পাপিষ্ঠ? অনায়াসে যে খুন করছে, ভদ্রলোককে মারাত্মক আক্রমণ করছে, অথচ এখনো মেঘনাদের মতো লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? আমার তো মশাই, বাড়ি থেকে আর বেরুতে ভয় করছে!"

সতীশবাবু বললেন, "আপনার আবার কিসের ভয়? আপনি তো পুলিশের লোক নন?"

"আমি পুলিশের লোক নই বটে, কিন্তু বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুলিশকে তো সাহায্য করছি? খুনিদের রাগ আমার ওপরে পড়তে কতক্ষণ!"

সতীশবাবু বললেন, "ভয় নেই মিঃ দত্ত, আমরা বোধহয় শীঘ্রই খুনিকে ধরতে পারব। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন?"

"আজ্ঞা করুন।"

"আজ্ঞা নয় মিঃ দত্ত, অনুরোধ। আপনি তো মতিবাবুর বন্ধু, ও-পরিবারের অনেক খবরই রাখেন। বিনোদলালবাবু কোন্-কোন্ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সে-বিষয়ে আমাদের কোনো খবর দিতে পারেন?"

মিঃ দত্ত বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "বিনোদের বন্ধুদের কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না!"

"কেন বলুন দেখি?"

"তারা লোক ভালো নয়! তাদের বিশেষ পরিচয় আমি জানি না বটে, কানাঘুসোয় শুনেছি, বন্ধুদের চেষ্টাতেই বিনোদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা চেষ্টা করবে না কেন? মামার মৃত্যুর পর বিনোদ হবে অগাধ সম্পত্তির মালিক, তারপরেই তো তাদের পোয়াবারো! কিন্তু যেতে দিন মশাই, ও-কথা যেতে দিন!"

হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু, শব-ব্যবচ্ছেদাগারের খবর কি?"

"মতিবাবুর পাকস্থলীতে কোনো-রকম বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যদিও ডাক্তারদের আগে সেই সন্দেহই হয়েছিল। মতিবাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে কিনা, ডাক্তাররা জোর করে সে-কথাও বলতে পারছেন না, তবে তাঁরা স্বীকার করছেন যে, ওটা মৃত্যুর কারণ হলেও হতে পারে। মতিবাবুর কণ্ঠের প্রত্যেক

রক্তবহা নাড়িতে অতিশয় রক্তাধিক্যের লক্ষণ পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই বিষম জোরে তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট তো এই, আপনার রিপোর্ট কি হেমন্তবাবু?"

"আমার রিপোর্ট? আপাতত আমার কাছে রিপোর্ট করবার মতন কোনো তথ্যই নেই।"

আমি উপহাসের স্বরে বললুম, "কেন হেমন্ত, তুমি তো অনায়াসেই তোমার সেই মহামূল্যবান্ শুক্‌নো কর্দম-চূর্ণের কাহিনি বলতে পারো?"

সতীশবাবু আগ্রহ-ভরে বললেন, "দোহাই হেমন্তবাবু, আপনার এই কর্দম-চূর্ণের কাহিনি থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।"

আমার দিকে একবার রেগে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে হেমন্ত বললে, "না সতীশবাবু, শোনেন কেন, এ-সব বিষয়ে আমার বন্ধুটি হচ্ছে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। যে-ধুলোকে আমরা রাখি পায়ের তলায়, আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানে তার স্থান যে কত ওপরে, মূর্খ রবীন সে-কথা জানে না।"

কিন্তু দত্ত কৌতূহলী-কণ্ঠে বললেন, "হেমন্তবাবু, এ-সব বিষয়ে আমিও কম-কাঁচা নই। আপনার মুখে একটুখানি ধুলোর ইতিহাস শুনতে চাই! ততক্ষণ বেয়ারারাও চা-টা নিয়ে আসবে।"

হেমন্ত বললে, "দেখুন, কিছুকাল আগেও অপরাধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না বিশেষ-কিছুই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি আর খুনের মামলার তদন্ত আরম্ভ হয়েছে খুব একালেই। আগে কোনো লোকের উপর সন্দেহ হলে তার কাছ থেকে স্বীকার-উক্তি আদায় করবার জন্য তাকে দেওয়া হত অমানুষিক যন্ত্রণা। তার ফলে কেউ-কেউ মারা পড়ত এবং অনেকে প্রাণের ভয়ে নির্দোষ হলেও মিথ্যা বলে অপরাধ স্বীকার করত। য়ুরোপে এমন সব ঘটনাও ঘটেছে, পুলিশ সন্দেহ করে একজনকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তারপর প্রকাশ পেয়েছে, সত্যিকার অপরাধী হচ্ছে আর-একজন লোক। আসল কথা, আগে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের বুদ্ধির জোরে নয়, যন্ত্রণার চোটেই আসামীর অপরাধ প্রকাশ পেত।

"কিন্তু আজকের ধারা ভিন্ন রকম। একালে পুলিশ যদি যন্ত্রণা দিয়েও আসামীকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে, তাহলে আদালতে তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু য়ুরোপের আধুনিক পুলিশকে যন্ত্রণার দ্বারা অপরাধীদের দোষ আবিষ্কার করতে হয় না। তার কারণ, পুলিশ এখন বিজ্ঞানের সাহায্য পায়। অপরাধীর স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামায় না, ঘটনাস্থলে-পাওয়া আসামীর ব্যবহার-করা কাপড়, জামা, জুতো, টুপি, লাঠি, ছোরা-ছুরি প্রভৃতি অনেক রকম জিনিসের ভেতর থেকে পুলিশ বিজ্ঞানের সাহায্যে আশ্চর্য সব তথ্য আবিষ্কার করতে পারে। আসামী অপরাধ স্বীকার করলেও

দণ্ড থেকে মুক্তি পায় না। এ-বিষয়ে নানাদিকে নানা কথা বলা যায়, কিন্তু আপাতত বলতে চাই কেবল ধুলোর কথা।

"আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, ধুলোর অগম্য ঠাঁই নেই। জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে একটা বাক্সে ঢাক্‌নি-দেওয়া কৌটো রেখে দিন, তার মধ্যেও ধুলো ঢুকবে। সাধারণ চোখে সে-ধুলো যদি দেখতে না পাওয়া যায়, তবে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করুন—দেখবেন, কৌটার ভেতরে বাস করছে নানারকম ধুলো! এক-এক শ্রেণির মানুষ যে-কোনো জিনিস নিয়ে নিয়মিতভাবে নাড়াচাড়া করবে, তার মধ্যে বিশেষ করে পাওয়া যাবে এক-এক শ্রেণির ধুলো। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, আর ফ্রান্সের পুলিশরা এ-বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছে। অপরাধীদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের কাছে নাম-সই-করা স্বীকার-উক্তির চেয়েও মূল্যবান।

"যারা পাঁউরুটি তৈরি করে, তাদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায় গমের পালো বা শ্বেতসার। যাদের কাজ ধাতু নিয়ে, তাদের জিনিসে মেলে অতি-সূক্ষ্ম ধাতব ধুলো। খনিতে যারা থাকে, তাদের ব্যবহৃত জিনিসে থাকে খনিজ ধুলো। রাস্তায় যারা পাথর ভাঙে তাদের জিনিস সূক্ষ্ম বালুময় ধুলোতে ভরা। এইরকম নানারকম জিনিস অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, তাদের মালিক মিস্ত্রী, ছুতোর, কশাই, মুচি বা অন্য কোন শ্রেণির লোক।

প্রফেসর সেভেরিন্ ইকার্ড নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেছেন, নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত ট্যাক্‌ঘড়ি বা হাতঘড়ির ভেতরে যে ধুলো জমে, তার সাহায্যে খুব সহজেই বলে দেওয়া চলে, কোন্ শ্রেণির লোক হচ্ছে ঘড়ির মালিক। এইবার একটা সত্য গল্প বলি ঃ

"বিলেতের এক পাড়াগাঁয়ে একবার একটি স্ত্রীলোককে কে খুন করে পালায়। স্ত্রীলোকটির দেহে ছুরির আঘাত ছিল বটে, কিন্তু সে আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ নয়। লাল ও নীল রেশমি সুতোর পাকানো দড়ার ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে কেউ তাকে হত্যা করে পথের ধারে ফেলে পালিয়ে গেছে।

"পুলিশ দস্তুরমতো বৈজ্ঞানিক-প্রথায় তদন্ত শুরু করলে। হত স্ত্রীলোকটির পোশাকে পাওয়া গেল তামাকের ধুলো, অর্থাৎ নস্য; তার জামা-কাপড়ের কোনো কোনো জায়গায় কয়লার গুঁড়োও দেখা গেল। তারও ওপরে আবিষ্কৃত হল অভ্র, silicate of calcium আর magnesium প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধুলো।

"কিছুদিন পরে পুলিশ সন্দেহক্রমে একটা লোককে গ্রেপ্তার করলে। অণুবীক্ষণ দিয়ে তার আঙুলের নখের ফাঁকে দেখা গেল ঐসব অভ্র, কয়লা আর অন্যান্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ধুলো এবং—সবচেয়ে যা সন্দেহজনক—লাল-নীল রেশমি সুতোর টুকরো!

জানা গেল, সে নস্য নেয়! তার পকেটে একখানা ছুরি ছিল, তাতেও রয়েছে অস্পষ্ট রক্তের ছাপ।

"আসামী বললে, সে গ্যাসের কারখানায় আর খনিতে ঠিকে কাজ করে। সে কারখানা আর খনির ঠিকানাও দিলে। কিন্তু তার নখের ফাঁকে যে সব খনিজ পদার্থের ধুলো ছিল, তার দেওয়া ঠিকানা মতো কারখানা আর খনিতে গিয়ে সে-রকম ধুলো পাওয়া গেল না। কিন্তু যে গাঁয়ে নারীহত্যা হয়েছে, সেখানকার ধুলোয় মিশ্রিত খনিজ পদার্থের গুঁড়োর সঙ্গে আসামীর নখের ধুলো হুবহু মিলে গেল। তখন আসামী বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করলে।

"ভেবে দেখুন পুলিশ যদি অণুবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ না করত, তাহলে হত স্ত্রীলোকটির পোশাক আর হত্যাকারীর নখের ফাঁক থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারত না, কারণ, যে-সব ধূলিকণা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কিছুতেই ধরা পড়ত না সাধারণ দৃষ্টিতে।

"আমিও এই পদ্ধতিতেই কাজ করবার চেষ্টা করি। মতিবাবুর লাশের পাশে যে দস্তানাটা আমরা পেয়েছিলুম, সেটা খোয়া না গেলে আমিও হয়তো আর ভেতরকার ধুলো পরীক্ষা করে অনায়াসেই বলতে পারতুম, দস্তানার মালিকের পেশা কি এবং দস্তানার ভেতর ছিল কোন্ শ্রেণির ধুলো। আশা করি, আমার বক্তব্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আর আমার বলবার কিছু নেই।"

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, সেই শুক্‌নো কাদার গুঁড়ো তো আপনি পরীক্ষা করেছেন বলে শুনছি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন?"

হেমন্ত অবহেলা-ভরে বললে, "ধুলো পেয়েছি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বাজে ধুলো, কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।...কই মিঃ দত্ত, কোথায় আপনার চা? এতক্ষণ তো পাগলের মতো বকে মরলুম, কিন্তু আর তো চা না হলে চলে না।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! বেয়ারা, এই বেয়ারা! জলদি চা লে-আও!"

চা এল, খাবার এল।

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনার লেক্‌চার শুনে আজ অনেক জ্ঞানলাভ করলুম, ধন্যবাদ!"

চা পান করতে-করতে হেমন্ত বললে, "ঐ দরজাটার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে শেল্‌ফের ওপর অত শিশি-বোতল সাজানো কেন? ওটা কি আপনার ডিস্‌পেন্সারি?"

"না হেমন্তবাবু, এটা আমার ডিস্‌পেন্সরি নয়, ও-ঘরটি হচ্ছে আমার রসায়নাগার।"

"রসায়নাগার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে আমি অল্পবিস্তর পরীক্ষা-কার্য করি! যদিও জ্ঞান আমার সামান্য, তবু ঐ রসায়নাগারের পিছনে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি। আপনি ও-ঘরটি দেখবেন?"

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হেমন্ত হাসতে-হাসতে বললে, "রবীন জানে, সব ব্যাপারেই আমার কৌতূহলের সীমা নেই—বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে! আমার লেকচার তো শুনলেন, এইবার রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।"

"আপনাকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি আমার আছে বলে মনে হয় না। বড়-জোর আমার রসায়নাগারটি আপনার মতো গুণীকে দেখিয়ে ধন্য হতে পারি। চা খাওয়া হয়েছে? আসুন!"

মিঃ দত্তের সঙ্গে আমরা তিনজনেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। আমি এই রসায়নাগারের মধ্যে বিশেষ কোনো নূতনত্ব পেলুম না, কারণ, হেমন্তের পরীক্ষাগারের সাজ-সজ্জার সঙ্গে এরও মিল আছে অনেকটা। সেই শিশি, বোতল, জার, অণুবীক্ষণ, কাচের মাপজোপের গেলাস, বকযন্ত্র প্রভৃতি। তবে এই রসায়নাগারের জন্যে মিঃ দত্ত হেমন্তের চেয়ে ঢের বেশি টাকা খরচ করেছেন, সেটা বুঝতে দেরি লাগে না।

আমি রসায়ন-রসে বঞ্চিত, কাজেই এ-ঘরের যথার্থ মর্যাদা হয়তো বুঝতে পারলুম না। সতীশবাবুরও অবস্থা বোধহয় আমারই মতো, কারণ বোকা বনবার ভয়ে তিনি একেবারে বোকা হয়ে গেলেন। কিন্তু সমঝদার হেমন্ত কৌতূহলে বালকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিপুল আগ্রহে একবার এটা, একবার ওটা পরখ করে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে মিঃ দত্তকে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।

"ওটাতে কি আছে মিঃ দত্ত?"

মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত এক রাসায়নিক পদার্থের নাম করেন ও তার গুণাগুণ বুঝিয়ে দেন।

"আর, ওটাতে?"

আবার একটা অচেনা নাম ও গুণাগুণের ব্যাখ্যা!

"তাকের ওপরে শিশি-বোতলের সঙ্গে এই থার্মসফ্লাস্কটাতে কি আছে মিঃ দত্ত?"

"লিকউইড এয়ার!"

"লিকউইড এয়ার—অর্থাৎ তরল বা দ্রবীভূত বাতাস? হাওয়াকেও আপনারা জলে পরিণত করেছেন—আশ্চর্য!"

"কিছুই আশ্চর্য নয় হেমন্তবাবু! জল দেখা যায়, বাতাস দেখা যায় না। কিন্তু দুইই প্রবাহিত হয়, তাই বিজ্ঞানে বাতাসকেও বলে তরল জিনিস বা fluid!"

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, "কিন্তু fluid হলেও জলের মতো এই দ্রবীভূত বাতাসকে দেখা যায় না তো?"

"দেখা যায় বৈকি, খুব দেখা যায়! বাতাস একরকম গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়! বাতাসের তাপ যখন zero'র দুশো সত্তর ডিগ্রি নীচে নামানো যায়, বাতাস তখনি হয় দ্রবীভূত। তাকে তখন দেখতে হয় একরকম জলের মতোই, আর জলের মতোই তাকে এক পাত্র থেকে আর-এক পাত্রে ঢালা চলে। দ্রবীভূত বাতাস বিষম ঠান্ডা। কিন্তু তার অবশিষ্ট তাপ আরও নীচে নামিয়ে আনলে সেটা জমে অধিকতর শীতল বরফ হয়ে পড়বে।"

আমি বিস্মিত-স্বরে বললুম, "জলীয় বাতাস শুনেই চম্‌কে গিয়েছি, তারপরেও বাতাস হবে আবার নিরেট বরফ! অবাক কাণ্ড! তাকে তখন দেখাবে কি-রকম?"

"অবিকল বরফের মতোই। যদিও সেটা হবে এমন ঠান্ডা যে, সাধারণ বরফকেও তখন গরম বলা যেতে পারবে। ঐ বাতাস-বরফের সাহায্যে রাসায়নিকরা—বাতাসের চেয়ে তো বটেই, পৃথিবীর সব-চেয়ে হাল্কা গ্যাসকে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে দ্রবীভূত করতে পারেন। আর তারপরের ধাপ হচ্ছে বরফে পরিণত হাইড্রোজেন!"

সতীশবাবু বললেন, "ফ্লাস্কের মুখে ছিপি না দিয়ে, তুলোর নুটি এঁটে রেখেছেন কেন মিঃ দত্ত? বাতাস দ্রবীভূত হলেও পালিয়ে যেতে পারে তো?"

"দ্রবীভূত বাতাসও উপে যায় বটে। কিন্তু ফ্লাস্কের মুখে তুলোর বদলে ছিপি এঁটে রাখলে, দ্রবীভূত বাতাস দড়াম্‌ করে পাত্র ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে।"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, "যাক, আমাদের ঋণ গায়ে-গায়ে শোধ হয়ে গেল মিঃ দত্ত! আমি শোনালুম সাধারণ ধুলোর কাহিনি! অবশ্য গুণানুসারে আপনারই কৃতিত্ব বেশি। কিন্তু এই দ্রবীভূত বাতাস আপনার কোন কাজে লাগে?"

"আমরা—অর্থাৎ রাসায়নিকরা—দ্রবীভূত বাতাসকে ব্যবহার করি অন্য জিনিসকে অতিরিক্ত ঠান্ডা করবার জন্যে। একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বিস্ফোরকরূপেও কাজে লাগানো চলে। কিন্তু বাতাসকেও দ্রবীভূত করা হচ্ছে বহু ব্যয়সাধ্য, ধনী ছাড়া আর কেউ তা পারে না। রসায়নকে শখ করে আমি প্রায় ফকির হতে বসেছি!"

হেমন্ত বললে, "আজ রাত হয়ে গেল মিঃ দত্ত, আপনার দামি সময় আর নষ্ট করব না। কিন্তু আগে-থাকতে এটাও জানিয়ে রাখছি, আপনার মতন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য যখন হল, তখন সহজে আপনাকে মুক্তি দেব না। আমি আবার এসে নতুন নতুন আশ্চর্য কথা শুনে যাব।"

মিঃ দত্ত একমুখ হেসে বললেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! অবশ্যই আসবেন, আমার বাড়িতে আপনার অবারিত দ্বার জানবেন!"

ঘরের ভিতর থেকে বেরুতে-বেরুতে হেমন্ত মাথা নাড়তে-নাড়তে বললে, "বাতাসের বরফ, বাতসের বরফ! ধন্য বিজ্ঞান, ধন্য! এবারে এসে হয়তো খেয়ে যাব, গন্ধের বরফি!"

মিঃ দত্ত হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "না হেমন্তবাবু, আপনাকে অতটা বেশি সৌভাগ্যের অধিকারী বোধহয় করতে পারব না।"

পথ দিয়ে আসতে-আসতে হেমন্ত আবার সেই নতুন বাড়িখানার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, "কি হে, আবার তুমি স্বদেশি আর বিদেশি স্থাপত্য নিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবে নাকি?"

"না, না, নির্ভয় হও! এ বাড়িখানা হচ্ছে আমার চক্ষুঃশূল।" বলেই সে হন্-হন্ করে এগিয়ে চলল।

বড় রাস্তায় পড়ে সতীশবাবু বললেন, "এইবার আমাকে খানার দিকে ফিরতে হবে। মিঃ দত্তকে কেমন লাগল?"

হেমন্ত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "চমৎকার, চমৎকার! অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লোক, তিলমাত্র পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই।" একটু থেমে স্বর বদলে আবার বললে, "সতীশবাবু আপনাকে একটি ফর্দ উপহার দিচ্ছি, কাজে লাগে কি না, দেখবেন!"

"উপহার? কি উপহার দেবেন?"

"একখানা কাগজ। মতিবাবুর যে নোটগুলো চুরি গেছে এতে তাদের নম্বরগুলো টোকা আছে। এই নিন।"

অতিশয় বিস্মিতভাবে সতীশবাবু বললেন, "অ্যাঁ! এ কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?"

"কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করলেই বাধিত হব। দিন দুই-তিন বাদে সবই জানতে পারবেন। চল রবীন!"

হতভম্ব সতীশবাবুকে সেইখানে রেখে আমরা ধরলুম বাড়ির পথ।

খানিক দূর এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ-কাগজের কথা তুমি আমাকেও বলনি কেন?"

হেমন্ত বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, "তোমাকে বলে লাভ? তুমি তো একটি আস্ত গাড়ল!"

"গাড়ল!"

"হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণির গর্দভ। এখানে আমার শুক্‌নো কাদা নিয়ে পরীক্ষার কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল?"

"তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?"

"তা নয়তো কি? তোমাকে আগেই বলিনি, এ-মামলায় আমি পুলিশকে আমার হাতের তাস দেখাতে চাই না?"

"মাপ কর ভাই, ভুলে গিয়েছিলুম!"

হেমন্ত হেসে ফেলে বললে, "আচ্ছা, এ-যাত্রা তোমাকে মাপ করা গেল!"

"কিন্তু ঐ কাগজখানা?"

"কৌতূহলে তুমিও তো আমার চেয়ে কম যাও না দেখছি! ও কাগজ-সম্বন্ধে কোনো রহস্যই নেই। আজ সকালে মতিবাবুর ডায়ারিতেই পেয়েছি নোটের নম্বরগুলো। যে-পাতায় নম্বরগুলো তোলা ছিল, খুনের দিনেই সেখানা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মতিবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বৈকালে ফিরে এসেই নোটের নম্বর টুকে রেখেছিলেন। ....হুঁ, মতিবাবু দেখছি, খুব সাবধানী লোক ছিলেন!"

কালকের ও আজকের রাতে কত তফাৎ! কাল ছিল অভাবিত কুয়াশায় চারদিক কালো, আর আজ আকাশ থেকে শহরের মাথায় ঝরে পড়েছে সোনার চাঁদের আলো!

হেমন্তও সেটা লক্ষ করে বললে, "আজ তিন দিনে প্রকৃতি দেবী তিনরকম বেশ পরিবর্তন করলেন। পরশু দেখলুম শীতের বাদল, কাল দেখলুম শীতের কুয়াশা, আর আজ দেখছি শীতের জ্যোৎস্না! রবীন, তারপর আমাদের পিছনে-পিছনে ও আবার কাকে দেখছি!"

ফিরে দেখলুম, মতিবাবুর ভাগ্‌নে বিনোদবাবু আসছেন। তাঁর চেহারা যেন আরও শুক্‌নো, রোগা ও ছন্নছাড়ার মতো বলে বোধ হল!

হেমন্ত বললে, "আরে আরে, বিনোদবাবু যে! এদিকে কি মনে করে?"

"কে, হেমন্তবাবু? রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় পথে পায়চারি করছি। আজকাল রোজ সন্ধ্যায় বিষম মাথা ধরছে। কিন্তু আপনারা এখানে কেন?"

"মিঃ দত্ত আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

"ও, তাই নাকি? আচ্ছা আসি!" বলেই তিনি ফুটপাথ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত কি আমার সম্বন্ধে কোনো কথা আপনার কাছে বলেছেন?"

"না। কিন্তু আপনার এমন সন্দেহের কারণ কি?

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, "দেখুন হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত আমার হতভাগ্য মামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে বোধহয় তিনি পছন্দ করেন না। মামার মৃত্যুর দিনে তাঁর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছিল, এ-কথা আপনারা জানেন। কিন্তু তার আসল কারণ কি, সেটা আপনারা শুনেছেন?"

"আপনি রেস খেলেন বলে মতিবাবু আপনার ওপরে বিরক্ত হয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ, আর মামার কাছে সে খবর দিয়েছিলেন ঐ মিঃ দত্তই। এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে?"

"কেন উচিত হয়নি? আপনি অসৎ সংসর্গে অধঃপাতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মতিবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন আপনার মঙ্গলের জন্যে।"

বিনোদবাবু কেবল বললেন, "ও!"

হেমন্ত বললে, "আপনাকে আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"করুন।"

"মতিবাবুর হত্যার জন্যে কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি?"

"সন্দেহ? কারুর ওপরে সন্দেহ করবার অধিকার আমার নেই।" বলেই বিনোদবাবু দ্রুতপদে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। যেতে-যেতে আমি বার-বার পিছন ফিরে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু বিনোদবাবু একেবারেই অদৃশ্য!

হেমন্ত, উচ্চহাস্য করে বললে, "রবীন, তুমি বারবার কেন যে পিছনে ফিরে তাকাচ্ছ, সে-কথা আমি বলতে পারি।"

"বল দেখি।"

"তোমার মনের ভাবটা হচ্ছে এইরকম ঃ 'কাল রাতে পথে যখন আমাদের আর পাহারাওয়ালার ওপরে আক্রমণ হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাস্থলের কাছে বিনোদকে দেখা গিয়েছিল! আজও হল আমাদের পিছনে বিনোদের আকস্মিক আবির্ভাব! এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে কি না—বিনোদ আবার লুকিয়ে আমাদের পিছনে আসছে কি না? কেমন এই তো?"

হেমন্তর কথা যে সত্য, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিনোদলালের অন্তর্ধান

পরদিন বৈকালে বসে বসে হেমন্তর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে সতীশবাবু এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

হেমন্ত বললে, "হঠাৎ এ-সময়ে? কোনো খবর-টবর আছে নাকি?"

সতীশবাবু চেয়ারের ওপর বসে পড়ে বললেন, "ভালো-মন্দ দুই খবরই আছে।"

"যথা?"

"সেই ভাঙা কাচের গেলাসের ওপরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।"

"হুঁ, সুখবর বটে।"

"আমাদের পুরানো দপ্তর থেকে এক আসামীর আঙুলের ছাপ বেরিয়েছে। দুই ছাপই এক আঙুলের।"

সাগ্রহে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্ত বললে, "কে সেই আসামী?"

"একে-একে সব বলছি। বিশ বছর আগে জাল নোট চালাবার চেষ্টা করে হরিহর নামে একটা লোক ধরা পড়েছিল। কিন্তু মামলা যখন বিচারাধীন, সেই সময়েই একদিন সে হাজত থেকে সরে পড়েছিল পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে। তারই আঙুলের ছাপের সঙ্গে গেলাসের আঙুলের ছাপ মিলে গেল অবিকল।"

"সেই হরিহর এখন কোথায়?"

"কেউ তা জানে না। হয়তো তার আসল নাম হরিহরই নয়। যখন সে হাজতে ছিল, তখন অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তার যথার্থ পরিচয় আদায় করতে পারেনি। তবে তার কথাবার্তা, হাব-ভাব ও ব্যবহারে এইটুকু অনুমান করা গিয়েছিল যে, সে ভালো ঘরের ছেলে আর সুশিক্ষিত। পুলিশ যার-পর-নাই খোঁজ নিয়েও আর হরিহরের কোনো পাত্তাই পায়নি। আজ বিশ বছর পরে হরিহরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, ভাঙা গেলাসের কাচে! জালিয়াত অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে হয়েছে হত্যাকারী! কিন্তু আবার সে অদৃশ্য হয়েছে!"

"হরিহরের ছবি আপনাদের কাছে নেই? সে নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারবে না তো?"

"ছবি নিশ্চয়ই আছে। এই নিন্ তার ছবি।"

সতীশবাবু একখানা ফোটো বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, একটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট যুবকের চেহারা। চোখ বড়-বড়, নাক টিকলো, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাথায় লম্বা চুল।

ছবিখানা খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখে হেমন্ত বললে, "বিশ বছর আগে হরিহরের বয়স ছিল কত?"

"বাইশ-চব্বিশের বেশি নয়!"

"তাহলে আজ তার বয়স হবে বিয়াল্লিশ কি চুয়াল্লিশ, এতদিনে তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। আচ্ছা, ছবিখানা আজ আমার কাছে থাক।"

আমি বললুম, "মতিবাবুকে খুন করতে এসেছিল দু'জন লোক। বোঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হরিহর; কিন্তু আর-একজন কে?"

সতীশবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "সেটাও আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেও পুলিশের হাত ছাড়িয়ে লম্বা দিয়েছে!"

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, "পালিয়েছে! কে পালিয়েছে?"

"শুনুন। মতিবাবুর চোরাই-নোটের নম্বরগুলো আপনি কি উপায়ে সংগ্রহ করেছেন, জানি না; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কারেন্সি থেকে আজই কেউ এমন দশখানা হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, যার নম্বরগুলো আছে আপনারই দেওয়া কাগজে!"

"বলেন কি মশাই?"

"হ্যাঁ। তারপরেই খবর পেলুম, আজ সকালে বিনোদলালকেও কারেন্সি আফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে!"

"বিনোদবাবু কি বলেন?"

"আপাতত বিনোদের মতামত জানবার কোনো উপায়ই আর নেই।"

"মানে?"

"বিনোদ পালিয়ে গেছে!"

"পালিয়ে গেছে! বিনোদ পালিয়ে গেছে?" উত্তেজিতভাবে হেমন্ত চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল।

"একেবারে নিরুদ্দেশ! কারেন্সি অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসে আবার কখন যে কোন পথ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়েছে, কেউ তা দেখতে পায়নি! বিনোদের নামে ওয়ারেন্ট আমি তৈরি করেই রেখেছিলুম, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখি, খাঁচার ভেতরে পাখি আর নেই!"

হেমন্ত অর্ধ-স্বগত স্বরে বললে, "বিনোদ পলাতক! বিনোদকে দেখা গেছে, কারেন্সিতে?"

অনুতাপ-ভরা কণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, "কি অন্যায়ই করেছি! গোড়া থেকেই ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তখনি যদি গ্রেপ্তার করতুম!"

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, পালিয়ে গিয়ে বিনোদ নিজেই নিজের অপরাধটা ভালো করে প্রমাণিত করলে। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে তার হাত ছিল কতখানি? সে কি হরিহরেরই হুকুম তালিম করেছিল? হরিহরও কি তার সঙ্গেই দেশছাড়া হয়েছে?

হেমন্ত হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "নিশ্চিন্ত হন সতীশবাবু। আমাকে আরো দিন-তিনেক সময় দিন। তার ভেতরেই বোধহয় এ-মামলাটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারব!"

সতীশবাবু বললেন, "এ-মামলার একরকম কিনারা তো করে এনেছিই, পাজি বিনোদ গা-ঢাকা দিয়েই তো যত মুস্কিলে ফেললে!"

হেমন্ত বললে, "কিছু ভাববেন না সতীশবাবু, বিনোদলালকে আবার আপনার হাতের কাছে পাবেন খুব শীঘ্রই। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তাকে আপনার মুঠোর ভেতর এনে দেব—এই আমার পণ!"

আরো কিছুক্ষণ কথা কয়ে সতীশবাবু নিলেন বিদায়। হেমন্ত চিন্তিত মনে চুপ করে বসে রইল।

আমি বাড়ি যাবার জন্যে যখন গাত্রোত্থান করলুম, তখন সে বললে, "রবীন, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে আর সিনেমায় যেতে পারব না। আমার হাতে আজ অনেক কাজ আছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার খুন

প্রভাতী চা পান করতে-করতে হেমন্তের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল, কুমারটুলির বিখ্যাত খ্যাঁদা বা খোকা-গুন্ডার কথা।

হেমন্ত বলছিল, "এটা তো ইংরেজের আদালতে প্রমাণিত একটা সত্য ঘটনা! বাংলা, ইংরেজি সব কাগজেই এর বিবরণ বেরিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ রবীন, খ্যাঁদা আর তার দলবল সন্ধ্যার পরেই গরাণহাটা থেকে একটা হতভাগ্য লোককে প্রকাশ্যভাবে বন্দী করে কলকাতার জনতাবহুল পথ দিয়ে খানিক খোলা ট্যাক্সিতে চড়ে, আর খানিক পায়ে হেঁটে শোভাবাজার ছাড়িয়ে এল, পথের ওপরেই তাকে খুন করলে; তার কাটামুণ্ড নিয়ে আবার বটতলায় এসে এক বন্ধুকে দেখিয়ে গেল; তারপর মুণ্ডটা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে এল—অথচ কেউ তাকে কোনো বাধা দিতে পারলে না, পথিকরাও নয়, পুলিশও নয়! কোনো উপন্যাসে এমন ঘটনা বেরুলে, সমালোচকরা অস্বাভাবিক গাঁজাখুরি বলে চেঁচিয়ে ফাটাতেন সারা আকাশখানা! কিন্তু এখন তাঁরা কি বলবেন?"

এমন সময় অত্যন্ত হন্তদন্তের মতো সতীশবাবুর সশব্দে আবির্ভাব!

হেমন্ত বললে, "কি হয়েছে? আপনার চেহারার অবস্থা তো ভালো নয়?"

"আবার খুন!" বলে সতীশবাবু ধপাস করে চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "খুন?"

"হ্যাঁ, মশাই, হ্যাঁ! আবার খুন হয়েছে, আর খুনি নিশ্চয়ই সেই বিনোদ।"

"আপনি কি বলছেন সতীশবাবু? বিনোদ খুন করেছে? কাকে? মিঃ দত্তকে নয় তো?"

"মিঃ দত্তকে সে কেন খুন করবে?"

"তার ওপরে বিনোদ মোটেই খুশি নয়।"

"না হেমন্তবাবু, খুন হয়েছে একটু নতুন লোক—কিন্তু মতিবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত আছে বলে তাকেও আমরা খুঁজছিলুম।"

হেমন্ত আবার বসে পড়ে বললে, "ভালো করে সব কথা গুছিয়ে বলুন।"

"বলি। ভোর বেলায় খবর পেলুম, গঙ্গার ধারে একটা মড়া পড়ে আছে। দেখতে গেলুম, এমন প্রায়ই যেতে হয়, কারণ, গঙ্গার ধারে লাশ পাওয়া নতুন কথা নয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! একটা জোয়ান লোকের লাশ, আর সে মারা পড়েছে ঠিক মতিবাবুর মতোই! মুখে সেই আতঙ্ক, বিস্ময় ও যন্ত্রণার চিহ্ন, আর গলায় সেই সাংঘাতিক নীল দাগ।"

"নীল দাগ!"

"হ্যাঁ। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, লোকটাকে অন্য কোথাও খুন করে তার লাশটাকে এখানে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকটাকে এখনো কেউ সনাক্ত করতে আসেনি। গায়ে পাঞ্জাবি, তার পকেটে পেলুম একখানা ছোরা—সুতরাং মানুষটি গোবেচারা ছিল না। পরনে পাজামা, পায়ে রবারের জুতো।"

"যা সন্দেহ করছেন, তা মিথ্যে নয়! গলার নীল দাগের সঙ্গে পায়ে রবারের জুতো দেখে আমারও সন্দেহ জেগে উঠল। মতিবাবুর বাড়িতে হত্যাকারীদের একজনের যে রবারের জুতোর মাপ আমরা নিয়েছিলুম, তার সঙ্গে এই জুতোর মাপ একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল!"

"এই লোকটাই সেই ভূতপূর্ব জালিয়াত হরিহর নয় তো?"

"না। এর আঙুলের ছাপ অন্যরকম।"

"তাহলে মতিবাবুর দুই খুনির একজনের সন্ধান পাওয়া গেল?"

"তাইতো মনে হচ্ছে। আর এক খুনি নিশ্চয়ই বিনোদলাল। কিন্তু সে তো পলাতক!"

"তাহলে এই নতুন হত্যার জন্যে কার ওপরে আপনার সন্দেহ হয়?"

"ঐ বিনোদের ওপরেই। হেমন্তবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিনোদ এই কলকাতাতেই গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। খুব সম্ভব, তার সঙ্গে এই লোকটা চোরাই-নোটের অংশ নিয়ে গোলমাল করেছিল, কিংবা এ তাকে কোনোরকম ভয় দেখিয়েছিল, তাই বিনোদ গলা টিপে একে বধ করে নিজের পথ সাফ করেছে।"

অল্পক্ষণ ভেবে হেমন্ত বললে, "কেসটা দাঁড় করিয়েছেন মন্দ নয়, কেবল ধোপে টিকলে হয়।"

"কেন?"

"তাহলে এর মধ্যে হরিহারের স্থান কোথায়?"

"সেইটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো পরে বোঝা যাবে। আপনি কি লাশটাকে দেখবেন?"

হেমন্ত তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বললে, "দরকার কি? আমি যে ঘটনার মালা গেঁথেছি, এটা হচ্ছে তারই একটা ঘটনামাত্র। এরপরেও যদি দু-দশটা খুন হয়, তাহলেও আমার

ঘটনার মালা নতুন করে গাঁথতে হবে না!" একটু থেমে, হঠাৎ স্বর বদলে সে আবার বললে, "সতীশবাবু, খুনিকে আপনি আজকেই গ্রেপ্তার করতে চান?"

সতীশবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "সে কি! বিনোদ কোথায় আছে, আপনি জানেন?"

"তা নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কারণ, আমি তো আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বিনোদকে আমি আবার আবিষ্কার করবই! আপাতত বিনোদ সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখন যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। আজ বৈকালে রবীনকে নিয়ে আমি মতিবাবুর শয়নগৃহে যেতে চাই। মিঃ দত্তকেও দরকার হবে, তিনিও এই খুনি-ধরা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।...আপনাকে আরো যা-যা করতে হবে বলছি, পাশের ঘরে চলুন। সেইসঙ্গে একটা নতুন জিনিসও দেখাব।"

সতীশবাবুর সঙ্গে আমিও পাশের ঘরে যাব বলে ওঠবার উপক্রম করছি, হেমন্ত হেসে উঠে বললে, "না রবীন, কৌতূহল দমন কর—তুমি এই ঘরেই থাকো। তাহলে আজ যখন এই রহস্য-নাট্যের শেষ-দৃশ্যের ওপর পড়বে যবনিকা, তখন তার বিস্ময়টা তুমি রীতিমতো উপভোগ করতে পারবে।"

সতীশবাবুকে নিয়ে হেমন্ত তার পরীক্ষা-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল—আমি একলা বিরস্ত মনে চুপ করে বসে রইলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে ওদের দুজনের মধ্যে ফিস্-ফাস্ করে কি কথাবার্তা হল, কিছুই শুনতে পেলুম না—যদিও শোনবার জন্যে আমার প্রাণ করছিল ছট্‌ফট্!

শেষের দিকে কেবল একবার শুনতে পেলুম, সতীশবাবু সবিস্ময়ে বলছেন, "কি আশ্চর্য!"

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, এবং এই লুকোচুরির জন্যে হেমন্তকে অভিশাপ দিতে লাগলুম বারংবার!

নবম পরিচ্ছেদ

দস্তানার পুনরাবির্ভাব

বৈকালে হেমন্তের সঙ্গে আমি আবার সেই ভয়াবহ ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম! মতিবাবুর শয়ন-ঘর।

সারা বাড়িটা ঠিক সমাধির মতন নীরব। লোকজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা সবাই যেন ভয়ে দমবন্ধ করে একেবারে চুপ মেরে গেছে।

মতিবাবুর শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে মনের ভিতরটা খচ্-খচ্ করতে লাগল। এই তো মানুষের জীবন। কত সাধে পাতে নরম বিছানা, কিন্তু শোবার আগেই হঠাৎ বেজে ওঠে মহাকালের ঘণ্টা—ঢং, ঢং, ঢং!

আমরা নীচে নেমে গেলুম। কিন্তু নীচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না।

হেমন্ত বললে, "কে ডাকতে এসেছে? গেল কোথায়?"

মিনিট-ছয় অপেক্ষা করেও কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

হেমন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, "চুলোয় যাক্ ইন্‌স্পেক্টারবাবুর লোক! আমার এখন অনেক কাজ। চল, আবার ওপরেই যাই।"

ঘরে ঢুকে হেমন্ত আবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছিল?"

"কেউ না। কেবল মিছে সময় নষ্ট হল। হ্যাঁ, কি বলছিলেন? এ বাড়ির সিঁড়ির তলায় চোর-কুঠরির মতো একটা ঘর আছে, কিন্তু সে-ঘরে কয়লা থাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনার মতে বিনোদ এখানে নেই?"

"না।"

মিনিট-পাঁচেক ধরে হেমন্ত গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল।

তারপর ঘরের বাইরে সিঁড়ির উপরে শুনলুম ভারী-ভারী পায়ের শব্দ! দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন হাসিমুখে সতীশবাবু।

হেমন্ত বললে, "এই যে, আসুন! ব্যাপার কি সতীশবাবু? একমুখ হাসি যে?"

মিঃ দত্ত আগ্রহ-ভরে বললেন, "বিনোদের খোঁজ-টোজ পেয়েছেন বুঝি?"

"না, পেয়েছি খালি এই জিনিস দুটো।" বলেই সতীশবাবু পকেট থেকে বার করলেন একজোড়া সাদা দস্তানা।

হেমন্ত দস্তানা-দুটো সতীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে বললে, "হুঁ। এর একটা দস্তানা আমি যে চিনি! রক্তের দাগ আর নেই বটে, কিন্তু কাচ দিয়ে কাটা অংশটা এখনো তেমনই আছে!"

মিঃ দত্ত উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তাই নাকি? কই দেখি—দেখি!"

"এই নিন।"

মিঃ দত্ত দস্তানা নেবার জন্যে দুটো হাত ব্যগ্রভাবে বাড়িয়ে দিলেন—সঙ্গে-সঙ্গে হেমন্ত দস্তানা ফেলে নিজের দু'হাতে তাঁর হাত দু'খানা জোরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সতীশবাবু টপ্ করে তাঁর জোড়া হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়ি!

বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে মিঃ দত্ত কয়েক মুহূর্ত একটাও কথা কইতে পারলেন না। তারপর চিৎকার করে বললেন, "হেমন্তবাবু! এ-সব কি প্রহসন?"

হেমন্ত বললে, "প্রহসন নয় হরিহর, বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য!"

"হরিহর! কে হরিহর?"

"তুমি হরিও হতে পারো, হরও হতে পারো, দত্তও হতে পারো! কোনটা তোমার আসল নাম, কেউ জানে না!"

খানিক পরেই মিঃ দত্ত এসে হাজির!

হেমন্ত বললে, "আসুন মিঃ দত্ত, নমস্কার! আজও আর-একবার আপনাকে কষ্ট দিলুম।"

"কষ্ট? কিছুমাত্র না। আপনাদের সাহায্য করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি করতে হবে?"

"দু-চারটে কথা জানতে চাই। নতুন খুনের কাহিনিটা শুনেছেন তো?"

"সতীশবাবুর মুখে শুনলুম। এ কি ভীষণ ব্যাপার, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে মশাই!"

"বিনোদবাবু পলাতক।"

"সব শুনেছি। বিশেষ সন্দেহজনক!"

"কিন্তু খুনিকে আমি গ্রেপ্তার করবই।"

"না হেমন্তবাবু, বিনোদ যে এমন ভয়ানক কাজ করতে পারে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

"মানুষ চেনা বড় কঠিন মিঃ দত্ত, বড়ই কঠিন। কিন্তু দু' দুটো খুন করে খুনি পালিয়ে যাবে কোথায়? আমার বিশ্বাস, সে এইখানেই আছে!"

আশ্চর্য হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, "কোথায়?"

"এই বাড়িতেই! মিঃ দত্ত, এ-বাড়িখানা যেমন মস্ত, তেমনি সেকেলে। এখানে আনাগোনা করছেন আপনি অনেক দিন। আপনি কি বলতে পারেন, এ-বাড়ির কোথাও কোনো চোর-কুঠরি আছে কি না? সেকেলে-বাড়িতে প্রায় চোর-কুঠরি থাকত!"

"আপনি কি মনে করেন, বিনোদ এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে? তা কেমন করে হবে? না মশাই, আমি কোনো চোর-কুঠরির সন্ধান-টন্ধান জানি না।"

"মতিবাবুর মুখেও কোনোদিন শোনেননি?"

"না।"

"আচ্ছা, আমার কাছে ভালো করে এই বাড়িটার বর্ণনা করতে পারেন?"

"তা নিশ্চয়ই পারি! এ-বাড়ির সবটাই আছে আমার নখদর্পণে!"

তারপর প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে দুজনের মধ্যে চলল প্রশ্নোত্তরের ঘটা। শুনতে-শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। মনে হল সমস্তটাই যেন অর্থহীন। বিনোদ নিশ্চয়ই এ-বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই—সে এমন কাঁচা ছেলে নয়! হেমন্তের ধারণা ভুল।

হঠাৎ একজন পাহারাওয়ালা এসে জানালে, ইন্‌স্পেক্টারবাবুর কাছ থেকে একজন হেমন্তবাবুকে ডাকতে এসেছে!

"আমাকে? আমাকে আবার কি দরকার? বল-গে যাও, আমি এখন ভারী ব্যস্ত। আচ্ছা থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি। এস তো রবীন, খবরটা কি শুনে আসি।"

সতীশবাবু কঠোর স্বরে বললেন, "মিঃ দত্ত, মতিবাবুকে খুন আর আশি হাজার টাকা চুরির অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।"

"কোন্ প্রমাণে?"

হেমন্ত বললে, "দত্ত, প্রমাণ কি একটা আছে? আজও তুমি মতিবাবুর টানা থেকে মতিবাবুরই চাবি দিয়ে যে চল্লিশ হাজার টাকার হিরে-মুক্তো, পান্না-চুনি চুরি করেছ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সতীশবাবু, দত্তের জামা-কাপড় খুঁজে দেখুন তো।"

মিঃ দত্ত বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাঁকে ধরে একবার ঝাঁকানি দিতেই তিনি ঠান্ডা হয়ে গেলেন। তাঁর পকেটের ভিতর থেকে সত্যসত্যই চোরাই মাল ও মতিবাবুর চাবির গোছা বেরিয়ে পড়ল।

হেমন্ত বললে, "দত্ত, এখন তুমি অপরাধ স্বীকার করবে?"

মিঃ দত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা, তবে আমার মুখ থেকেই তুমি নিজের কাহিনি শোনো। তোমাকে তো সেদিনও বলেছি দত্ত, এখনকার বৈজ্ঞানিক-পুলিশকে অপরাধীর স্বীকার-উক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পাথরের মতো বোবা হয়ে থাকলেও ফাঁসিকাঠ তোমাকে ক্ষমা করবে না।"

দশম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের কথা

সতীশবাবু, আমি সংক্ষেপেই সব বলব। যবনিকা-পতনের সময় বেশি বাক্যব্যয় ভালো নয়।

বিনোদের ওপরে আমার একবারও সন্দেহ হয়নি—সে মাতাল ও জুয়াড়ি জেনেও। প্রথমত, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা আর খুন করা এক-কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এটা ভালো করেই জানা গিয়েছে যে, খুনের সময় সে বাড়িতে ছিল না। সে যে সত্যসত্যই রাত বারোটা পর্যন্ত থিয়েটারে ছিল এবং তারপরে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল হোটেলে, এর প্রমাণ আমি নিজে গিয়ে সংগ্রহ করেছি। হোটেল থেকে সে ফিরে এসেছিল প্রচণ্ড মাতাল হয়ে। সে এমন বেহুঁশ হয়েছিল যে, খেতে গিয়ে জামা-কাপড়ে ঢেলেছিল মাংসের ঝোল আর জামা-কাপড়ের নানা জায়গা পুড়িয়ে ফেলেছিল সিগারেটের আগুনে। এমন চৈতন্যহীন মত্ত অবস্থায় কেউ এ-ভাবে এত চালাকি খেলিয়ে চুপিচুপি খুন করতে পারবে না। সতীশবাবু, কেবল এই একটিমাত্র কারণে বিনোদের উপর সন্দেহ করা আমাদের উচিত হয়নি। বেহুঁশ মাতাল যে খুন করতে

পারে না, এ-কথা আমি বলছি না। আমার মনে হচ্ছে, খুব বেশি মাতাল এত গোপনে খুন করে সরে পড়তে পারে না।

তবু যে সে পালিয়ে গেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়, কোনোগতিকে এটা সে জানতে পেরেছিল, এবং পালাবার আগে সে যে কারেন্সি থেকে রাহাখরচের জন্যে নিজের কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

আপনারা সন্দেহ করেছিলেন, হত্যাকারী হচ্ছে বাড়ির লোক। কারণ, বাড়ির সব দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ, এবং কুকুরটা চেনা লোক দেখেই চ্যাঁচায়নি। কিন্তু কাদামাখা পদচিহ্ন ও অচেনা রবারের জুতোর অস্তিত্ব দেখেই আমি বুঝেছিলুম, খুনিরা এসেছে বৃষ্টির পরে, রাস্তা থেকেই। আমি মনে-মনে খুনের রাতের ঘটনাগুলো সাজিয়েছিলুম এইভাবে। (অবশ্য এটা জানবেন যে, সমস্ত প্লটটা একদিনে একসঙ্গে হঠাৎ আমার মনের ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কোনো ঘটনা-সূত্র পেয়েছি আগে, আবার গোড়ার দিককার কোনো সূত্র পেয়েছি শেষের দিকেই।)

ধরুন, রাম আর শ্যাম মতিবাবুকে খুন করবে। রাত সাড়ে-দশটার সময় মতিবাবুর বাড়িতে ঢোকবার দরজা বন্ধ হয়, খুনিরা সে-খবর রাখে। রাত নটার সময় বৃষ্টি থামল। রাম ও শ্যাম ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে। রামের সঙ্গে মতিবাবুর চেনাশোনা ছিল। মতিবাবু তখনো শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেননি, পরিচিত লোক বলে রাম বিনা আহ্বানেই ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কুকুরটাও রামকে বিলক্ষণ চিনত, তাই গোলমাল করেনি আর রামের সঙ্গে গিয়েছিল বলে, শ্যামকে দেখেও চ্যাঁচায়নি। শ্যাম নিশ্চয় দরজার বাইরে এক-আধ মিনিট অপেক্ষা করেছিল, কারণ তার জুতোর স্পষ্ট ছাপ আমরা পেয়েছি। চলন্ত লোকের পায়ের ছাপ আর দণ্ডায়মান লোকের পায়ের ছাপ একরকম হয় না, এটা সকলেই জানে। পরে রামের আহ্বানে শ্যামও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘরের ভিতরে যায়। কাজ শেষ করে দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে-দশটার সময়ে দ্বারবান রাস্তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। কাজেই বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

রাম হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু, সে তাঁর সব অভ্যাসের কথা জানে। ডায়ারির ভিতরে মতিবাবুর কোন-কোন গুপ্তকথা আছে, এটাও হয়তো তার অজানা ছিল না। খুনের রাতে হয়তো কোনো কারণে ভয় পেয়ে বা সময়-অভাবে সে ডায়ারি পড়বার সুযোগ পায়নি। কিন্তু পরে যথাসময়ে কাজে লাগাতে পারবে বুঝে ডায়ারি আর চাবির গোছা নিয়ে পালায়। সে এ-বাড়ির বন্ধু, খুনের পরও এখানে তার প্রবেশ বন্ধ হবার ভয় নেই। খুব সম্ভব, রাম হ্যান্ডনোটে মতিবাবুর কাছ থেকে বারেবারে টাকা ধার করেছিল, তাই যাবার সময়ে নির্বিচারে সব হ্যান্ডনোটও সঙ্গে নিয়ে পালায়।

ঘটনাস্থলে এসে মতিবাবুর মৃতদেহ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। লাশের গলায় ঐ নীল দাগটা কিসের? আঙুলের চাপে ঠিক ওরকম কালশিরা পড়ে না। তারপর লাশের পিঠের তলায় ঐ ভাঙা কাচের টুকরো থাকার মানে কি? ধস্তাধস্তি হল বিছানায়, কুঁজোর মুখ থেকে গেলাস কেন এখানে এল, কেনই-বা ভাঙল, কেনই-বা একজন খুনির হাত কাটল?

আমার মন বললে, একজন খুনি গেলাসে কোনো বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে মতিবাবুর কাছে আসে। আর-একজন তাঁকে চেপে ধরে। মতিবাবুরকে গেলাসের বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়।—তিনি ধস্তাধস্তি করতে করতে বিছানা থেকে নেমে পড়েন এবং সেই মুহূর্তেই গেলাসের বিষ তাঁর গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। সে বিষ এমন ভয়ানক যে, মতিবাবু চ্যাঁচাবারও সময় পাননি—কিন্তু তাঁর ধস্তাধস্তির চোটে খুনির হাতের গেলাস ভেঙে খুনির হাত কেটে যায়। তারপর ভাঙা কাচের ওপরে গিয়ে পড়ে মতিবাবুর দেহ। সব ব্যাপার ঘটে দু-এক সেকেন্ডের মধ্যে।

বিষ যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই মতিবাবুকে গলা টিপে মারা হয়নি। কিন্তু ডাক্তাররা শবদেহে বিষের কোনো অস্তিত্ব পাননি। তবু আমার সন্দেহ গেল না। কারণ ঐ ভাঙা গেলাস! ওটা না থাকলে আমি ডাক্তারদের কথাই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু গেলাস যখন পাওয়া গেছে, মতিবাবুকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়ানো হয়েছে। সেটা কি হতে পারে? হয়তো এখন কোনো নতুন বিষ, ডাক্তাররা যার নাম জানেন না।

আপনারা কেউ লক্ষ করেননি, কিন্তু দত্তকে প্রথম দিন দেখেই আমি লক্ষ করেছিলুম তার ডানহাতের একটা আঙুলের ওপর 'ফ্রেস-কলারে'র 'প্লাস্টার' লাগানো আছে। গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য, সকলকে সন্দেহ করা। খুনির হাত বা আঙুল কেটেছে, তার প্রমাণ রয়েছে, দত্তের আঙুল কাটা! দত্ত হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু! তার এ-বাড়িতে অবাধ গতি এবং সে হচ্ছে রাসায়নিক, তার পক্ষে কোনো অজানা বিষের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব নয়। এ-সন্দেহগুলোও আমার মাথায় ঢুকেছিল; কিন্তু সন্দেহমাত্র।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ঐ দস্তানার রহস্য নিয়েও অনেক ভেবেছিলুম। কারণ ও-রকম পুরু পশমি দস্তানা কেউ হতে পরে না, বিশেষ বাংলাদেশে। তবে প্রথমে কোনোই সদুত্তর পাইনি।

পরে বুঝেছি, ঐ দস্তানাটা ছিল হরিহরের—অর্থাৎ দত্তের সঙ্গীর হাতেই। সেই-ই দস্তানা-পরা-হাতে কাচের গেলাসটা ধরেছিল, আর কাচের গেলাসটা তাকে দিয়েছিল, দত্তই। সেই সময়েই গেলাসের গায়ে দত্তের আঙুলের ছাপ পড়ে। কিংবা গেলাসটা ভাঙবার পর দত্ত তার ওপরে হাত দিয়েছিল।

কিন্তু রক্তমাখা দস্তানাটা কেন আমি নিয়ে যেতে চাই, সেটা জানবার জন্যে দত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তারপর সে চলে যায় ও পথে আমরা আক্রান্ত হই।

পাহারাওয়ালার কাছ থেকেও ভাঙা গেলাসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়। আমার কাছে দস্তানা আর পাহারাওয়ালার কাছে ভাঙা গেলাস আছে, এ-কথা বাইরের লোকের মধ্যে কেবল দত্তই জানত। সেজন্যেও তাকে আমি সন্দেহ করি। কিন্তু কেবল সন্দেহ করে তো লাভ নেই, আগে দরকার প্রমাণ।

সতীশবাবু, আমি যে দু'একটি বিষয় প্রথমে আপনার কাছে লুকিয়েছিলুম, পরে আজই সকালে আপনার কাছে প্রকাশ করেছি। ঘটনাস্থলের কর্দমচূর্ণ পরীক্ষা করবার পর তার মধ্যে আমি কাদার সঙ্গে পেয়েছিলুম চুন, সুরকি, বালি ও কয়লার গুঁড়ো। যেদিন আমরা দত্তের বাড়িতে চা খেতে যাই, সেদিন দেখলুম তার পাশেই রয়েছে, কয়লার দোকান। গলির সেখানটায় মাটির সঙ্গে চুন, বালি, সুরকি ও কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো। তার দু'তিনখানা বাড়ির পরেই দত্তের বাড়ি। সুতরাং এখানকার মাটি মাড়িয়ে তাকে রোজই আনাগোনা করতে হয়। বৃষ্টিতে পথে কাদা হলে এখানকার কাদার চাপ যে তার জুতোর গোড়ালি আর সোলের ফাঁকে লেগে থাকবে, এটা বেশ সহজেই বোঝা যায়। ঐ নতুন বাড়ি ও কয়লার দোকানই দত্তের প্রতি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

দত্তের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে আমি সকলের অগোচরে সেই নতুন বাড়ির সামনের পথ থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। পরে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম, আগেরকার কর্দমচূর্ণ আর এই একমুঠো ধুলোর উপাদানে কোনো প্রভেদই নেই। মতিবাবুকে যে খুন করেছে, ঐ নতুন বাড়ির সামনেকার মাটি মাড়িয়েই তাকে যেতে হয়েছে।

তারপর দত্তের রসায়নাগার দেখে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। সেখানে আবিষ্কার করলুম, দ্রবীভূত বাতাস। আমি রসায়নশাস্ত্র পড়েছি, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি; কিন্তু সেদিন দত্তের সামনে ন্যাকা সেজেছিলুম, তার কাছ থেকে কথা আদায় করবার জন্যে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত জাগল! দ্রবীভূত বাতাসকেই দত্ত বিষের মতো ব্যবহার করেছে। সতীশবাবু, আপনি হয়তো জানেন না, এই দ্রবীভূত বাতাসকে রাসায়নিকরা নানা নির্দোষ কাজে লাগান বটে, কিন্তু এ-জিনিস মানুষের মুখের ভিতরে ঢেলে দিলে তখনি তার মৃত্যু হবে, অথচ মৃতদেহে তার কোনো চিহ্নই পাওয়া যাবে না। কি মারাত্মক বুদ্ধি চাতুরি! ভাগ্যে দ্রবীভূত বাতাস হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস—সাধারণ হত্যাকারীর নাগালের বাইরে! নইলে দ্রবীভূত বাতাস মানুষের সমাজে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারত।

দ্রবীভূত বাতাস এমন ভয়ানক ঠান্ডা যে, পরীক্ষাগারে হাতে পুরু দস্তানা না পরলে কাচের পাত্রে তাকে নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব। এইজন্যেই হত্যাকারী হাতে দস্তানা পরে কাচের গেলাসে দ্রবীভূত বাতাস ঢেলে মতিবাবুকে তা পান করতে বাধ্য করেছিল!

তারপর হরিহরের অস্তিত্ব আবিষ্কার! সতীশবাবু আমাকে যে ছবি দিয়েছিলেন, তাতে হরিহরের মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, কিন্তু দত্তের মুখে গোঁফ আর ফেঞ্চ-কাট্ দাড়ি। দত্তের বয়স এখন চল্লিশের ওপরে, তার মুখেরও কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হরিহরের মুখের সঙ্গে দত্তের মুখের কিছু-কিছু সাদৃশ্য আমি পেয়েছিলুম। আমি কিছু-কিছু ছবি আঁকতেও জানি। হরিহরের চোখ, নাক, ঠোঁট অনেকটা দত্তের মতোই। তাই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে হরিহরের ছবির মুখে বসিয়ে দিলুম দত্তের মতো গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ি! ফল হল বিস্ময়কর! বুঝেছ রবীন, সতীশবাবু সেই ছবি দেখে সেখানাকে প্রথমে দত্তের ছবি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর আমাদের জানতে বাকি রইল না, আমাদের দত্তমশাই—থুড়ি, মিঃ দত্ত হচ্ছেন কোন দেশের বাজ-পাখি!

'লিক্উইড্ এয়ার' দিয়ে দত্ত তার পাপ-কাজের সঙ্গীকেও পাঠিয়ে দিয়েছে যমের বাড়ি। কি করে তাকে মারা হয়েছে, এখনো তা প্রকাশ পায়নি বটে, তবে হত্যাকারী যে দত্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই! দ্রবীভূত বাতাসের এমন ভয়াবহ ব্যবহার পৃথিবীর আর কেনো অপরাধী বোধহয় জানে না। দত্ত তাকে মেরেছে কেন? একজন সাক্ষী বা অংশীদার বা পথের কাঁটা সরাবার জন্যেই।

দত্ত জানত, আমি রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করি। তার ভয় হয়েছিল, এ-রকম অসাধারণ দস্তানা দেখে আমার মনে দ্রবীভূত বাতাস সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত জাগা হয়তো অসম্ভব নয়। অপরাধীর মন কিনা! তাই ওপর-চালাকি করতে গিয়ে, দস্তানা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় মতিবাবুর ডায়ারিখানা!

আর একটু বাকি আছে। দত্তকে হাতে-নাতে ধরবার জন্যে আজ আমি এখানে ফাঁদ পেতেছিলুম! খুনির পকেট থেকে ডায়ারি হস্তগত করেই আমি বুঝেছিলুম, খুনি যখন মতিবাবুর চাবি নিয়ে গেছে, তখন টেবিলের গুপ্তস্থান থেকে চল্লিশ হাজার টাকার হিরে-মুক্তো চুরি করার প্রথম সুযোগ যে কখনোই ছাড়বে না! দত্তের আবির্ভাবের আগেই আমি টেবিলের ডানদিকের টানার ফাঁকে এমনভাবে একটা আলপিন ঢুকিয়ে রেখেছিলুম যে, কেউ টানা খুললেই আলপিনটা সরে পড়ে যাবে!

তারপর দত্ত এল। পাহারাওয়ালাকে শেখানো ছিল, সে একটা বাজে কথা বলে আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। দত্ত রইল ঘরে একা! মিনিট-কয় পরে আমরা ফিরে এলুম। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, টানার ফাঁকে আলপিন নেই। তখনি বোঝা গেল, দত্ত সুযোগের অপব্যবহার করেনি!

এদিকে দত্ত যখন এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা কইছে, সতীশবাবু তখন গিয়েছেন দত্তের রসায়নাগার ও বাড়ি খানাতল্লাশ করতে! তারি ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে দস্তানাজোড়া! ঐ দস্তানাও এই মামলায় এক বড় সাক্ষীর কাজ করবে।

দত্ত, এখনো কি তুমি অপরাধ স্বীকার করবে না? দেখছ তো, তোমার প্রতি-পদক্ষেপের হিসাব রয়েছে আমার কাছে! অতিরিক্ত চালাকের মতন তুমি খুনের জন্যে এমন একটা দিন নির্বাচন করেছিলে, যেদিন হয়েছিল মতিবাবুর সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া! তারপরে আমাদের ভিতরের খবর জানবার আর বিনোদের উপরে দোষ চাপাবার জন্যে তুমি সেজেছিলে পুলিশের সাহায্যকারী বন্ধু। তুমি হচ্ছ গভির জলের মাছ! অসাধারণ মস্তিষ্কচালনা করেছিলে বটে, কিন্তু পাপির সমস্ত চাতুর্যই মিথ্যা। ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন না!

এত সেয়ানা হয়েও দত্ত ধরা পড়ল প্রধান তিনটে কারণে। প্রথমত, সেই তুচ্ছ চুন-বালি-সুরকি-কয়লার গুঁড়ো। দ্বিতীয়ত, ভাঙা কাচের ওপরে তার আঙুলের ছাপ। তৃতীয়ত, ওপর-চালাকি করে যে যদি আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ না করত, তাহলে আমিও ঐ দ্রবীভূত বাতাসের অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যবহারটা আন্দাজে কল্পনা করতে পারতুম না! বলতে কি, দ্রবীভূত বাতাসের কথা একবারও আমি ভাবিনি। কিন্তু দত্তের রসায়নাগারে ঐ দুর্লভ জিনিসটিকে দেখেই আমার মনের ভিতরে জেগেছিল একটা আশ্চর্য সন্দেহ!

সতীশবাবু, এখনো কি আপনি বিনোদকে গ্রেপ্তার করতে চান? কিন্তু আর সে আপনাকে ভয় করবে না, দু'দিন পরেই আবার তার দেখা পাবেন। খবরের কাগজে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের বিবরণ বেরুলেই বিনোদ আর অজ্ঞাতবাস করতে রাজি হবে না!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনোদ এবারে ভালো ছেলে হবে।

সতীশবাবু, আর-একটা কথা। য়ুরোপে এখন বিজ্ঞান-জানা খুনি, চোর বা অপরাধীর দল রীতিমতো ভারী। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, এদেশের অপরাধীরা এখনো পাপ-কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে শেখেনি। অবশ্য এটা সকলেই জানে যে, বিখ্যাত পাকুড়-খুনের মামলায় প্রকাশ পেয়েছে; অপরাধীরা হত্যাকার্যে প্লেগের জীবাণু ব্যবহার করে অভাবিত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে! কিন্তু এ-শ্রেণির শিক্ষিত অপরাধী এখানে দুর্লভ। নইলে এ-দেশি পুলিশকে সাত হাত জলের তলায় পড়ে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাবুডুবু খেতে হত! তবু আমার মত হচ্ছে, এদেশের পুলিশের উচিত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও বৈজ্ঞানিক-অপরাধীর দল ভারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই!

এস রবীন, শ্রীমান দত্তের সামনে পরলোকের দরজা খুলে দিয়ে এখন আমরা সসম্মানে প্রস্থান করি। নমস্কার, সতীশবাবু। দত্ত, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে আর নমস্কার করবার ইচ্ছা হচ্ছে না!

ছিন্নমস্তার মন্দির



সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছিন্নমস্তার মন্দির—



....বাবার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে লাগলো....



সে আঘাতে ঘোড়া সামনের দুই পা তুলিয়া লাফ দিল।

ছিন্নমস্তার মন্দির—



হরেন ডাকিল—বন্ধু....ব্র্যাম্বক বলিল—ইয়েস

ছিন্নমস্তার মন্দির

এক

বি-এ এগ্‌জামিন দিয়া প্রকাশ আর হরেন কোমর বাঁধিল,—সামনে লম্বা ছুটি—শহরের বুকে বসিয়া তারা তাস-পাশা খেলিয়া এ ছুটি কাটাইয়া দিবে না; খুব লম্বা পাড়ি দিয়া বহুদূরে সেই তেপান্তরের মাঠ ঘুরিয়া আসিবে। কোথায় যাইবে, তাহা লইয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় লেকের ধারে বসিয়া দুজনে বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

প্রকাশ বলিল—হুট্ বলতে সকলে যে-সব জায়গায় ছোটে, সে-সব জায়গায় যাব না। এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে কেউ বড়-একটা যায় না!

হাসিয়া হরেন বলিল—And from whose bourne no traveller returneth (যে-জায়গা হইতে কেহ আর ফিরিয়া আসে না)! তুই এই কথা বলতে চাস প্রকাশ?

প্রকাশ বলিল—তুই নেহাৎ মুখ্যু, তাই এমন কথা তোর মনে জাগে!

হরেন বলিল—তা বেশ, তুই তো পণ্ডিত-লোক, কোথায় যাবি, তুইই বল্! বসে-বসে জিওগ্রাফি আওড়াস যদি, তাহলে ছুটির দিনগুলো এদিকে ফুরিয়ে যাবে!

প্রকাশ কহিল—আমার মাথায় একটা যা আইডিয়া জেগেছে...সত্যি, শুনলে তুই লাফিয়ে উঠবি, হরেন!

গভীর আগ্রহে হরেন বলিল—সেই আইডিয়ার কথাই বল্ যে বুঝি!

প্রকাশ কহিল—সে আইডিয়ার কথা বলবার আগে আর একটা কথা বলি, শোন...

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র। চাঁদ নাই। লেকের দুই তীরে বিজলী-বাতির মালা দুলিতেছে...সেখানকার গাছপালার ছায়ায় সে-আলো মিশিয়া চারিদিকে কেমন একটা স্বপ্নময়তার আভাস জাগাইয়া তুলিয়াছে! লেকের দক্ষিণ-গায়ে রেলোয়ে লাইন। সেই লাইনের উপর দিয়া একখানা গুডস-ট্রেন গুরুগম্ভীর শব্দে দীর্ঘ সরীসৃপের মতো ধীর-মন্থর-গতিতে চলিয়াছে শেয়ালদার দিকে।

প্রকাশ নীরবে ক্ষণকাল ঐ গতিশীল ট্রেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরেন বলিল—মনে-মনে স্বপ্ন রচনা করছিস্ কি! বল্...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ বলিল—কামরূপ কামাখ্যার কথা শুনেছিস, নিশ্চয়?

হরেন বলিল—তা আর শুনিনি! মস্ত তীর্থ...

প্রকাশ বলিল—তীর্থের কথা বলছি না। এখনো সে-বয়স হয়নি যে তীর্থের নামে নেচে উঠব! তা নয়।

হরেন বলিল—তবে?

প্রকাশ বলিল—ওখানে না কি সব ভারী অদ্ভুত ব্যাপার হয়!...ওখানকার লোকজন অনেকরকম তুক্‌তাক্ জানে!

অধীর আগ্রহে হরেন বলিল—শুনেছি, ওখানকার লোক মানুষকে ভেড়া করে দিতে পারে...স্রেফ মন্তর পড়ে!

প্রকাশ বলিল—ভেড়া-টেড়া করা—ও আমি বিশ্বাস করি না। বাজে কথা! তা যদি পারতো, তাহলে ওখান থেকে গাড়ি-গাড়ি মটন চালান আসতো! তা নয় রে। ওখানে...

হরেনের তর সহিল না! হরেন বলিল—আমি কামাখ্যার কথা জানি। আমার এক পিসিমা সেবার কামাখ্যার মন্দিরে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের আঁচলের ন্যাকড়া খানিকটা এনেছিলেন। আমাকে এক-টুকরো দেছেন। এখানো আমার কাছে আছে। সে-ন্যাকড়ার এমন গুণ যে সঙ্গে নিয়ে যে-কাজে বেরুবি, প্রত্যক্ষ সিদ্ধি-লাভ! এগ্‌জামিন দিতে যাস্ যদি, নির্ঘাৎ পাশ!

প্রকাশ বলিল—এগ্‌জামিনের সময় সে-ন্যাকড়া তুই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলি?

সোৎসাহে হরেন বলিল—নিশ্চয়।

প্রকাশ বলিল—তাহলে তুই পাশ...কি বলিস? কিন্তু আমি তোর ও-কামাখ্যার মন্দিরের কথা বলছি না। সেখানে আছে ছিন্নমস্তার মন্দির। আমি সেই ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথা বলছি।

হরেন বলিল—আছে না কি? তা জানি না। শুনেছি, কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর মন্দির। সে পাহাড়ের নাম নীলাচল।...কে না কি নরকাসুর ছিল ঐ মন্দিরের রক্ষক...সেই রক্ষক কামাখ্যা দেবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল...

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—আঃ! তুই চুপ করবি, হরেন? আমি কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কথা বলছি না। আমি বলছি, ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরের কথা। এ মন্দির ঐ কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কাছে। শুনেছি, নীচে পাহাড়ের কোলে ব্রহ্মপুত্র...সেই ব্রহ্মপুত্রের বুকে আছে উমানন্দ দ্বীপ,—উত্তরে ভুটানের পাহাড়...অর্থাৎ গৌহাটির কাছে।

হরেন বলিল—হয়েছে! এমনি করে যদি বলতে শুরু করিস, তাহলে তোর আইডিয়ার মলাটখানার সঙ্গেই আজ পরিচয় হবে...সে মলাট খুলে আইডিয়ার মধ্যে আর প্রবেশ করা হবে না!

প্রকাশ কহিল—শোন্ না, যা বলি! এত অধীর হলে এর পর জীবনে কি আর কিছু করতে পারবি?

হরেন বলিল—জীবনে পরে কি করতে পারবো না পারবো, অত হিসাব না কষলেও

তোর ভূমিকা যদি এই রেটে বেড়ে চলে, তাহলে আজ আর-একটু পরে কি করতে পারবো, তা আমি জানি।

প্রকাশ বলিল—কি করবি, শুনি?

হরেন বলিল—এখান থেকে সটান সরে পড়বো। অ্যাদ্দিন ঘ্যানঘ্যান করে এগজামিনের পড়া পড়েছি। এখন এগজামিনের পরেও তুই যদি সে ঘ্যানঘ্যানানির সুরে সামনে বকতে থাকিস, তাহলে পলায়ন করা ছাড়া আত্ম-রক্ষার আর উপায় কি, বল?

প্রকাশ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—একজন ইংরেজ লেখক বলে গেছেন, মানুষকে গল্প বলবো কি, গল্প শোনবার যোগ্যতা ক'জন মানুষের আছে!

হাসিয়া হরেন বলিল—আর-কার কতখানি যোগ্যতা আছে, জানি না প্রকাশ, আমার যোগ্যতা তুই কিন্তু তোর এই ভূমিকাতেই খর্ব করে দিচ্ছিস। যা বলবি, চট করে বল।

প্রকাশ বলিল—এই কামাখ্যার কাছে রঙ্গিয়া। রঙ্গিয়া হল আসাম-বেঙ্গল রেলের একটা জংশন স্টেশন। আমার এক মামা সেই রঙ্গিয়ার স্টেশন-মাস্টার। মামার কাছে সেবার অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শুনেছি ভাই...ওখানকার দেব-দেবীদের অমানুষিক লীলার গল্প! গাঁজা বলে সে-গল্প উড়িয়ে দিলেও সেই থেকে আমার মনে ইচ্ছে আছে, গিয়ে আসামটা একবার দেখে আসি। এই বিজ্ঞানের যুগে, রিয়ালিস্টিক যুগে এখনো ঐ সব আষাঢ়ে কথা মানুষ কোন মুখে বলতে আসে, আমি তাই ভাবি।

কথাটা শুনিয়া হরেন শুধু প্রকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

লেকের ওপারে দূরে কে গান গাহিতেছিল...জলের বুক বহিয়া সে সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

প্রকাশ বলিল—মামা বলছিল, একজন সাহেব নাকি মন্দির দেখতে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে আমাদের দেব-দেবীদের উপর, আমাদের ভক্তির উপর ঠাট্টা-টিটকিরি করেছিল—শুধু তাই নয়, পোড়া সিগার ফেলেছিল মন্দিরের সামনে। পাণ্ডারা বলেছিল, এমন অন্যায় কাজ করো না সাহেব, প্রাণে বাঁচবে না! হেসে মন্দিরের পাথরের সিঁড়িতে বুট ঠুকে সাহেব বলেছিল,—ফুঃ! তারপর সেইদিন রাত্রে সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে! বলে, মাথা নেই...কে একজন মেয়ে-মানুষ...হাতে মানুষের কাটা এক-গাদা মুণ্ডু নিয়ে সাহেবকে অ্যাটাক করতে এসেছিল। সাহেব ভয়ে কাঁপছিল। সে-ভয় তার ঘুচল না...ভুল বক্‌তে-বক্‌তে কাঁপতে-কাঁপতেই সাহেব শেষরাত্রে দেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি হয়ে মারা যায়!

হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ রেখা.....হরেন বলিল—সত্যি? য্যাঃ...

হাসিয়া প্রকাশ বলিল—মামা বলে, সত্যি। আমি কিন্তু শুনে গাঁজা বলে উড়িয়ে

দিয়েছি! বলেছিলুম, দেবতাদের যদি তেমন শক্তি-প্রতিপত্তি থাকবে, তাহলে যারা ঐ দেবতাদের মানে, পূজা-অর্চনা করে, তাদের এত দুঃখ-দুর্দশা কেন, বলতে পারো মামাবাবু?

হরেন বলিল—তামাশা করিস নে প্রকাশ! আফ্রিকার ম্যমির গল্প শুনেছিস তো! বহু সভ্য জাতের বহু পণ্ডিত ঐ সব ম্যমি নিয়ে কত তাচ্ছিল্য, কত ব্যঙ্গ করেছেন! কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাকেও আর প্রাণে বাঁচতে হয়নি!...একটা কথা আমি সার বলে জেনেছি ভাই...সে কথা হচ্ছে, কারো ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে তামাশা করা উচিত নয়। তাতে মঙ্গল হয় না....অমঙ্গল হয়। না হলে যাদের মতো বাস্তববাদী জগতে আর কেউ নেই—মানে, আইন-কর্তা....তাঁরা পেনাল্ কোডে সব জাতের রিলিজস্ সেন্টিমেন্ট মেনে একটা সেক্শন গুঁজে দিতেন না!—শুনেছি, পরের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করলে পেনাল কোডের ধারায় কি-একটা সাজা হয়। ছোটখাট জরিমানা-সাজা নয়; জেল পর্যন্ত!...ধর্ম-বিশ্বাস বলো, আর দেবদেবী বলো...এই যে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে মানুষের মনে আধিপত্য করছে,...দু'পাতা সায়েন্স পড়ে, দুটো অ্যাসিড মিশিয়ে কেরামতি করে আমরা ভাবি, ভারী পণ্ডিত হয়ে উঠেছি! সত্যি প্রকাশ, দেবদেবীকে বিশ্বাস না করি, অবিশ্বাসও আমি করি না। ভক্তি-ভরে কালীঘাটের মন্দিরে যাই না কোনো দিন...কিন্তু গেলে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করি। আর সে-প্রণাম ভক্তি-ভরে করি।

প্রকাশ নিঃশব্দে হরেনের কথা শুনিল...তারপর বলিল—আচ্ছা,—আমরা যদি রঙ্গিয়ায় যাই? মামার ওখানে গিয়ে উঠব। তারপর কামাখ্যা দেবীর মন্দির....আরও ওদিকে যা-যা আছে...বক্সা রোড, জয়ন্তী, কুচবিহার, পাণ্ডু,...যা পারি, সব দেখে আসব!

সোৎসাহে হরেন বলিল—ফার্স্ট ক্লাস হবে। সত্যি! বাঃ! এই তো আমি চাই। বেড়াতে গেলেই শৌখিন বাঙালি-বাবুরা ছোটেন এদিকে দার্জিলিং, কার্শিয়ং, না হয় শিলং; আর ওদিকে মধুপুর, বদ্দিনাথ, গিরিডি, গয়া, নৈনিতাল, দিল্লি, আগ্রা, ডেরাডুন, সিমলা-হিল্স্, কাশ্মীর!...আমি বলি, ওরে হতভাগা কূপ-মণ্ডুকের দল, পয়সা খরচ করে বেরুচ্ছিস যখন, তখন ঐ বাঁধা-ধরা রুটিন ছেড়ে জবুথবু সভ্য সাজিস কেন?...চলে যা মণিপুর-কাঞ্চনজঙ্ঘা-তিব্বত! হুঁ!....তাহলে আর জল্পনা-কল্পনা নয় প্রকাশ...তুই ব্যবস্থা করে ফ্যাল। আমি রেডি। কাল না হয় পরশু...লেট্ আস্ স্টার্ট টু রঙ্গিয়া ...তারপর রঙ্গিয়া থেকে কামরূপ-কামাখ্যা অ্যান্ড সাচ আদার প্লেসেস্!

দুই

রঙ্গিয়া স্টেশনে দু'জনে যখন নামিল, তখন ভোরের আলো ভালো করিয়া ফোটে নাই।

স্টেশনটি বেশ বড়।

হরেন বলিল—মামাকে টেলিগ্রাম করেছিস?

প্রকাশ বলিল—না।...হঠাৎ এসে সকলকে চম্‌কে দেব, ঠিক করেছি!

হরেন বলিল—দু'জনে লগেজ যা এনেছি...

প্রকাশ বলিল—ভয় নেই! গুড্‌স্ শেড্ আছে...মামার কোয়ার্টার্সে না ধরে, এ-সব সেখানে থাকবে'খন।

প্রকাশের মামা নিরঞ্জনবাবু রঙ্গিয়ার স্টেশন-মাস্টার। দু'জনে সন্ধান লইয়া জানিল, তিনি বাসায় আছেন। এখন তাঁর ডিউটি নয়। তাঁর বাসা স্টেশনের বাহিরে পথের ও-ধারে।

বাঙলো। বাঙলোর সঙ্গে বাগান আছে। বাগানে নানা ফল-ফুলের গাছ।

কুলির মাথায় লগেজ চাপাইয়া দু'জনে চলিল নিরঞ্জনবাবুর বাসায়।

ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া নিরঞ্জনবাবু বাঙলোর বারান্দায় একখানা ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন; প্রকাশকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—তুই হঠাৎ কোথা থেকে?

প্রকাশ বলিল—বাড়ি থেকে।....এগজামিন হয়ে গেল, বেড়াতে এলুম। এটি আমার বন্ধু। এর নাম হরেন।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এইখানে বোস্...ঐ ক্যাম্প-খাটে। তোর মামীমার ক-দিন অসুখ চলেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। দুটো ছেলের অসুখ। সারা রাত জ্বর গেছে। শেষ-রাত্রে জ্বরটা নেমেছে—এখন ঘুমুচ্ছে। সারা রাত আমার কাল জেগে কেটেছে!

তারপর কুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুই ভিতরে গিয়ে চুপি চুপি সনাতনকে ডেকে আন তো। এদের মুখ-হাত ধোবার জল দিক...চায়ের জল চড়াক...

কুলি গেল অন্দরে। নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ট্রেনে ঘুম হয়েছিল?

প্রকাশ বলিল—ট্রেনে চড়লে আমার এক-দম ঘুম হয় না, মামাবাবু। ঘুমিয়েছে বটে হরেন! ওঃ, কি ঘুম! ট্রেনে উঠেই বিছানা পেতে শোয়া—ব্যস, রাত্রে একটিবার ওঠেনি!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—হুঁ! ট্রেনে ঘুমোতে পারলে কষ্ট হয় না। তা চাস যদি, দু'জনে না হয় একটু গড়িয়ে নে। এখন তো সবে এই পাঁচটা বেজে চব্বিশ মিনিট।

প্রকাশ বলিল—না মামাবাবু, ঘুমোবো না! মুখে-চোখে জল দিয়ে একটু বরং ঘুরে আসি। ভারী চমৎকার লাগছে এখানে এই সকাল-বেলাটা।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—কলকাতার ঘেঞ্জি-ভিড়...ভোরেই ময়লা-গাড়ির হটর-হটর তারপর রাস্তায় ফড়্-ফড়্ করে জল দিচ্ছে। লোকে বলে, প্রভাতকে বন্দনা করতে হয়। তা কলকাতা শহরে বন্দনার যা ঘটা...মানুষ ওখানে আবার মর্নিংওয়াকে বেরোয়।

....এখানে এখনি শুন্‌বি গাছে-গাছে পাখি ডাকছে...কোথায় লাগে তার কাছে তোদের শহরের রেডিয়ো! কলকাতা ছেড়ে যেখানে যাবি, সব জায়গা ভালো লাগবে! কলকাতায় আমি তো একদণ্ড থাকতে পারি না! ঐ ভিড়ে আর হট্টগোলে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে!

প্রকাশ এ-কথার জবাব দিল না, হরেন চাহিয়াছিল বাহিরে আকাশের পানে।

চারিদিক হইতে বনানী প্রশান্ত স্নেহচ্ছায়া বিছাইয়া জায়গাটিকে সযত্নে ঘিরিয়া রাখিয়াছে! এখনো সকাল হয় নাই। ইহার মধ্যে পথে ভুটিয়া পশারীদের ভিড়। হন-হন করিয়া তারা পথ চলিয়াছে...নিঃশব্দে...কোথায়, কে জানে!

প্রকাশ বলিল—এত কিসের পশারী, মামাবাবু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এটা ব্যবসার দেশ রে! ভুটিয়ারা আসে—অঢেল গালা, লঙ্কা নিয়ে আসে। তাছাড়া ভুটান খুব কাছে কিনা, ভুটানিরা আনে কম্বল, টাট্টু-ঘোড়া, ছাগল, ভুটিয়া-কুকুর।

হরেন একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আমরা অফিসে কেরানিগিরি খুঁজে মরি, অথচ দেশের মায়া কাটিয়ে একটু যদি দূরে বেড়িয়ে আসি, তাহলে আমাদের এই বাবুর দল অভাব-দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—কেরানিগিরির নাগ-পাশই বাঙালি-জাতটাকে বেঁধে মারছে বাবা!

প্রকাশ বলিল—এ সব দেশে আমাদের অনেক ইতিহাস বোধ হয় জড়িয়ে আছে?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আছেই তো! এই রঙ্গিয়া থেকে একটা ব্রাঞ্চ-লাইন গেছে রঙ্গপাড়া। ওদিকে বহু চা-বাগান। তার উপর রঙ্গপাড়ার ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের উপর তেজপুর বলে একটা জায়গা আছে। খাসা জায়গা। এই তেজপুর ছিল আমাদের পুরাণের শোণিতপুর। আসামী-ভাষায় 'তেজ' কথার মানে হল 'রক্ত', 'শোণিত'। শ্রীকৃষ্ণের এক ছেলে ছিল অনিরুদ্ধ—রবিবর্মার ছবি আছে, ঊষার স্বপ্ন...পুরাণ-টুরাণগুলো পড়েছিস্ কখনো? জানিস, সেই ঊষা ছিলেন এখানকার বাণ-রাজার মেয়ে। অনিরুদ্ধর সঙ্গে ঊষার বিয়ে হয়েছিল পরে। ঊষার বাবা বাণ-রাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল ঐ তেজপুরে। তেজপুরের কাছে ছোট একটা পাহাড় আছে। সে পাহাড়ের নাম ঊষা পাহাড়। আজও পাহাড়টার সেই নাম রয়ে গেছে! এ-সব হল পুরাতত্ত্বের কথা। বাজে নাটক-নভেল ছেড়ে একটু-আধটু চর্চা করিস দিকিনি!

একাগ্র মনোযোগ প্রকাশ আর হরেন এ কাহিনি শুনিল।

প্রকাশ বলিল—কোথায় সেই দ্বারকা, অ্যাঁ! সেখান থেকে এই আসামে অনিরুদ্ধ এসেছিল বাণ-রাজার মেয়ে ঊষাকে বিয়ে করতে।

প্রকাশ ডাকিল—হরেন...

হরেনের মনে ভারতের পৌরাণিক যুগ তখন বেশ খানিকটা আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে! হরেন ভাবিতেছিল...

প্রকাশের আহ্বানে তার চিন্তা-সূত্র কাটিয়া গেল। সে চাহিল প্রকাশের পানে।

প্রকাশ বলিল—তুমি তো হিস্ট্রির স্টুডেন্ট...কর এবার ঐতিহাসিক পঙ্কোদ্ধার। বেশি নয়, শুধু এই আসামের তেজপুরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ-রাজার যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দাও। তোমার জোগাড়-করা মশলা নিয়ে কলকাতার বাবু-কবির দল হয়তো এপিক রচনা করবে। আর বাঙলার শেক্সপীয়র, ইবসেন-নাট্যকারেরা সে মশলা নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করবে—'জয় তেজপুর-নাটক'...

হাসিয়া হরেন বলিল—একালের কবিরা এপিকে হাত দিয়ে প্রতিভায় ঘুণ ধরায় না! তারা লেখে দুর্বোধ্য লিরিক...বস্তির পচা আবহাওয়া আর যত সব ছাইপাঁশ নিয়ে!

একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, দেখি বটে! ইলু এবার শ্বশুর-বাড়ি থেকে একরাশ মাসিক-পত্র এনেছে...সেদিন বসে বসে সেই সব মাসিকের পদ্য দেখছিলুম। দেখে গা শিউরে উঠল! একটা পদ্যর কটা লাইন এখনো মনে আছে। কবিতার নাম 'পাঁক'। লিখেছে—

কার্পেট গালিচা নিয়ে শৌখিনের দল
কত লেখালেখি করে। আর তুমি পাঁক,
দুর্গন্ধ গলিত পাঁক—পচা প্যাচ্‌পেচে...

পড়ে হাসি চেপে রাখা দায়—ঐ নে প্রকাশ, সনাতন এসেছে জল নিয়ে। মুখ-হাত ধুয়ে নে।

বালতি ভরিয়া সনাতন জল এবং সাবান-তোয়ালে আনিয়া দিল।

প্রকাশ বলিল—নি...

সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এখন এক-কেটলি চায়ের জল চড়িয়ে দিতে পারবি বাবা—হ্যাঁ রে সনাতন? এখন তো তোর রেলের ডিউটি নেই!

সনাতন বলিল—স্টোভ জ্বেলে পারব বৈ কি।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—তাহলে দে বাবা! এ হল প্রকাশ...বুঝলি, আমার ভাগনে হয়। কলকাতা থেকে ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁচেছে।...আর এটি প্রকাশের বন্ধু। তোমার কি নাম বাবা?

সবিনয়ে হরেন বলিল—আজ্ঞে, আমার নাম হরেন।

বালতি-সাবান-তোয়ালে রাখিয়া সনাতন চলিয়া যাইতেছিল, নিরঞ্জনবাবু ডাকিলেন—সনাতন...

সনাতন ফিরিয়া চাহিল।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ওদের আর এখন ডাকিস্ নে। বাবুরা একটু বেড়াতে যাবেন

বলছেন। যাক বেড়াতে। তুই শুধু ঠাকুরকে ডেকে দে বাবা, দিয়ে স্টেশনে যা। ঠাকুর উঠে খাবার তৈরি করুক...হালুয়া, লুচি, ভাজা! আর বাবুদের জন্য সেই ভুটানি মেঠাই দিতে বলবি—বুঝলি? বজরঙ্গিবাবুর ওখান থেকে কাল সন্ধ্যার সময় যে-মেঠাই দিয়ে গেছে...বুঝতে পারলি তো?

সনাতন বলিল—বুঝেছি...

বলিয়া সনাতন চলিয়া গেল। নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—সনাতন হল সিগ্‌নালার। এই অসুখে কম পরিচর্যা করছে! ওর জায়গা-জমি আছে। সিগনালার হলেও আমাদের উপর ওর খুব টান।

সুযোগ বুঝিয়া প্রকাশ বলিল—তোমার এ সনাতনটি বাঙালি?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না। ও এখানকার লোক। তবে ও কথাবার্তায় বাঙালি হয়ে গেছে।...আমিনগাঁয়ের কাছে আছে হাজো....সেই হাজোয় সুনিবুনি পাহাড় আছে, ওর বাবা সেই পাহাড়ে কোটিদেবীর মন্দিরে পাণ্ডা ছিল।

প্রকাশ বলিল—পাণ্ডা!...ওরা বামুন?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না। গায়ের জোরে সে পাণ্ডা হয়েছিল। তারপর তার যে কাহিনি...ওঃ, সে ঠিক তোদের নভেলের গল্প! এদেশের এদের কথা কেউ শোনে না। থাকতো আমাদের দেশে কোনান্ ডয়েলের মতো কোনো লিখিয়ে, তাহলে লিখতে পারত। সে একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! শুনিস বরং ঐ সনাতনের মুখে! তোরা কলকাতার লোক, গাঁজা বলে হয়তো উড়িয়ে দিবি। কিন্তু সত্যি ঘটনা রে! বুজরুকি নয়, কল্পনার ভেলকি-ফাঁকি নয়...শুনলে বুঝতে পারবি। শেক্সপীয়র কি শুধু শুধু অত-বড় কথাটা বলে গেছেন...There are more things in Heaven and Earth...

নিরঞ্জনবাবুর এই কথার বাতাস দুই বন্ধুর চায়ের পেয়ালায় রোমাঞ্চের চপল তরঙ্গ তুলিয়া দিল!

তিন

দু'তিন দিন পরে মামীমার অসুখ সারিলে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া প্রকাশ আর হরেন সনাতনকে ধরিয়া বসিল—তোমার বাবার কথা বলো সনাতন। মামাবাবু বলছিলেন, সে নাকি ভারী আশ্চর্য কাহিনি!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল—আপনারা সে-কথা বিশ্বাস করবেন না, বাবু...বলবেন, মুখ্যু-মানুষটা বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলছে!

হরেন বলিল—না, না, মামাবাবু বলেছেন, সত্যি। আমরা কেন মিথ্যে বলব, সনাতন?

প্রকাশ বলিল—দু'দিন তো তোমাকে দেখলুম সনাতন, তুমি মিথ্যাবাদী নও, তা বেশ জেনেছি। তুমি বলো তোমার বাবার গল্প।

সনাতন বলিল—মাস্টার-বাবুর কাছে শুনলেন তো, আমার বাবা ছিল হাজোর সুনিবুনি মন্দিরের পাণ্ডা। বাবার গায়ে ছিল যেমন জোর, মনে তেমনি সাহস! ...শিব-চতুর্দশীর সময় হাজোয় মস্ত মেলা বসত, বাবু। ওদিকে মণিপুর, আর এদিকে নেপাল, সিকিম, ভুটান; আবার অন্যদিকে ধুবড়ি-গৌহাটি থেকে মেলায় একেবারে লাখে-লাখে যাত্রী আসত। সেবারে ভুটানিরা করলে কি, শিব-চতুর্দশীর সময় তারাও এক মেলা বসাল—জেলার ঘাঁটি আগলে। ওদের মুল্লুকে আছে গন্দা পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোলে ওদের মেলা বসল। সে মেলায় খুব ধুম-ধাম! আমাদের এখানে যাত্রী এল না। ওরা রটিয়ে দিল, ছিন্নমস্তা দেবী স্বপ্নাদেশ দেছেন, এবার সুনিবুনিতে না বসে তিনি বসবেন গন্দা পাহাড়ে। ওদের দলে চাঁই ছিল একটা ভুটানি পুরুত—তার নাম কুন্দন।

শিবরাত্রির আগের দিন সন্ধ্যার পর বাবা চলল ওদের গন্দা পাহাড়ের দিকে। গিয়ে দেখে, পাহাড়ের নীচে ঘুটিং দিয়ে ওরা একটি মন্দির তৈরি করেছে; মন্দিরের সামনে একটা ঘর তুলেছে। ঘুটিং আর মাটিলেপা ঘরের দেওয়াল—দেওয়ালে সাপের নক্শা এঁকেছে—ফণা-তোলা সব সাপ! আর বলির জন্য জোগাড় করেছে মস্ত একটা পাহাড়ি ছাগল, বড়-বড় কটা লাল মোরগ, কালো রঙের বারোটা মুর্গি, এক ঝাঁক ঘুঘু আর পায়রা। এই সব ছাগল-মোরগ-পায়রার কাছে দশ-বারো বছরের ভুটানি একটা ছেলেকে এনে তারা বেঁধে রেখেছে!

ছেলেটিকে দেখে বাবার মায়া হল। বাবা ভাবলে, এই ছেলেকে বলি দেবে? ইঃ, কি সব শয়তান!

পাহাড়ের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে বাবা সব দেখে নিলে। দেখলে, বহু লোক জমেছে। মাথার উপর ঢাকা নেই। খোলা আকাশের নীচে সকলে পড়ে আছে—মদ-ভাঙ খাচ্ছে; আর মাদল পিটে কোথাও চলেছে নাচ-গান, কোথাও বসেছে জুয়োর আড্ডা।

বলির জন্য ছেলেটাকে যেখানে ফেলে রেখেছে, সেখানে-লোকজন কেউ ছিল না। ঘুরে বাবা দেখে, এ ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাবা ভাবলে, ছেলেটাকে নিয়ে আসবে—কেউ না জানতে পারে, এমন ভাবে। কিন্তু তা করতে গেলে দেরি করতে হয়! অনেক রাত অবধি! কেননা, এখন আমোদ-আহ্লাদ করলেও এরা যদি দেখে, বলির মানুষ চুরি হয়েছে, তাহলে ক্ষেপে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে! তাই বাবা করলে কি, ঐ যাত্রীদের দলে মিশে এদের কাছে খানিকক্ষণ, ওদের কাছে খানিকক্ষণ—এমনি করে সময় কাটাতে লাগল।

এমনিভাবে দু'পহর রাত কেটে গেল। যারা নেশা করছিল, তারা এখন প্রায় বেহুঁশ! আর যারা জুয়ো খেলছিল, তাদের মধ্যে যারা জিতেছে, তারা ঘুমোবার উদ্যোগ করছে।...বাবা দেখলে, ছেলেটির উপর কারও নজর নেই! ছেলেটিকে উদ্ধার করতে হলে এইটিই ঠিক সময়! নাহলে শেষ-রাত্রে উঠে এরা হৈ-হৈ রবে পুজোর আয়োজন শুরু করবে আর ভোর হবার আগেই বলি শেষ হবে!

চারিদিককার অবস্থা বুঝে বাবা ছেলেটার বাঁধন খুলে তাকে তুলে নিলে একেবারে পিঠের উপরে...

ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। সে বললে—আমাকে বলি দিতে নিয়ে চলেছ?

বাবা বললে, না। বাবা তাকে রক্ষা করবে। তাই সেখান থেকে তাকে নিয়ে একেবারে সুনিবুনি পাহাড়ে যাবে।

ছেলেটা বললে—আমার ছাগল? ওরা আমার ছাগল নিয়ে এসেছে। আমার ছাগল চাই!

বাবা তাকে অনেক বুঝুল...বুঝুল, ছাগল নিয়ে যেতে গেলে ওরা যদি জানতে পারে, তাহলে আর তাকে রক্ষা করা যাবে না।

ছেলেটি বললে, ছাগল না নিয়ে গেলে সে যাবে না। ওরা যদি ছাগলকে বলি দেয়, তাহলে তাকেও দিক বলি!

শেষে বাবা তাকে বললে—বেশ, আগে তোমাকে এদের হাত থেকে নিয়ে যাই, তারপর ফিরে এসে তোমার ছাগল নিয়ে যাব।

ছেলেটি বললে—সত্যি কথা বলছ?

বাবা বললে—সত্যি কথা বলছি।

গল্পের স্রোতে বাধা দিয়া হরেন বলিল,—ছেলের সঙ্গে তোমার বাবার এ-কথা হয়েছিল তুমি কি করে জানলে?

সনাতন বলিল—এ-সব কথা বাবার মুখে শুনেছি। ছেলেটিকে নিয়ে এসে বাবা আমাদের হাতে দিলে। দেবার সময় যা-যা হয়েছিল, আমাদের সব বলেছিল কি-না। মানে আমরা সকলে তখন আমাদের মন্দিরের দোরে জেগে বসে ছিলুম! এত-বড় একটা কাজে বাবা বেরিয়েছেন...কি করে আসবে, আসতে পারবে কি-না, যদি কোনো বিপদ ঘটে, সেই সব ভেবে আমরা তখন অস্থির!

প্রকাশ বলিল—ও...তার পরে কি হল, বল...

সনাতন বলিতে লাগিল—ছেলেকে আমাদের কাছে রেখে বাবা আবার গেল তার ছাগল আনতে। বাবার পথ চেয়ে আমরা বসে রইলুম। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা

পারবে না! আমাকে আর ছাগলকে মন্ত্র পড়ে চান করিয়ে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে ওরা বেঁধে রেখেছিল! ওদের সে-মন্তরের ভারী জোর, আমি জানি সে-মন্তর পড়ে দিলে বলি যদি আকাশে, পাতালে বা সাগরে-পাহাড়ে থাকে, তাহলেও বলির সময় ডাক দেবা মাত্র সে-বলিকে হাড়-কাঠের কাছে চলে আসতে হবে!

ছেলের কথা শুনে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছিল!

আমি বললুম—ও-সব শোনা কথা। ও-কথার দাম নেই।

ছেলেটি বললে—দাম নেই, নয়। আমি জানি।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাবার সব চেষ্টা নিষ্ফল হল! জোয়ারের জলের মতো ওদিকে রাত বেড়ে চলেছে। এখনি জোয়ার থেমে রাতের ভাটা শুরু হবে, আর সে-ভাটা শেষ হবার আগেই ঢোল-মাদল বাজিয়ে ওরা বলির পর্ব শুরু করবে। গায়ে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিতে লাগল! কেবলি মনে হতে লাগল, সর্বনাশ, এখনি হয়তো ওদিকে বলির বাদ্য বেজে উঠবে! বাবা?...বাবা এখনো ফিরছে না কেন? ভয়ে আমরা একেবারে এতটুকু!

কথায় কথায় রাত্রি এগিয়ে চলল ভোরের দরজার দিকে...

রাত্রির সে-চলা চোখে যেন দেখতে পাচ্ছিলুম! যেন লম্বা একটা কালো ছায়া সরে সরে চলেছে। চলেছে যেন অরুণলোকের পুব-তোরণের দিকে! সে ছায়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা...মিশ-কালো দু'খানা হাত বাড়িয়ে রাত্রি যেন পথের সন্ধান করতে করতে সামনে এগিয়ে চলেছে! ...ঐ দুটো হাত দিয়ে ত্রয়োদশীর এই আঁধার রাত অরুণলোকের তোরণে পৌঁছে যেমন আঘাত করবে, অমনি সেখানে সূর্যের ঘুম ভাঙবে—আর সূর্যের সেই ঘুম-ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে...

গা শিউরে ছম-ছম করতে লাগল।

ছেলেটা অনেকক্ষণ চুপ-চাপ করে ছিল...দুটো চোখ সে বুজে ছিল। ভাবলুম, ভালোই হয়েছে...ঘুমোচ্ছে।

এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি গর্জন করে মাতন তুললে। বললে—আমি যাব...ঐ আমার ডাক এসেছে! ঐ ডাকে...আমায় ডাকে!

বলতে বলতে ধড়মড়িয়ে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে পাহাড় থেকে ছুটে নেমে যায়!

আমরা পাঁচ-সাতজন লোক জোর করে তাকে বাগিয়ে ধরলুম। তবু তাকে ধরে রাখতে পারি না! তার গায়ে তখন যেন মহিষাসুরের বিক্রম। কি জোর! তাকে আমরা টেনে পাহাড়ে তুলব কি, সে আমাদের টেনে নিয়ে পাহাড়ের নীচে নামল। নেমে থামতে চায় না, দাঁড়াতে চায় না...শুধু চলতে চায়! চলে—ছুটে চলে ঐ ভুটানি বস্তির

আমাদের সঙ্গে যেন তার যুদ্ধ চলল...মহাযুদ্ধ! এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না...কিন্তু আজও আমার মনে আছে, কি-জোরে আমাদের পাঁচ-সাতজন লোককে ঐ এক-রত্তি ছেলেটা টেনে নিয়ে চলেছিল। এই দ্যাখো বাবু, সে-কথা বলতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

কথাটা বলিয়া সনাতন তার দুই কণ্টকিত হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল! হরেন আর প্রকাশ দেখিল, সনাতনের হাতের রোমরাজি কদম্ব-কেশরের মতো কণ্টকিত।

রুদ্ধ নিশ্বাসে হরেন বলিল—তারপর?

বিস্ফারিত-চোখে প্রকাশ বলিল—তোমার বাবা আর ফিরল না, সনাতন?

একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সনাতন বলিল—না!

তারপর সনাতন বলিতে লাগিল—প্রায় এক ক্রোশ পথ ছেলেটা আমাদের ক'জনকে টেনে নিয়ে চলল। তার মুখে শুধু এক কথা—মায়ি-জী....মায়ি-জী...

তার টানে আমরাও চলেছি! চলেছি বললে ঠিক হবে না! সে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে! এমন অবস্থা যে, তাকে ছেড়ে দেব, সে-কথা কারো মনে জাগছে না!...শুধু চলেছি! কোথায় চলেছি...শ্মশানে,—না, মশানে,—খেয়াল নেই! ও আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে! কাটা গাছের গুঁড়িকে মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়, আমাদেরো যেন ও তেমনি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কানে শুনলুম ঢাক-ঢোল-মাদলের অট্ট-রব!...দেহের সমস্ত হাড়গুলো সে-শব্দে কেঁপে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল! ...টানাটানি করতে-করতে আমরা এলুম ভুটানিদের বস্তির পাশে।

দেখি, সামনে পাহাড়। ঘুটিংয়ে গড়া ছোট্ট মন্দির। সেখানে এ বলির হাড়-কাঠ। দেখি, ভুটানিরা আমার বাবাকে ধরেছে...বাবার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা...লাল টক্‌টক্ করছে...যেন দেবীর খর্পর-ঝরা টাটকা তাজা বলির রক্ত! বাবাকে ধরে তারা এগিয়ে চলেছে হাড়-কাঠের দিকে...

বাবা নিথর নিস্পন্দ! দেহে যেন প্রাণ নেই! বাবার আগে-আগে চলেছে মাথায় ইয়া-জটা-বাঁধা মোটা এক ভুটানি পুরুত!

পুরুত একটা মন্ত্র আওড়াচ্ছিল...

আমাদের দেখে চারিদিকে একটা হৈ হৈ রব উঠল। ভিড়ের মধ্য থেকে একরাশ লোক তেড়ে ছুটে এল। আমাদের কাছ থেকে হিঁচড়ে টেনে ভুটানি ছেলেটাকে ছিনিয়ে সমস্বরে তারা চিৎকার শুরু করে দিলে!...আমরা হতভম্ব...যেন পাথরের পুতুল বনে গেছি!

হঠাৎ চোখের সামনে দেখি, রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে! সেই ভুটানি ছেলের দেহ থেকে মাথা গেছে খসে! আর তার তরুণ নধর দেহ থেকে রক্ত ছুটেছে একেবারে

ফিন্‌কি দিয়ে...পাহাড়ের পাথর কেটে অজস্রধারে যেমন জলের ধারা ঝরে, ঠিক তেমনি!

রক্ত দেখে মাথা কেমন ঝিমঝিমিয়ে এল...চোখের সামনে দুনিয়ার আলো গেল নিবে!

আবার যখন আমরা আলোয় চোখ চাইলুম, তখন দেখি, কজনে আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছি! ভুটানিদের পুজো শেষ হয়েছে...পাহাড়ের ওধারে বাজনা বাজছে! এদিকে তাদের চিহ্ন নেই!...আর আমার বাবা...

এই পর্যন্ত বলিয়া সনাতন চুপ করিল। তার কপাল বহিয়া দর-দর ধারে ঘাম ঝরিতেছে...মুখে কথা নাই...মুখ যেন পাণ্ডাশ।

প্রকাশ ডাকিল—সনাতন...

সনাতন বলিল—বাবু...

যেন কোন পাতাল হইতে তার সে-স্বর আসিল!

হরেন বলিল—তোমার বাবা?

কাশিয়া গলা সাফ করিয়া সনাতন বলিল—বাবা ওদের সেই হাড়-কাঠের কাছে পড়ে আছে—অজ্ঞান...অচেতন! জল ঢেলে বাবার জ্ঞান করালুম। কিন্তু বাবার মুখে কথা নেই!

কোনোমতে বাবাকে নিয়ে ঘরে এলুম। তিন দিন, তিন রাত বাবার মুখে একটি কথা নেই! শুধু ঘুম আর ঘুম! ঘুম ভাঙলে বাবা চারিদিকে চায়...পাগলের মতো থম্‌থমে ছম্‌ছমে দৃষ্টি।

তিন দিন, তিন রাত কাটবার পর চারদিনের দিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ বাবা বলে উঠল—মায়ি-জী...মায়ি-জী...

বলে বাবা উঠে দাঁড়াল। সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে তার মুখে-চোখে যেমন ভাব হয়, বাবার মুখে-চোখে ঠিক তেমনি ভাব! যেন বাবার সামনে কে এসে দাঁড়িয়েছে...বাবা তাকে দেখে ভয়ে যেন শিউরে উঠেছে!

মুখে-চোখে সেই ভাব...বাবা চলল। কে যেন ডেকেছে, তার ডাকে! আমরা বাবাকে ডাকলুম। ধরলুম। বাবার চেতনা নেই! বাবাকে কিছুতে ধরে রাখতে পারলুম না! বাবা চলল...বাবার গায়ে অসুরের বিক্রম! সেই ছেলেটির দেহে যে-বিক্রম দেখেছিলুম, তেমনি বিক্রম! সে-বিক্রমের সঙ্গে যুঝতে পারলুম না! নিরুপায়ে আমার বাবার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছি!

চলে চলে সেই গন্দা পাহাড়! সেই ঘুটিংয়ের মন্দির!

মন্দিরে লোক নেই, জন নেই! শুধু ছিন্নমস্তা দেবীর একটি মূর্তি। ভুটানিদের হাতে-গড়া মূর্তি।

সেই মূর্তির সামনে বাবা দাঁড়াল। তারপর বিশ্বাস করবেন না বাবু, মূর্তির হাত প্রসারিত হয়ে এল...এসে বাবার চুলের ঝুঁটি ধরলে...ধরে টানতে লাগল সেই মূর্তির দিকে...ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে...

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আমরা দেখলুম...নিশ্চল, নিস্পন্দ! কে যেন আমাদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে...কঠিন বাঁধনে।

তারপর চোখে পলক পড়ল! চেতনা এল ফিরে। তখন দেখি, মূর্তির হাতে বাবার পরনের কাপড়খানি মাত্র আছে। দেহের চিহ্ন নেই—একটা আঙুল পর্যন্ত নয়!

চার

কথাটা বলিয়া সনাতন চুপ করিল। হরেন এবং প্রকাশ—দু'জনে স্তম্ভিত—যেন কাঠের দুটি পুতুল!

ঘণ্টাখানেক ক'জনে এমনি স্তম্ভিত ভাবে রহিল—

বেলা দশটা...

স্টেশনের ডিউটি সারিয়া নিরঞ্জনবাবু বাসায় ফিরিলেন। তিনজনকে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—সেই গল্প শোনা হচ্ছিল বুঝি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন বলিল—এ কি সত্যি কথা মামাবাবু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—সত্য-মিথ্যা জানি না বাবা—তবে সেই অবধি মন্দির আর ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সনাতন কোনো সম্পর্ক রাখেনি। রেলের সাহেবদের ধরে-কয়ে রেলে চাকরি নিয়েছে। আর সেই-ইস্তক এই রেলেই ও চাকরি করছে।

হরেন বসিয়া কি ভাবিতেছিল। সে বলিল—আচ্ছা মামাবাবু...

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—বল...

হরেন বলিল—আপনি তো বরাবর এই অঞ্চলে আছেন?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আছি।

হরেন বলিল—আপনি নিজে কখনো অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন?

প্রকাশ বলিল—মানে, ভৌতিক ব্যাপার?

হরেন বলিল—ভূত নয়, মামাবাবু। ভূতুড়ে ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি না!

প্রকাশ কহিল—করো না? যেদিন প্রফেসর সেন ক্লাশে যে-ভৌতিক ব্যাপারটি দেখেছেন বলে চালিয়ে দিলেন, সেদিন সে-গল্পের প্রতিবাদ-ছলে তো একটা কথা বলোনি। নিঃশব্দে সে-গল্প পরিপাক করেছ।

হরেন বলিল—সে তো ভূতের গল্প নয়...

প্রকাশ যেন কোমর বাঁধিয়াছে, এমনি ভঙ্গিতে বলিল—ভূত নয়, Spirit তো! ইংরেজিতে বললে বুঝি তার ভূতত্ত্ব লোপ পায়? বিলিতি Spirit আর দেশি ভূত—দুয়ে তফাৎ কোথায়, বল তো বাপু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—স্পিরিট নামানোর কথা শুনেছো বুঝি?

হরেন বলিল—হাঁ, মিডিয়ামের থ্রু দিয়ে মস্ত একটা ব্যাপারের সমাধান করেছিলেন তাঁরা। সেই কথাই প্রফেসর সেন ক্লাসে আমাদের বলেছিলেন।

সে কি গল্প, শুনি?

হরেন বলিল—প্রফেসর সেনের একজন আত্মীয় ছিলেন—খুব ধনী। তিনি মারা যান। মারা গেলে তাঁর ডায়েরি থেকে জানা গেল, প্রায় বিশ হাজার টাকা তিনি ধার দিয়ে গেছেন। কাকে সে-টাকা ধার দিয়েছেন, তার কোনো সন্ধান মিলছিল না। তখন প্রফেসর সেনের এক মামা-শ্বশুরকে তাঁর ছেলেরা ধরে বসল। সেনের মামা-শ্বশুর একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট। ছেলেরা তাঁকে বললে, মিডিয়াম-মারফৎ বাবার Spirit-কে আনিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করুন, যদি কোনো সন্ধান মেলে। মামা-শ্বশুর তখন একদিন সিয়ান্স করলেন। সেই সিয়ান্সে মিডিয়ামের দেহে ধনী ভদ্রলোকের স্পিরিট এসে ভর করল। তাকে প্রশ্ন করা হল, বেঁচে থাকতে বিশ হাজার টাকা ধার দিয়ে গেছেন, তার কাগজ-পত্র পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় সে কাগজ-পত্র? স্পিরিট তখন বলে দিলে, দেশে ওঁদের যে সেরেস্তা আছে, সেই সেরেস্তায় একটা নম্বুরি বান্ডিলের মধ্যে আছে সে-টাকার লেনদেনের কাগজ-পত্র। ছেলেরা পরের দিন দেশে গিয়ে সেরেস্তা খুঁজে সেই নম্বুরি বান্ডিল বার করলে, করে তার ভেতর থেকে বন্ধকী কাগজ-পত্র পেলে। জানি না, এর মধ্যে কতখানি সত্য, আর কতখানি পাবলিসিটির প্যাঁচ! প্রফেসর সেনের এ-কথার প্রতিবাদ করতে গেলে বলতে হয়, আপনি মিথ্যাবাদী! তা তো করতে পারি না। তিনি হলেন প্রফেসর আর আমরা তাঁর ছাত্র। তিনি খাতা দেখে এগজামিনের সময় নম্বর দেবেন!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না, না, কেন তিনি মিথ্যাবাদী হবেন? চোখে আমরা কতটুকু দেখি, বল হরেন...মনেই বা কতটুকু প্রত্যক্ষ করি। যা আমরা চোখে দেখিনি, তাই নেই? না, তাই অবিশ্বাস করব? তাছাড়া স্পিরিট সম্বন্ধে কথাবার্তা আগাগোড়া ভুয়ো বলে মনে কর না। এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। সে রহস্য বুঝতে হলে মনের যে পরিমাণ শিক্ষার দরকার, আমাদের সকলের মনের সে-শিক্ষা নেই। এই ধর ম্যাথামেটিক্স! একজন দিব্যি গড়গড় করে শক্ত শক্ত প্রবলেম কষে যাচ্ছে, আবার আর একজনের মাথায় তা ঢুকছে না! তেমনি ও-সব রহস্য বোঝবার শক্তিও সব মনের থাকে না! ভালো করে মনকে গড়ে তুললে তবে এ-সব তত্ত্ব বোঝবার মতো শক্তি জন্মায়।...আমি তাহলে তোমাদের একটি গল্প বলি, শোনো। ঐ ভুটানি-পাড়ার গল্প!

প্রকাশ বলিল—আপনি নিজে দেখেছেন মামাবাবু?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—এখন আমি সে-সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না। আগে তোমরা গল্পটি শোনো, তারপর যার যা মন চায়, আমাকে প্রশ্ন কর।

হরেন বলিল—বেশ, আপনি গল্প বলুন—আমি নিঃশব্দে বসে শুনব।

প্রকাশ বলিল—আমি কোনো কথা বলব না মামাবাবু!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—চার বছর আগেকার কথা। আমি তখন গৌহাটিতে থাকি। গৌহাটিতে এক সাহেব ছিল—সাহেবের নাম ম্যাকার্মিক। সে ছিল জাতে 'স্কচ-ম্যান'। এই স্কচ ম্যাকার্মিক ছিল চা-বাগানের ম্যানেজার। একজন ভুটানি ছোকরা তার বাঙলোয় কাজ করত। ছোকরা খুব চালাক ছিল। ম্যাকার্মিক তাকে প্রশ্রয় দিত খুব। প্রশ্রয় পেয়ে সে একটু বিগড়ে গেল। সাহেবের এটা-ওটা সরাতে লাগল। একদিন সাহেবের সদ্য-কেনা রুপোর সিগারেট-কেস সরাতে সাহেবের সন্দেহ হল। এবং ভুটানিটাও মালসমেত ধরা পড়ে গেল। সাহেব বলল—ফের যদি দেখি, হাতটান রোগ সারছে না, তাহলে দূর করে দেব। ধরা পড়ে সাহেবের কাছে বকুনি খেয়ে ভুটানি দু-মাস ভালো হয়ে রইল! তারপর...

ঠাকুর রামদীন আসিয়া গল্পস্রোতে বাধা দিল, বলিল—চান করবেন না? মা বকছেন...

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—দশ-পনেরো মিনিট পরে আমরা চান করতে যাচ্ছি, বল গে ঠাকুর...

ঠাকুর চলিয়া গেল।

হরেন বলিল—তারপর?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—তারপর আবার সে যে-কে-সেই! ভুটানিটা এবার মেম-সাহেবের জুয়েল-করা একটা হাত-ঘড়ি চুরি করে বসল! জন্মদিনে মেম-সাহেবের মা তাকে এ-ঘড়ি পাঠিয়েছিলেন উপহার...গ্লাসগো থেকে! ভুটানিকে সন্দেহ করে মেম-সাহেব বলল, ডাক পুলিশ! সাহেব বলল—এখানে আমিই পুলিশ, আমিই ম্যাজিস্ট্রেট...

বলে সাহেব তেড়ে গিয়ে ভুটানির গলা টিপে ধরল। ধরে তার পিঠে জুতোসুদ্ধু দমাদম লাথি!

লাথির পর লাথি চলল। ভুটানি ছিটকে পড়ে গেল। তার দাঁত ভেঙে, নাক কেটে রক্তারক্তি ব্যাপার!...

রক্তারক্তি ব্যাপার দেখে মেম-সাহেবের হল ভয়। সাহেবের হাত ধরে মেম-সাহেব বললে—চলে এস, আর নয়...খুব সাজা হয়েছে! এনাফ।

সাহেব বলল—ঘড়ি বার করে দিক। নাহলে এমনি সাজা ওকে রোজ দেব!

সাহেবের হুকুমে ভুটানির ঘর-তল্লাশি হল। ঘরের মধ্যে ছিল তার জুতো-জামা,

রাজ্যের টুকিটাকি, আর সেই সঙ্গে তার দেবতার একটি মূর্তি! পাথরে গড়া মূর্তি। সে মূর্তি আমি দেখেছি—খানিকটা কালী-মূর্তির মতো খানিকটা আবার অন্যরকম। ভুটানির ঘর থেকে মেম-সাহেবের হাত-ঘড়ি বেরুল, আর বেরুল সাহেবের একগাদা হারানো কলার, রুমাল, শার্ট, গেঞ্জি, মোজা! ভুটানির উপর সাহেবের প্রহার-বর্ষণ চলল—বেদম প্রহার। মেম-সাহেবের সেদিকে দৃষ্টি নেই। তার হাতে সেই পাথরে গড়া দেবী-মূর্তি...মেম-সাহেব সেই মূর্তিটি হাতে নিয়ে একাগ্র-মনে একাগ্র-দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে! সেই ঠাকুরের মূর্তির উপর মেম-সাহেবের মনে জাগল লোভ। মেম-সাহেব বলল—ফাইন পিস...কিউরিয়ো...আই কিপ ইট! এ কথা বলে মেম-সাহেব সেটি নিয়ে চলে আসছিল। ভুটানি অত মার খেয়েও মেম-সাহেবকে ছাড়ল না। মেম-সাহেবকে সে বলল—নোকরি লাও মেম-সাব, পুলিশে দাও....তা বলে আমার দেওতা লিবে না!

মেম-সাহেব বলল—এর জন্য একঠো রূপেয়া...

ভুটানি বলল—রূপেয়ায় দেওতা দেওয়া চলবে না মেম-সাব...দেওতা রেখে দাও।

সাহেব হেসে উঠল। হো হো হাসি! মেম-সাহেব নিঃশব্দে ভুটানির সেই দেবতার মূর্তি নিয়ে চলে গেল। তারপর...

এই পর্যন্ত বলিয়া নিরঞ্জনবাবু চুপ করিলেন, বলিলেন—তারপর কি হল বলতে পার তোমরা?

হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ! হরেন বলিল—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মেম-সাহেব মরে গেল?

প্রকাশ বলিল—রাত্রে ভুটানি এসে সাহেবকে আর মেমকে খুন করে গেল?

মাথা নাড়িয়া নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না।

প্রকাশ ও হরেন সমস্বরে বলিল—তবে?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—রাত প্রায় দুটো...মেম-সাহেব আর সাহেব দু'জনে ঘুমোচ্ছে...গাঢ় ঘুম। হঠাৎ মেঘ ডাকলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ! সে-শব্দে শুধু সাহেব আর মেম নয়—বাড়ির চাকর-বাকর সকলে জেগে উঠল! জেগে তারা আকাশের পানে চাইল! আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। আকাশে ধপধপে চক্‌চকে এক-ফালি চাঁদ—অসংখ্য নক্ষত্র...মেঘ ডাকে কি করে? অবাক হয়ে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে...ওদিকে ঘুম ভেঙে মেম-সাহেব দেখে, তার মাথার শিয়রে খর্পর খড়্গধারিণী কালী-মূর্তি! মূর্তি জীবন্ত! কালো কষ্টি-পাথরে খোদা মূর্তি...মূর্তির দু-চোখে আগুন জ্বলছে!

মেম-সাহেব চিৎকার করে উঠল! সাহেবও চিৎকার করে উঠল! সে চিৎকার শুনে দু'জন বেয়ারা ছুটে এল। সাহেবের ঘরে ঢুকে তারা দেখে, সাহেব আর মেম

যেন পাথর হয়ে গেছে! তাদের মুখে কথা নেই, চোখে পলক পড়ে না!...অথচ কেন? ঘরের মধ্যে কেউ নেই!

প্রকাশ বলিল—তারপর?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অবিচল নেত্রে হরেন চাহিয়া রহিল নিরঞ্জনবাবুর পানে।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—দু'জনের দেহ কাঠের মতো শক্ত! বেয়ারারা তখনি ডাক্তার-সাহেবকে খবর দিলে। ডাক্তার-সাহেব এলেন!

নানা চিকিৎসা হল। সাহেব-মেমের জ্ঞান আর হয় না! অথচ মৃত্যু নয়! নাড়ি চলেছে, নাকে নিঃশ্বাস। গা ফুঁড়ে ওষুধ-পথ্যি খাওয়ানো চলল! প্রায় পনেরো দিন পরে দু'জনের জ্ঞান হল। মেম-সাহেব কিন্তু পাগল হয়ে গেল! সাহেব পাগল হয়নি, তার দুটি হাত বাতে একেবারে পঙ্গু হল...হাত নড়ে না, চড়ে না।...সাহেব এ-কথা সকলের কাছে বলেছিল, আমিও সাহেবের নিজের মুখে এ-কথা শুনেছি।

কাহিনি শুনিয়া হরেন বলিল—এটা আমি মানি যে, কারো ধর্ম-বিশ্বাসে বা কারো দেবদেবীকে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করতে নেই। এর আধ্যাত্মিক মর্ম কি, তা জানি না। তবে মানুষের সবচেয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস তার ঠাকুর-দেবতার উপর,—কাজেই কারো মনের সে-জায়গায় আঘাত দিলে তার ফল কখনো ভালো হতে পারে না। শুনতে পাই, ঐতিহাসিক যুগের কালাপাহাড়কেও শেষ-জীবনে বহু শাস্তি পেতে হয়েছিল!

প্রকাশ বলিল—তাহলে আপনি বলতে চান মামাবাবু, অসভ্য জাতেরা ঐ যে মানুষকে আর পশুকে ধরে বলি দ্যায়, সেগুলোর সমর্থন করতে হবে? বলি দিয়ে যে তারা দেবতার তুষ্টি-সাধন করে, সে-বলি বন্ধ করলে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগবে?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—বলি বন্ধ করতে হয়, যুক্তি দিয়ে কর। গায়ের জোরে প্রভুত্বের দর্পে বা ভয় দেখিয়ে বলি বন্ধ করা উচিত হবে না। তাছাড়া পুজোর আচার-রীতির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাদের না থাকুক, সে আচার-রীতিতে পৈশাচিকতা দেখলে তার উচ্ছেদ করতে পার! তা বলে দেবতার বিগ্রহ বা মূর্তি নিয়ে তার অপমান করা...আমি খুব পণ্ডিত-মানুষ নই প্রকাশ, কিন্তু আমার মন তাতে ভয়ে সঙ্কুচিত হয় এ-কথা অস্বীকার করছি না!

প্রকাশ বলিল—আপনি তাহলে বলতে চান, বুনো কোল-ভিলদের বা এইসব পাহাড়ি ভুটানি-খাসিয়াদের বিগ্রহ দেখলে তাদেরও প্রণাম ঠুকতে হবে?

হরেন বলিল—প্রণাম না ঠোকো, সে-বিগ্রহকে তামাশা করবার বা জুতোর ঠোক্কর মারবার কোনো অধিকার তোমার-আমার নেই!

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—ঠিক কথা...

ঠাকুর আবার আসিয়া তাড়া দিল, বলিল—মা-ঠাকুরন খুব রাগ করেছেন! খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে বাবু...

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—না ঠাকুর, আমাদের কথা শেষ হয়েছে! আমরা এবার উঠছি...

পাঁচ

আহারাদির পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে চুপ করিয়া হরেন বসিয়াছিল। প্রকাশ তার মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প করিতেছে...শয্যায় দেহ ঢালিয়া নিরঞ্জনবাবু দিবা-নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

হঠাৎ হরেনের কি খেয়াল হইল, উঠিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। ফিরিল সন্ধ্যার পর...

প্রকাশ বলিল—কোথায় গিয়েছিলি?

হরেন বলিল—একবার চারিদিক দেখে এলুম।...হ্যাঁ, একটা কথা ছিল প্রকাশ।

প্রকাশ বলিল—বল...

হরেন বলিল—আমাদের সঙ্কল্প ছিল কামরূপ-কামাখ্যা, আরো নানা জায়গা ঘুরে-ঘুরে দেখে আসব। এখানে আস্তানা জমিয়ে বসে থাকলে কি করে তা হবে?

প্রকাশ বলিল—দু'দিন পরে বেরুব হরেন...ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? মামীমাকে সে-কথা বলেছিলুম। মামীমা বললেন, সদ্য এগজামিন হয়ে গেল—দু'দিন একটু জিরিয়ে নাও।

হরেন বলিল—আমার মন কিন্তু ভয়ঙ্কর অস্থির হয়েছে, প্রকাশ! মামাবাবুর মুখে সে-গল্প শুনে অবধি আমার মনে কি হচ্ছে, জানিস?

কি?

হরেন বলিল—এদিকে যখন এসেছি, তখন এদিককার এই সব মন্ত্র-তন্ত্র তুক-তাক আর অলৌকিক দেব-মাহাত্ম্য—এ-সবের খানিকটা অন্তত খোঁজ-খবর নেব...

প্রকাশ বলিল—খোঁজ-খবর নিয়ে প্রবন্ধ লিখবি বুঝি, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়? কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে? লেখক হবি?

হরেন বলিল—প্রবন্ধ লিখে মনের মধ্যে অহঙ্কারের বনেদ গড়বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

ভ্রূভঙ্গি সহকারে প্রকাশ বলিল—তবে?

হরেন বলিল—নিজের মনের তৃপ্তি! সত্যি, বাঙালি হয়ে মনুষ্য-জন্ম নিয়েছি বলে ওকালতি, না হয় কেরানিগিরি, কি খুব বেশি হল তো হাকিমি করেই এ জন্মটা শেষ করতে হবে?

হাসিয়া প্রকাশ বলিল—তাতে মান-সম্ভ্রম, পয়সা, সুখ, আরাম মিলবে, হরেন।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হরেন বলিল—ধেৎ তোর মান-সম্ভ্রম-পয়সার নিকুচি করেছে!

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক ঐ আরাম আর এই মান-সম্ভ্রম নিয়ে চলে গেছে। পৃথিবীতে এসে পয়সার গন্ধই তারা দিয়ে গেল! এ-পৃথিবীতে কত-কি রয়েছে, তার কিছু জানতে চাইল না! কুকুর-বেড়াল যেমন এঁটো-কাঁটা আর ঘুম নিয়ে জীবন কাটায়, এও ঠিক তেমনি! মানুষ হয়ে কি তবে লাভ, বল? এরা কি রেখে যাচ্ছে, শুনি?

প্রকাশ বলিল—ছেলেমেয়েদের জন্য বিষয়-সম্পত্তি আর নিজেদের নাম। তাদের কীর্তি লেখা আছে দেখবি পার্কে মার্বেল-পাথরে খোদা স্টাচুতে; বার-লাইব্রেরিতে ব্রোমাইড-এন্‌লার্জমেনন্ট-ছবিতে...

মুখ বাঁকাইয়া হরেন ঘুরিয়া বসিল...প্রকাশের কথার জবাব দিল না।

প্রকাশ হাসিল, হাসিয়া বলিল—তোর খিদে পেয়েছে হরেন...বুঝেছি। এতখানি ঘুরে এলি...খালি-পেটে কি না! তা মাভৈঃ! এখনি লুচি আসছে আর সেই সঙ্গে ভুটানের চাক-ভাঙা টাটকা মধু। সে মধু দিয়ে গরম গরম লুচি খা...ফাস্ট ক্লাশ...এমন কখনো খাসনে!

হরেন চুপ করিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

স্টেশনের বাহিরে মস্ত একটা শিশুগাছ। তার মাথা টপকাইয়া আকাশে ঐ চাঁদ! চাঁদের জ্যোৎস্না গাছের নিবিড় শাখাপত্রের রন্ধ্রান্তরাল দিয়া পথে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আলোয় কেবলি স্বপ্নময়তা! সত্যের সঙ্গে কল্পনার আবছা মিশিয়া মনকে উতল করিয়া তোলে!

সিগনালার সনাতন আসিল। তার হাতে প্লেট। প্লেটে গরম লুচি আর চিনা-মাটির বাটিতে মধু।

প্রকাশ ডাকিল—হে ধ্যানী-বুদ্ধ, ধ্যান ভঙ্গ কর! তোমার অর্ঘ্য এসেছে।

হরেন ফিরিয়া চাহিল...কোনো কথা বলিল না।

প্রকাশ বলিল—মামীমা পাঠিয়েছেন। বৈরাগ্য-বশে যদি গৃহত্যাগ করো, তার আগে এই লুচি আর মধু খেয়ে নাও। ভুটানি মধু। এ মধুতে প্রাণ-সঞ্জীবনী শক্তি আছে, বন্ধু।

হরেন জবাব না দিয়া সনাতনের পানে চাহিল, বলিল—এক-বাল্‌তি জল আন তো সনাতন। মুখ-হাত ধোবো।

টেবিলের উপর প্লেট রাখিয়া সনাতন জল আনিয়া দিল।

মুখ-হাত ধুইয়া হরেন প্লেট টানিয়া আহারে মনঃসংযোগ করিল।

খাইতে খাইতে হরেন ডাকিল—সনাতন...

সনাতন বলিল—বাবু...

হরেন বলিল—তোমাদের হাজো-পাহাড়ের ওদিকে যে ভুটানিরা থাকে, তারা খুব বনো?

সনাতন বলিল—আমরা তাদের বুনো বলি না, বাবু। আমরা বলি পাহাড়ি।

হরেন বলিল—তারা খুব ঠাকুর-দেবতা মানে?

সনাতন বলিল—তারা কি মানে, আর কি মানে না বলা শক্ত, বাবু।

হরেন বলিল—তার মানে?

সনাতন বলিল—বাবা ওদের বলি কেড়ে এনেছিল, তাই বাবার উপর তাদের অত রাগ! অথচ ওদের মধ্যে দলাদলি হলে এক-দলের বলি অপরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাতে কিন্তু ওদের ভয় করে না যে দেবতা রাগ করবে, আর রাগ করলে দেবতার শাপ-মন্যিতে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

প্রকাশ বলিল—আরে আহাম্মক, এরা হল অসভ্য জাত। এরা এখনো প্রিমিটিভ রয়ে গেছে। এদের পুজো-পার্বণ আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তুই কি এমন গবেষণা করবি যে, তোর বরাতে নোবেল-প্রাইজ জুটে যাবে, বলতে পারিস?

হরেন বলিল—তুই বুঝছিস না প্রকাশ; মিছে কথা-কাটা কাটি করিসনে। জানিস, ধর্ম-বিশ্বাস জিনিসটা কি? এই ধর্মকে কল্পনা করে এতে বিশ্বাস রেখে মানুষ নিজের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক গড়ে নেয়। এই গড়ে-নেওয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দরকার মতো সে বিশ্বাসে কেউ পায় শক্তি, কেউ পায় সান্ত্বনা! একটা-না-একটা ধর্ম-বিশ্বাসে মনকে বাঁধতে না পারলে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করে কাজ-কর্ম করা...এক-কথায় আশা-নৈরাশ্য নিয়ে বেঁচে থাকা শক্ত হত!

প্রকাশ বলিল—কি যে তুই বলিস হরেন! এর জন্যই তুই লেখাপড়া শিখছিস! এবারে না গ্র্যাজুয়েট হবি!...নোড়ানুড়ি আর কুমোরটুলির কুমোরের গড়া মাটির মূর্তির উপর নির্ভর করে তুই জগতে দাঁড়াতে চাস? ঐ মূর্তি তোকে দেবে শক্তি? তোকে দেবে সান্ত্বনা? ধেৎ!

হরেন বলিল—তুই উল্টো তর্ক করছিস! কুমোরের গড়া মূর্তিটাই সব নয়। যে-কল্পনা নিয়ে কুমোর ও-মূর্তি গড়ছে, যে-রীতি মেনে—সেই কল্পনা আর রীতিকে আমি মানছি!...তাছাড়া জানিস, তোর আলডুস-হক্সলির মতো অতি-আধুনিক দার্শনিকও বলেছেন, ভক্তি-মার্গ ভালো; তাতে করে খুব শীগগির মানুষ তার কাজে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।...তাছাড়া মনের শক্তি কত, তার আইডিয়া তোর আছে? এই মন কতখানি জোর পায় ঐ ধর্ম-বিশ্বাসে—তা এখন না বুঝলেও একদিন বুঝবি, প্রকাশ। পুরাণের গল্প মনে আছে? ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন, গায়ের জ্বালায় অনেকে তখন গঙ্গার গতি রোধ করতে গিয়েছিল, রোধ করতে পারেনি! বিরাট দেহ আর সে-দেহে বিপুল শক্তি নিয়ে ভোঁদা ঐরাবতও গিয়েছিল। কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে ঐরাবত ভেসে গেছল! গল্প বলে যদি এ-কথা উড়িয়ে দিতে চাস, তাহলেও এ-গল্পের যে সার-মর্ম, তা হচ্ছে এই যে, উইল-পাওয়ারের চেয়ে বড় শক্তি আর নেই। তোর চেয়ে

দিগ্‌গজ পণ্ডিতের দলও নাস্তিকতা প্রচার করতে কসুর করেনি, তবু সেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস সমান-ধারায় বয়ে আসছে!

ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া প্রকাশ বলিল—আমি প্রতিজ্ঞা করছি হরেন, তোর যা খুশি তুই কর, আমি তাতে স্পিকটি-নট! চিরদিন তুই ইমোশনাল...কোনো যুক্তি তুই শুনবি না, আমি জানি।

কথাটা বলিয়া প্রকাশ খবরের কাগজ খুলিয়া বসিল।

হরেন চাহিল সনাতনের পানে, কহিল—তুমি ওদের পাহাড়ের দিকে আর কখনো যাওনি সনাতন?

সনাতন বলিল—না বাবু।

ওদিকে কি আছে?

সনাতন বলিল—ভুটানিরা আছে। পাহাড়ের ওধারে খানিক এগিয়ে যারা থাকে, শুনেছি, তারা আশ্চর্য রকমের মানুষ, বাবু। এদিককার কোনো খবর তারা রাখে না। তাদের ধরন-ধারণ আজো রয়ে গেছে সেই আদ্যিকালের মতো।

হরেন বলিল—সে কি রকম ধরন, সনাতন?

সনাতন বলিল—তা আমি জানি না। তবে গল্প-কথা শুনি কিনা, তাই বলছিলুম।

গল্প-কথা! তার মানে?

সনাতন বলিল—তারা অন্য দেশের লোককে সহ্য করতে পারে না। ভাবে, তাদের দেশ লুঠ করতে এসেছে, তাদের দেশে ভাঙন ধরিয়ে দেবে, তাদের দেশে দুঃখ-কষ্ট দিতে এসেছে!

হরেন বলিল—ওরা খুব সুখে আছে? টাকা-কড়ি, খাবার-দাবার—এ-সবের অভাব জানে না?

সনাতন কহিল—না বাবু, টাকা ওরা কোথায় তেমন পাবে? ওদের দেশ ছাড়া অন্য-সব দেশের লোককে ওরা সন্দেহ করে—মোটে বিশ্বাস করে না।

প্রকাশ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—তত্ত্ব-কথা পরে হলে চলে না? লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! খেয়েদেয়ে সনাতনের মুখে আজগুবি গল্প শুনো...

এ কথায় হরেন নিঃশব্দে আহারে মন দিল। তারপর আহার শেষ হইলে হাত-মুখ ধুইয়া বলিল—হাঁটা-পথে ওদিকে যাওয়া যায়?

সনাতন যেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল,—আপনি যাবেন না কি বাবু?

হরেন বলিল—যাব না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি!

সনাতন কহিল—হেঁটে মানুষ কতটুকু যাবে? ওরা অমন জোয়ান পাহাড়ি—ওরাই পারে না! ভুটানি-ঘোড়া ওদের সম্বল। এখানেও ভুটানি-ঘোড়া মেলে। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওরা যাতায়াত করে। পাহাড়ে কখনো খুব চড়াই উঠতে হয়—কখনো

আবার অমন হাজার-দু'হাজার ফুট নীচে নামতে হয়। ভুটানি-ঘোড়ার কড়া জান, পাহাড়ে চলার তাক্‌তুক্‌ তারা জানে।

কথাগুলি বলিতে বলিতে প্লেট-বাটি গোছ করিয়া তুলিয়া সনাতন চলিয়া গেল।

হরেন আবার ইজিচেয়ারে পড়িয়া চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিল।

মনে কেবলই তাকে খোঁচা দিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, এই তো এতদিন কলকাতার মতো জবর শহরে দিন কাটাইলে! কি পাইয়াছ? জীবনের এতগুলো বছর শুধু বুটিনের নিগড় মানিয়া চলিয়াছ। যতই এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াও—ছিলে তো খাঁচার মধ্যে পাখির মতো বন্দী! ভগবান হাত-পা দিয়াছেন, সে কি এক-জায়গায় বন্দী থাকিবার জন্য? বিধাতার তৈরি এত-বড় পৃথিবী! শৌখিন-ধনী না হইলে বুঝি সে-পৃথিবী দেখা যায় না? বেড়াইতে গেলে চাই অন্ততপক্ষে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাশ কামরা—তার সঙ্গে বেয়ারা-খানসামা আর পাহাড়-প্রমাণ লগেজপত্র! এত তোড়জোড় লইয়া কতদূর যাও? তার চেয়ে চাহিয়া দ্যাখো ঐ সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে! লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাঁরা হিমালয় হইতে কেপ-কমোরিন পর্যন্ত কেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! এই বয়সে এত আরাম চাহিলে দেহে কি আর পদার্থ থাকিবে? অম্বল, ডিস্‌পেপসিয়ায় দেহখানি হইবে রোগের ডিপো! শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে—শক্তি-সামর্থ্যের উপর কত টাকা চাই? এই যে আমেরিকা হইতে, ফ্রান্স হইতে হাঁটিয়া ওদিককার লোক পৃথিবী পর্যটনে বাহির হয়!...তাদের মতো হাত-পা চালাইয়া বাহির হইয়া পড়ো দিকিন! কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় চড়িবার জন্য কোন তেপান্তরের পার হইতে মানুষ আসিতেছে...তোমার মতো এ-সব মানুষেরও দু-হাত, দু-পা...তোমার চেয়ে বেশি হাত-পা দিয়া ভগবান তাদের পৃথিবীতে পাঠান নাই! অথচ তারা...আর তোমার বাড়ির পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা! তোমার মন কেন ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য অধীর হয় না? পাশ করিয়া পয়সা-উপার্জন? সে তো সকলে করিতেছে! তাহাতে কি সুখ? তার চেয়ে...

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

মন বলিল, ওঠো হরেন্দ্র, ভুটান হইতে ডাক আসিয়াছে। আর বাড়ি ফিরিয়ো না! পিছনে তাকাইয়া আবার সেই থোড়-বড়ি-খাড়া...আর খাড়া-বড়ি-থোড়? না, তার চেয়ে সামনে চল! সামনে বিরাট পৃথিবী মুক্ত, অবারিত তার তোরণ-দ্বার। এখান হইতে উত্তরে ঐ ভুটান...তার আরো উত্তরে হিমালয়! আরো উত্তরে চিন, মোঙ্গোলিয়া, রাশিয়া...

ঐ পাহাড়ের উপর দিয়া একদিন চিন হইতে আসিয়াছিলেন হিউয়েনথ্-সঙ। আজ তুমি চল ভারতবর্ষ হইতে সেই হিউয়েন্থ্-সঙের দেশে! তুমি মানুষ। মানুষ যাহা করিয়া গিয়াছে, তুমি কেন তাহা করিতে পারিবে না?

ঐ পাহাড়! ছেলেবেলায় জিওগ্রাফি পড়িয়া ম্যাপ দেখিতে, কতকগুলি কালির হিজিবিজি। সে হিজিবিজির পর আবার মা-ধরিত্রীর শ্যামল স্নেহাঞ্চল!

বাড়িতে মা-বাবা, দাদা-দিদি, ছোট ভাই সুরেন...?

মন বলিল, তারা আরামে আছে, আরামে থাকিবে! তোমার অদর্শন?...আজ যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাঁদেরও মৃত্যু হইবে?...তবে?

তুমি তবু মরিতে যাইতেছ না। যদি এদিককার পৃথিবী দেখিয়া ফিরিতে পার, তাহা হইলে সেদিনের সে-আনন্দ...বিজয়-উৎসবের সে-সমারোহ!

সারা রাত হরেনের চোখে ঘুম নাই! সে যেন সনাতনের বাবার কাহিনির সেই ভুটানি-বালকের মতো কার ডাক শুনিতেছে!

কে ডাকে...ডাকে!

হরেন বলিল—যাই মায়ি...যাই মায়ি-জী!

এ মা...ধরিত্রী-দেবী!

এমন করিয়া ধরিত্রী-মায়ের ডাক আর কেহ শুনিয়াছে? না!

হরেনের দেহ-মন বহিয়া পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরন বহিয়া গেল! সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন! আর তার স্বপ্নাতুর মনের সামনে...সাগরাম্বরা ধরিত্রী-মায়ের বিরাট মূর্তি!

পরের দিন ভালো করিয়া ভোরের আলো ফুটিবার পূর্বেই ছোট এক-টুকরো কাগজ লইয়া সেই কাগজে হরেন চিঠি লিখিল। লিখিল,

ভাই প্রকাশ,

আমাকে ক্ষমা করিস। এখানে এসে আমি যেন সারা পৃথিবীর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। ফিরে আবার সেই কলকাতার কলেজ আর কলেজে পার্সেন্টেজ রাখা—ওতে আর আমার এতটুকু রুচি নেই!

প্রগতির যুগে সকলে অগ্রসর হয়ে চলেছে—আমিও অগ্রসর হয়ে চললুম।

কোথায়, জানি না।

যদি কোনোদিন ফিরি, জানিস, সিদ্ধার্থের মতো ফিরব...বুদ্ধ হয়ে!

আমার ভালোবাসা নিস। মামাবাবুকে, মামীমাকে আমার প্রণাম দিস।

আমার সন্ধান করিস নে। সন্ধান পাবি না।

তার কারণ, আমি নিজে জানি না, কোথায় চলেছি, কোন পথে!

এ-পথে আমার গাইড আমার মন আর আমার এই দুই চোখ।

তোর—

হরেন

বাড়ির অদূরে ভুটানিদের আস্তানা। দশ টাকা দাম দিয়া একটা তেজি ভুটানি ঘোড়া কিনিয়া হরেন তার পিঠে চড়িয়া বসিল। একদিন স্পোর্টসে পটুতা ছিল তার; তার জোরে ঘোড়ার পিঠে চড়িতে তার মনে একটুকু দ্বিধা জাগিল না।

পয়সা-কড়ি যা ছিল, সঙ্গে লইয়াছে। আহার চাই। নহিলে যাত্রা নিষ্ফল।

মন বলিল—যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই পথে আহার যোগাইবেন!

হরেন নিজে আশ্চর্য বোধ করিতেছিল, নিজের উপর তার এ নির্ভরতা, ভগবানের উপর এমন বিশ্বাস এতদিন তার কোথায় ছিল!

ছয়

ভুটানি টাট্টুর পিঠে চড়িয়া হরেন চলিয়াছে। রেল-লাইনের উল্টা দিকে! যেদিকে পাহাড়ে-পাহাড়ে আড়াল তুলিয়া এদিককার পৃথিবীকে ওদিককার পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই অজানা দিকে চলিল।

মনের মধ্যে ইতিহাসের সেকেন্দর শাহ আসিয়া দেখা দিল! বলিল, এই তো চাই! জোয়ান ছেলে! মাটির পুতুল হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে কি? আমার মতো এমনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়।

সেকেন্দর শাহ, চেঙ্গিজ খান, তৈমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ন, কলম্বাস, ন্যানশেন—সকলে আসিয়া মনের সামনে উদয় হইতে লাগিল। সকলে তার কানে শুনাইল আশার বাণী—অনওয়ার্ড মার্চ....অনওয়ার্ড! ভয় নাই মাই বয়!

গর্বে হরেনের বুক দুলিয়া উঠিল। সে যে আর পাঁচজন বাঙালি-ছেলের মতো নয়, সে যে আজ অসাধ্য-সাধনের ব্রত-পালনে বাহির হইয়াছে...ইহাতেও কি আনন্দ! কি গর্ব!

মাইল-খানেক পথ চলিবার পর পথ ফুরাইয়া গেল। এবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে।

পাহাড়ের গায়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সর্পিল ভঙ্গিতে সরু পথরেখা। ঘোড়া নিজে সেই পথরেখা ধরিয়া চলিল...ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে এ-রেখা চলিয়াছে...ঘোড়াও সে-রেখায় পা ফেলিয়া সমানে উর্ধ্বে চলিয়াছে।

পাহাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝে কল-কল্লোল! গায়ে রোমাঞ্চ...হরেন ভাবিল, সে কি গন্ধর্ব-লোকের কাছ দিয়া চলিয়াছে? নহিলে এমন অপরূপ সুরে জল-তরঙ্গ বাজনা বাজায় কে!...

অগ্রসর হইয়া হরেন দেখে, গন্ধর্ব-কন্যাদের জল-তরঙ্গ নয়; পাহাড় ফাটিয়া অজগরের দেহের মতো মোটা-তোড়ে জল-ধারা নিঃসারিত হইতেছে।

এ জল গিয়া পড়িতেছে নীচে...দু-হাজার, চার হাজার ফুট নীচে কোন অতল ভূতলে!

পাহাড়ের দেহে সবুজ ঘাস, তৃণগুল্ম-তরু...পাহাড়ের কঠিন দেহকে তারা সবুজে-শ্যামলে রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

পিপাসায় কণ্ঠ অধীর। এক-জায়গায় ঘোড়া হইতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া হরেন নির্ঝরের জল পান করিল।

জল পান করিয়া আরাম পাইল। পাহাড়ের কোলে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিল...গভীর খাদ...পাহাড়ের পাথরে পাথরে অতিকায় সোপানশ্রেণি...মাঠ-জলা-প্রান্তর। দূরে প্রান্তর-পথে খাকি-শর্ট-শার্ট-পরা আরো ক'জন মানুষ...ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া কোথায় যেন চলিয়াছে...তাদের হাতে দূরবীন...পিঠে গোঁজা সঙ্গীন-বন্দুক...রৌদ্র-রশ্মিতে সঙ্গীন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে...বিদ্যুতের রশ্মির মতো!

খানিকক্ষণ চারিদিককার দৃশ্যমাধুরী উপভোগ করিয়া আবার সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল।

ঘোড়া চলিয়াছে...চলিয়াছে...

চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। উৎরাইয়ে ছোট ছোট ভুটানি বস্তি। মেয়েরা সকালে উঠিয়া কাজে লাগিয়াছে।...বস্তির চাল ফুঁড়িয়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পাহাড়ি ছাগল লইয়া ভুটানি-মেয়ে পাহাড়-পথে বাহির হইয়াছে।

দু-চারজন মেয়ে তার পানে চাহিয়া দেখিল। অলস দৃষ্টি। সে-দৃষ্টিতে এতটুকু কৌতূহল নাই!

তারপর চলিতে চলিতে পাহাড়ের প্রাচীরের অন্তরালে ও-সব বস্তি ছায়ার মতো কখনো মিলাইয়া যায়, কখনো আকাশের মেঘ-খণ্ডের মতো মাথার উপরে দু'চারিটা বস্তি আবার জাগিয়া উঠে! কোথাও বা বস্তির চিহ্ন নাই...শুধু পাহাড়ের পাথরে-পাথরে ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে—যেন মৌন-দৈত্যের দল! তাকে দেখিয়া কি মতলব আঁটিতেছে! তারপর আবার বস্তি! সেখানে মানুষ-জন...তাদের গুঞ্জন-রব কানে আসিয়া লাগিল! মনে হইল, ও যেন মধুকরের গুঞ্জন!

কোথাও ঝোপ-ঝাপ। সে-সব ঝোপে লাল, নীল, বেগুনি, সাদা...নানা রঙের ফুল। অজস্র ফুল। গাছে গাছে কত রকমের পাখি! এই প্রভাতে পাখিরা কল-গান তুলিয়া দিয়াছে...যেন পাহাড়ের দরাজ-বুকে তারা জলসা বসাইয়াছে!

চলিতে চলিতে খর বেশ ধরিয়া প্রভাত-সূর্য মাথার উপর তীব্র জ্বলন্ত হইয়া উঠিল! তার জ্বলন্ত কিরণে গায়ে তীব্র জ্বালা।

বাঁকা-পথে ঘোড়া পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। অদূরে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর। মাথার উপর পাহাড়ের শিরে রজত-তুষারের কিরীটিমালা। নীচে প্রসারিত প্রান্তরে যেন সবুজ রঙের সাগর। বাতাসে গাছপালা দুলিতেছে, কাঁপিতেছে...পাহাড়ের বুকে সবুজ রঙের ঢেউয়ের লীলাখেলা!

বৈকালে পিপাসায় কণ্ঠতালু জ্বালা করিতে লাগিল! ছোট নদী। নদীর জল তুষার-শীতল।

হরেন নামিয়া নদীর জল পান করিল। জলের বুক ভরিয়া রাশি-রাশি পানিফল।

হরেনের বুক আশার রঙে উচ্ছ্বসিত হইল। ভাবিল, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই এই নিরালা-নির্জন পাহাড়ের কোলে সাজাইয়া রাখিয়াছেন ক্ষুধাতুরের জন্য রসাল-মিষ্ট এই পানিফল!

পানিফল তুলিয়া হরেন খাইতে বসিল। বড় বড় ফল। ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিল। ...প্রান্তরের বুকে প্রচুর তৃণশস্য। ঘোড়া সে-তৃণশস্যে তার ক্ষুধা-নিবারণ করিল।

পশ্চিম-আকাশে আবির গুলিয়া সূর্য এবার অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে! দূরে আবার ঐ বস্তি দেখা যায়...

হরেন ভাবিল, রাত্রির মতো ঐ বস্তিতে বিশ্রাম! তারপর কাল সকালে আবার যাত্রা।

বস্তিতে আসিয়া ভাবিল, না, আকাশ-তলে বিশ্রাম করিব। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, আবার ঘরের উপর লোভ!

মনে হইল, এ পথের পর ঘর যদি আর না পাই? মাথার উপর আকাশের আচ্ছাদন...আচ্ছাদন-তলে বাস অভ্যাস করিয়া লই। মানুষ যেদিন প্রথম ধরণীর বুকে আসিয়াছিল, সেদিন তার মাথার উপরে চালা ছিল না, ছাদ ছিল না...শুধু নীল-নির্মল আকাশ!

সঙ্গে ছিল কম্বল। সেই কম্বলে গা ঢাকিয়া পাহাড়ের কোলে হরেন পড়িয়া রহিল। ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিল।

তারপর কখন রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে জানে না!

পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা শুরু।

চলিয়াছে...চলিয়াছে...চলিয়াছে...

পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই আর উৎরাই। উৎরাই আর চড়াই।

মাঝে মাঝে বড় বড় হ্রদ। নির্ঝর-ধারায় আরাম-করা সুর-সঙ্গীত! পদে-পদে দৃশ্যপট উলটাইয়া নব-নব বৈচিত্র্য!....

হরেনের রোমাঞ্চ হইতেছিল! কেবলি মনে হইতেছিল, পৃথিবী এমন সুন্দর! আর

এই সৌন্দর্য ছাড়িয়া কোথায় কালি-ঝুলিমাখা হট্টগোল-মুখরিত বন্ধ বিশ্রী শহর কলকাতায় কিসের মায়ায় সে পড়িয়াছিল!

ফল-ফুলের অজস্র কানন। কে এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া রচনা করিয়াছে?

দেখিয়া হরেনের বিস্ময়ের সীমা নাই! এত শোভা! এমন ঐশ্বর্য! জন-মানবের চিহ্ন কিন্তু কোথাও নাই!

হরেনের মনে হইতেছিল, ছেলেবেলায় রূপকথায় শোনা এ যেন সেই নিঝুম-পুরী! রাজা, রানি, রাজকন্যা, প্রজার দল...যেন কোন দৈত্যের মায়ায় দিনের বেলায় সব মূর্ছিত অদৃশ্য হইয়া আছে! রাত্রে এই বিরাট পাহাড়-প্রান্তর ভরিয়া যেন বিপুল কলরব জাগিয়া উঠিবে...রাজ-বাড়িতে কাড়া-নাকাড়া বাজিবে...প্রমোদ-নাট্যশালায় নৃত্যগীতাভিনয় শুরু হইবে...সিপাহি-শান্ত্রী-প্রহরীদের অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা উঠিবে!

সত্যই তাই?...

হরেন চলিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় চলিতেছে না! কে যেন তার আগে আগে চলিয়াছে—আর সে তাকে মায়া-মন্ত্রে এমন বিমুগ্ধ করিতেছে যে, হরেনের না গেলে চলে না...হরেনের ফিরিবার উপায় নাই...হরেনও চলিয়াছে।

ঘোড়া থামাইয়া আবার একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর।...শর্ট-শার্ট-পরা সে সব লোক...তারা যেন প্রাচীরের গায়ে রেখার মতো মিশিয়া আছে...চলন্ত রেখা।

তার গায়ে রোমাঞ্চ! ও-প্রাচীর ভেদ করিয়া কি করিয়া সে আসিল? পৃথিবীর যে-দিক হইতে আসিয়াছে, সে চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এই পাহাড় আর বনানী যেন সেদিককার কপাট বন্ধ করিয়া এদিককার সঙ্গে তার যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে!

আরও খানিকটা আসিবার পর ছোট একটা বস্তি। ভুটানি-বস্তি। এদিককার ভুটানি-বস্তি আর-এক রকম।

বস্তি হইতে একজন ভুটানি উঠিয়া তার কাছে আসিল...

হরেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! তার ঘোড়া চলিয়াছে। ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সে চলিয়াছে।

লোকটা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আধ মাইল আসিবার পর সে বলিল—হোয়্যার গো? (কোথায় চলেছো?)

এখানে ইংরেজি কথা শুনিয়া হরেনের বিস্ময় হইল! হরেন ঘোড়া থামাইল। জিজ্ঞাসা করিল—হু ইউ? (তুমি কে?)

লোকটার মুখে হাসির রেখা! সে বলিল—আই ভুটান। ইউ?

হরেন বলিল—ক্যালকাটা।

লোকটার হাসির রেখা আর একটু দীর্ঘ হইল। সে বলিল—আই ওয়াজ ক্যালকাটা লং লং বিফোর (আমিও কলকাতায় ছিলাম অনেক-দিন আগে)।

ঘোড়া চলিল। লোকটা সেই সঙ্গে চলিল।

আরও আধঘণ্টা! লোকটা ইংরাজিতে আবার বলিল—কোথায় যেতে চাও?

হরেন বলিল—ভুটান পার হয়ে হিমালয়ে। তারপর তিব্বত—চিন, মোঙ্গোলিয়া, রাশিয়া!

শুনিয়া সে বলিল—গুড ওয়ার্ড (বেশ কথা)। আই গো উইথ ইউ (আমি আজ তোমার সঙ্গে যাব)।

দু'জনে চলিয়াছে।

পাহাড়ের বুক এখানে সমতল। পাহাড় হইতে নামিয়া পথ যেন পৃথিবীর বুকে বিশ্রাম করিতেছে।

প্রায় এক-ঘণ্টা চলিবার পর আবার একটা বস্তি। দশ-বারো জন ভুটানি বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল।

ঘোড়া দেখিয়া হৈ-হৈ শব্দে সে-দল হইতে ছিটকাইয়া পাঁচ-সাত জন লোক ঘোড়ার সামনে আসিয়া হাজির!

ভুটানি অনুচরটিকে লক্ষ করিয়া পাহাড়ি-রুক্ষ ভাষায় তারা কি প্রশ্ন করিল। ভুটানি অনুচর তাহার জবাব দিল সেই ভাষায়। হরেন এ-ভাষা বোঝে না। তাদের কথার অর্থ বুঝিল না।

সে ঘোড়া থামাইল না। এ-দলের মধ্য হইতে দু'জন লোক হরেনের সেই ভুটানি অনুচরের সহিত কথা কহিতে কহিতে সহগামী হইল।

খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, নবাগতদের মধ্য হইতে একজন একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া সপাৎ করিয়া ঘোড়ার পিঠে আঘাত করিল। সে-আঘাতে ঘোড়া সামনের দুই পা তুলিয়া লাফ দিল। পাহাড়-পথ,—হরেন পাকা ঘোড়-সওয়ার নয়...যদি বিপদ ঘটে! হরেন রাগ করিল।

দু-চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া সে চাহিল তার সেই ভুটানির পানে, কহিল—উহাদের মানা কর। এমন যেন না করে!

যে লোকটা ঘোড়ার পিঠে ডাল দিয়া মারিয়াছিল, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পানে হরেন চাহিল। চাহিয়া দেখে, লোকটার চোখের দৃষ্টি যেন মানুষের দৃষ্টির মতো নয়। সে-দৃষ্টিতে যেন বাঘের চোখের ক্ষুধিত হিংসা ফুটিয়া আছে!

হরেনের ভর্ৎসনা ভুটানি তাকে বুঝাইয়া দিল। সে কি বুঝাইল, হরেন বুঝিল না! আবার সে ঘোড়ার পিঠে ডাল মারিল। ঘোড়া আবার লাফ দিল।

কোনোমতে ঘোড়াকে শান্ত করিয়া হরেন সেই লোকটার পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; প্রায় পাঁচ-মিনিট। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হরেনের রক্ত হিম হইয়া গেল। লোকটার দৃষ্টিতে ধারাল ছুরি! মানুষের চোখে এ কি দৃষ্টি...হরেন এমন দৃষ্টি পূর্বে দেখে নাই! এমন দৃষ্টির কল্পনা তার মনে জাগে নাই!

যে লোকটা ঘোড়াকে মারিয়াছিল, সে আসিয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিল। বেশ কষিয়া ধরিল।

হরেনের মনে হইল, তার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। মাথার মধ্যে ঝিমি-ঝিমি...দু'চোখের সামনে পাহাড়-বন একাকার হইয়া মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! হরেনের মনে হইল, তার প্রাণের লীলা যেন শেষ হইয়াছে! জীবনের উপর মৃত্যুর কালো পর্দা যেন ঐ নামিয়া আসিতেছে!

পাহাড়ের পিছনে সূর্য তখন একেবারে লালে লাল! আকাশের সূর্য সন্ধ্যায় রক্ত-সাগরে স্নান করিয়া যেন রক্ত মাখিয়াছে! পাহাড়ের বুকে বড় বড় পাইন গাছের শ্রেণি। পাইনের সবুজ পত্র-পল্লবের উপর সে-রক্ত যেন ঢেউ তুলিয়া দিল!

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল...হরেন ঘোড়ার পিঠে বসিয়া রহিল নিস্পন্দ জড় পুতুলের মতো!

সাত

এমনি নিস্পন্দ নিশ্চেতন পুতুলের মতো ঘোড়ার পিঠে বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া কত পথ অতিক্রম করিয়া আসিল, হরেনের খেয়াল নাই! সে শুধু চলিয়াছে... চলিয়াছে...চলিয়াছে। দু-পাশে পর্দা তুলিয়া গাছপালা, পাহাড়—এরা যেন স্তব্ধ নেত্রে কৌতুক-ভরে এই মহাপ্রস্থানের পথে তার মহাযাত্রা দেখিতেছে।

কখন এক সময়ে সহসা তার চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিলে হরেন বুঝিল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, আর চাঁদের জ্যোৎস্নায় পাহাড়-বন ভরিয়া গেছে।

গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। স্বপ্নপুরীতে আসিল না কি? শব্দ নাই! পাতায়-পাতায় এতটুকু মর্মর-ধ্বনি নাই। একবার মনে হইল, সে সত্য সেই হরেন? না, মায়া-কাঠি বুলাইয়া কে তাকে পাথরের মূর্তি করিয়া দিয়াছে?

কিন্তু না, পাথরের মূর্তি নয়! পাথরের মূর্তির আঁকা চোখ...সে-চোখে কিছু দেখিতে পারে না—দেখিতে পায় না। হরেন চোখে দেখিতেছে...মাথার উপরে আকাশ...আকাশে চাঁদ...তার চিরদিনের চেনা চাঁদ...সামনে আশে-পাশে পাহাড়, তরু-পল্লব নির্ঝর...আর পাশে এই তিনজন ভুটানি...সে ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আছে...সে-ঘোড়া চলিয়াছে...ভুটানিরা তার সঙ্গে চলিয়াছে! সকলে চলিয়াছে।

মাঝে মাঝে তারা কথা কহিতেছিল। সে-কথা না বুঝিলেও হরেন এটুকু বুঝিতেছিল যে, পুরনো সঙ্গীর ভাব কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত! নবাগত দু'জনের উল্লাস একেবারে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে!

বহুদূর আসিয়া একটা অনিবিড় বন-কুঞ্জ। পুরনো সঙ্গী বলিল—আজ রাত্রে আর যাওয়া হবে না...এখানে রেস্ট (বিশ্রাম)!

হরেনের দেহ ক্লান্তিভরে অবসন্ন। কোনোমতে সে ঘোড়া হইতে নামিল।

পড়িয়া যাইতেছিল, ভুটানিরা তাকে ধরিয়া নামাইল। ঘোড়া থামাইয়া হরেনকে তারা পাহাড়ের কোলে বসাইয়া দিল।

ক্ষুধায়, পিপাসায় হরেনের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইবে, এমন অবস্থা!

কাছে সুর-কল্লোল তুলিয়া পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া ছোট একটি ঝর্না। নবাগতদের মধ্যে একজন ভুটানি কাছের একটা গাছ হইতে কতকগুলা ফল পাড়িয়া আনিল। হরেনকে দিল, দিয়া নিজেরা খাইতে বসিল। হরেন কোনোমতে গিয়া ঝর্নার ধারে বসিয়া পড়িল; বসিয়া হাতের দুই অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

দু-চোখে ঘুমের ঘোর। মনে হইতেছিল, আর বাঁচিয়া কাজ নাই! এতদিন যে বাঁচিয়াছিল, এই ঢের! বাঁচিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে!

দেহ-মন যা হইয়াছে...কোনোমতে যদি একটু শুইতে পায়, আঃ, প্রাণটাকে মৃত্যুর কোলে সঁপিয়া হরেন তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া জন্মশোধ ঘুমায়!

পরিচিত ভুটানিকে সে প্রশ্ন করিল—তোমার নাম কি ফ্রেন্ড?

হাসিয়া সে বলিল—ত্র্যম্বক।

হরেন বলিল—বড্ড ঘুম পেয়েছে...

ত্র্যম্বক বলিল—ঘুমোও...

হরেন বলিল—এদের নাম?

ত্র্যম্বক নাম বলিল।

যে-লোকটি ঘোড়াকে মারিয়াছিল, তার নাম হর্দে; তার সঙ্গীর নাম জরদ।

হরেন বলিল—দে ফ্রেন্ডস্ (ওরা বন্ধু)?

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস।

পাহাড়ের গায়ে ছোট গুহা।

বাহিরে খুব শীত...হাড়-পাঁজরা ঝন্‌ঝন্ করিতেছে।

গুহার মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া হরেন শুইয়া পড়িল।

ঘোড়াকে বাঁধা হয় নাই। বাঁধিবে, সে-শক্তি নাই। একবার মনে হইল, এরা যদি

ঘোড়া লইয়া পলায়? পরক্ষণে মনে হইল, পলায়, উপায় কি? ইহাদের হাতে পড়িয়াছি, পরিত্রাণ পাইব, সে-আশা আর আছে না কি?

হরেন চোখ বুজিল। এত ঘুম পাইতেছে...চোখে ঘুম নাই...সর্বশরীর সে-ঘুমে আচ্ছন্ন!...চোখে সে-ঘুম কিছুতেই আসিয়া বসিতে চায় না!

হরেন মনে-মনে বলিতেছিল, আর ঘুম! ঘোড়া যদি পলায়, ঘোড়াকে যদি উহারা মারিয়া ফেলে? দুঃখ নাই! এখন চাই ঘুম আর ঘুম! এ-দুশ্চিন্তার দায় হইতে তাহা হইলে মুক্তি মিলিবে!

চোখে একবার করিয়া ঘুম আসে, অমনি সারা দেহ-মনে কে যেন চমক লাগায়...সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিয়া যায়! ঘুম ভাঙিয়া গেলে হরেন প্রাণপণ-বলে আবার চোখ চাহিবার চেষ্টা করে...পারে না! কে যেন আঠা দিয়া দু-চোখের পাতা আঁটিয়া দিয়াছে! কি দুর্গ্রহ! কি দুর্ভোগ!

এ দুর্ভোগ হরেন আর সহিতে পারে না!

এমনি আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে এক-একবার মনে হয়, এ কি মৃত্যুর পূর্ব-লক্ষণ? আসিবার পূর্বে মরণ কি এমনি করিয়া সম্মোহন-বাণে দেহ-মনে ঘুম আনিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়? মানুষের চেতনার উপর কি এমনি করিয়া মৃত্যু নিশ্চেতনতার পাথর টানিয়া দেয়?

ওদের তিনজনের কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া বিঁধিতেছে! ওরা কি কথা কয়? মন্ত্রণা? ষড়যন্ত্র?

কিসের মন্ত্রণা? টাকা চায়? টাকায় হরেনের কি প্রয়োজন? তার কাছে টাকা-পয়সা যা আছে, খুশি-মনে সে উহাদের হাতে এখনি দিয়া যাইতে পারে! তবে?

সারা দেহ সহসা কেমন কাঁপিয়া উঠিল! মন বলিল, এ-পথে কেন আসিয়াছিলে? ভাবিয়াছিলে, তুমিও মহাবীর সেকেন্দর শাহ! হায়রে, ক্ষুদ্র একটা পতঙ্গের নড়িবার যে শক্তি আছে, সে-শক্তি তোমার নাই। জান, মহাবীর সেকেন্দর শাহের সঙ্গে ছিল দশ-বিশ লক্ষ ফৌজ! তিনি তোমার মতো...দুঃসাহস বা পাগলামির উপুর ভর করিয়া একা দিগ্বিজয়ে বাহির হন নাই!

ভাবিল, এই তো মানুষের শক্তি। এ-শক্তির গর্ব মানুষ কি ভরসায় করে?

প্রকাশের কথা মনে পড়িল...সেই সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাস, ঠাকুর-দেবতা। মনে পড়িল; প্রকাশ বলিয়াছিল, প্রকাশ এ-সব মানে না।

হরেন মানে। কিন্তু মানিয়া তার কি ভালো হইতেছে?

মন বলিল, নিশ্চয়ই হইবে! ডাকো তুমি তোমার ঠাকুর-দেবতাকে। তাঁরা তোমাকে এ-বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না?

ঠাকুর-দেবতার কথা মনে পড়িবামাত্র সেই সঙ্গে মনে হইল, কোন ঠাকুরকে ডাকিবে?

প্রথমে মনে পড়িল, ছিন্নমস্তা দেবী!

মনে-মনে ডাকিল—এ-পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হে মাতঃ ছিন্নমস্তা...দাও, আমার চেতনা ফিরাইয়া দাও। আমাকে আমার শক্তি ফিরাইয়া দাও! তোমার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছি মা! আমাকে এমন জড় পুতুল করিয়া ফেলিয়া রাখিও না!

হরেন ডাকিতে লাগিল,—ছিন্নমস্তা দেবী...মা ছিন্নমস্তা...মা দশ-মহাবিদ্যারূপিণী...

ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে হরেনের সর্বদেহ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বুকের মধ্য হইতে এক-ঝলক রক্ত যেন বন্যার স্রোতের মতো মাথায় গিয়া উঠিল! কে যেন তার দু'চোখ সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে!

সকালে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসের স্পর্শ! মায়ের স্নেহ-স্পর্শের মতো...

চোখ বুজিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে হরেন ডাকিল,—মা...মা...আমার মা...

তারপর বুঝিল, মা নন...বাতাস! বাতাসের স্পর্শ এ! বাতাসের সে-স্পর্শে হরেন চোখ খুলিল!

যখন চোখ খুলিল, আলো। গুহার মধ্যকার সে-অন্ধকার কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

কম্বল জড়াইয়া হামা দিয়া সে গুহার বাহিরে আসিল!

আসিয়া দেখে, ভুটানি তিনজন বসিয়া আছে।

হরেন ডাকিল—বন্ধু...

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস...

হরেন বলিল—এবার আবার গোয়িং (যাওয়া)?

ত্র্যম্বক চাহিল হর্দে আর জরদের পানে। তিনজনের চোখে-চোখে ইঙ্গিত বহিয়া গেল।

তারপর ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস...

হরেন বলিল—আমার হর্স (ঘোড়া)?

লাগাম ধরিয়া জরদ ঘোড়া আনিয়া দিল।

হরেন বলিল—নো ফুড্? আই হাঙ্গরি (খাবার নাই? আমি ক্ষুধার্ত)!

ত্র্যম্বক কতকগুলো বাদাম দিল হরেনের হাতে। হরেন হাসিল, বলিল—সো থার্স্টি (খুব পিপাসা)!

ত্র্যম্বক বলিল—দ্যাট ওয়াটার (ঐ জল)।

সে দেখাইল ঝর্নার দিকে। ঝর্নার কথা হরেন ভুলিয়া গিয়াছিল।

ত্র্যম্বকের কথায় সে ঝর্নার ধারে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঝর্নার জল পান করিল; তারপর বাদাম ভাঙিয়া মুখে দিল। বাদামের খোলা বেশ পাতলা। আঙুলের চাপ দিবামাত্র খোলা ভাঙিয়া গেল।

তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে সেই আসন। ঘোড়ায় চড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভুটানি তিনজন...

হরেনের অস্বস্তি ধরিতেছিল! একা বেশ আসিতেছিল—এমনি একা ঘোড়ায় চড়িয়া পৃথিবীর প্রান্ত-সীমা পর্যন্ত সে যাইতে পারে! কিন্তু সঙ্গে এই এরা? অদৃষ্টের মতো কেন তাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল? সঙ্গ লইয়াছে কেন? কি চায়? কিসের লোভ?

টাকা-কড়ি?

হরেন ডাকিল—ফ্রেন্ড...

ত্র্যম্বক বলিল—ইয়েস...

হরেন বলিল—তোমার বন্ধুরা টাকা চায়?

ত্র্যম্বক চাহিল হর্দে এবং জরদের পানে। চাহিয়া কি প্রশ্ন করিল। তারা সে প্রশ্নের জবাব দিল। ত্র্যম্বক বলিল—না; টাকা চায় না।

হরেনের রাগ হইল, বলিল—তবে কি চায়?

ত্র্যম্বক বলিল—কিছু না...

হরেন বলিল—দু'জনে বেশ যাচ্ছিলুম। ওদের যেতে বল না কেন?

তাদের উদ্দেশ করিয়া ত্র্যম্বক কি কথা বলিল। তারা সে কথার জবাব দিল।

তারপর ত্র্যম্বক ফিরিয়া চাহিল হরেনের পানে, বলিল—ওরা বলছে, চলার পথে সকলেই চলে। পথে সকলের অধিকার আছে। তুমি চলেছ, ওরাও চলেছে। জীবনের পথ নিঃসঙ্গ হয় না।

হরেনের রাগ হইল। পাজি-বদমায়েশ! নিশ্চয় কোনো শয়তানি মতলব আছে...সে মতলব চাপিয়া আধ্যাত্মিক কথা বলিতেছে!

হরেন ভাবিল, যদি ফিরিয়া যাই? না গেলেও ইহাদের কাছে যদি সেই কথা বলি?

হরেন বলিল—আমি এবার ফিরিব।

ত্র্যম্বক বলিল—না...

না! হরেন আবার রাগ করিল, বলিল—যদি ফিরি?

ত্র্যম্বক বলিল—এখানে এলে ফেরা যায় না বন্ধু! শুধু সামনে যেতে হয়।

আশ্চর্য কথা! শুধু সামনে যেতে হয়। হুকুম? বটে! কে এমন হুকুম দিয়াছে? হরেন এ-হুকুম মানিবে না!

হরেন বলিল—কিসের আশায় মানুষ সামনে যায়?

ত্র্যম্বক বলিল—তা কেউ জানে না। তবু মানুষ শুধু সামনে চলে।

হরেন ভাবিল, বাঃ, এ লোকটাও আধ্যাত্মিক কথা কয়! মনে হইল, পৃথিবী

ছাড়িয়া সে কোনো ধর্মগ্রন্থের পাতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল না কি? না, স্বপ্ন দেখিতেছে?

কিন্তু ইহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই! সামনেই চলা যাক! আমি আছি ঘোড়ার পিঠে। সমতল প্রান্তর পাইলে ঘোড়াকে গুঁতা মারিয়া এমন জোরে ছুট করাইয়া দিব...একেবারে তীরের গতি...তখন দেখিব, কোথায় থাকে উহাদের এমন সাঁটিয়া-থাকার শয়তানি...আর ঐ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথা!

আট

প্রায় দু-ঘণ্টা কাটিল। সমতল প্রান্তরের দেখা মিলিল না। শুধু বরফ আর বরফ। বরফে পাহাড়ের গা ভরিয়া আছে। সবুজ মখমলের আবরণের উপর যেন রূপার চাদর বিছানো!

বাতাস বহিতেছে...সে-বাতাসে শীতের কাঁপন! হরেন গায়ে কম্বল জড়াইল। হাত খোলা। হাত দুটো যেন বরফে জমিয়া যাইবে! হিমের নিস্পন্দতায় দু-হাত অসাড় হইয়া আসিতেছে!

পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া মস্ত একটা ঝর্না। তীব্রবেগে হাতির শুঁড়ের ধারায় জল পড়িতেছে...সেই পাতালের মুখে। জল পড়িয়া বিস্তীর্ণ হ্রদ। সে-হ্রদের একদিককার খিল কে খুলিয়া দিয়াছে! সেই খিল-খোলা পথে জল-ধারা গড়াইয়া খেলায়-মত্ত বালকের মতো লাফাইতে লাফাইতে উল্লাসে মাতিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন কোন রসাতলের বুকে!

এই নদীর তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে আবার এক বস্তি। সেখানে অনেক লোক। একটা মন্দির। মন্দিরের চূড়া যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে।

মন্দির দেখিয়া হর্দে আর জরদ যেন মাতিয়া উঠিল! হরেন তাদের সে-আনন্দ লক্ষ করিল। লক্ষ করিয়া বিস্মিত হইল। এই আনন্দের অর্থ?

তারপর পাহাড়ের পাষাণ-সোপান অতিক্রম করিয়া সবুজ শ্যামল বিস্তীর্ণ উপত্যকা। তার বুকের উপর দিয়া রূপার পাতের মতো স্রোতস্বতী বহিয়া চলিয়াছে। নদীর দুই তীরে পাথরের প্রাচীরে ঘেরা ঘর-বাড়ি। নদীর বুকের উপর গাছ-ফেলা সরু পুল।

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া মুগ্ধ নয়নে হরেন দেখিল। চমৎকার দৃশ্য! মনে হইল পাহাড় পার হইয়া যেন মায়া-পুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এমন দৃশ্য! তবু কি অজানা ভয়ে তার বুক ছমছম করিতেছিল!

এ-পথ গিয়াছে ঐ মায়া-পুরীর দিকে। পথের দু'দিকে ফুলের অজস্র কুঞ্জ...সে-সব ফুলের তুলনা হয় না!

পথ গিয়া পুরীর সীমানায় মিশিয়াছে। দেবদারুর সার...এগুলা ইউক্যালিপটাস গাছ—ওগুলো চেনার...

একজন রাখল...মাথার উপর ঝুড়ি চাপাইয়া কতকগুলো ছাগল চরাইতেছে। ছায়ায় বসিয়া কতকগুলো ভুটানি নর-নারী...

তাদের দেখিয়া হর্দে আর জরদ সেই ছায়া-কুঞ্জের দিকে ছুটিল। এখানে এখন হরেন আর ত্র্যম্বক।

হরেন বলিল—চলি?

ত্র্যম্বক বলিল—না।

হরেন বলিল—আমি যাব তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া...

ত্র্যম্বক বলিল—না। এরা যেতে দেবে না।

হরেন বলিল—যেতে দেবে না কেন? তোমরাই তো বলেছ, মানুষ শুধু এগিয়ে চলে—

ত্র্যম্বক কোনো জবাব দিল না...হরেনের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছায়া-কুঞ্জে একটা চাঞ্চল্য। তারপর ঐ হর্দে আর জরদ ফিরিয়া আসিতেছে...তাদের সঙ্গে আসিতেছে এক বৃদ্ধ ভুটানি।

হরেন ঘোড়ার লাগাম ধরিল...ঘোড়া শুধু মাথা নাড়িল!

হরেনের বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল! বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সব যেন কালো ধোঁয়ার নীচে ঢাকিয়া গেল! ঘোড়ার পেটে সজোরে পদাঘাত করিল। দু-পা তুলিয়া ঘোড়া একবার লাফাইয়া উঠিল—এক-পাও অগ্রসর হইল না! কে যেন মন্ত্র পড়িয়া তার গতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

হর্দে আর জরদকে সঙ্গে লইয়া বুড়া ভুটানি আসিল ঘোড়ার কাছে।

ত্র্যম্বক বলিল—প্রধান পুরোহিত। তন্ত্রে-মন্ত্রে দেশের মঙ্গল যা-কিছু, তা ইনিই করেন।

বুড়া আসিয়া ত্র্যম্বককে কি প্রশ্ন করিল।

ত্র্যম্বক সে-কথা হরেনকে শুনাইল, বলিল—পুরোহিত জিজ্ঞাসা করছেন, এখানে তুমি কিসের সন্ধানে এসেছ?

চকিতের দ্বিধা! হরেন বলিল—আমি? না, কোনো-কিছুর সন্ধানে আসিনি। শুধু দেশ দেখতে বেরিয়েছি। এক পৃথিবীতে সকলে বাস করি; সেই পৃথিবী দেখব, সকলকে দেখব।

ত্র্যম্বক একথা বুঝাইয়া দিল। উত্তরে ত্র্যম্বককে বুড়া কি বলিল।

ত্র্যম্বক হরেনকে বলিল—পুরোহিত বলছেন, পৃথিবী খুব বড়। তোমার ভগবান তোমাকে যে-জায়গায় থাকতে দেছেন, সে-জায়গায় খুশি হয়ে না থেকে পরের জায়গা দেখবার লোভ তোমার কেন হল? পুরোহিত বলছেন, তোমার পৃথিবীর দেবতাকে আমাদের পৃথিবীতে চালাতে এসেছ, বুঝি? একদিন তোমাদের বুদ্ধদেব এই কাজ করে এ-দেশের সর্বনাশ করে গেছেন।

কথা শুনিয়া হরেন অবাক। হরেন বলিল—না, না, তা নয়, বন্ধু। বুদ্ধদেব ছিলেন দেবতা। আমি সামান্য মানুষ। আমার দেশ...তোমার দেশেরই মতো। সে-দেশ ছেড়ে আমি বেরিয়েছি...অন্য দেশের দেবতাদের আপন করে নিতে। মানুষে-মানুষে ভেদ নেই, একথা সত্য কিনা, তাই বুঝতে এসেছি।

ত্র্যম্বক কথাটা বুড়ো ভুটানিকে বুঝাইয়া দিল।

তারপর নিবিড় স্তব্ধতা...কাহারো মুখে কথা নেই!

অনেকক্ষণ পরে সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুড়ো ভুটানি কথা কহিল। বলিল—আমাদের দেবতা যদি না ডাকেন, তাহলে এ-দেশে কেউ আসতে পারে না। আসবার দুঃসাধ্য কারও নেই! পাছে কেউ আসে, সেজন্যে এ-দেশের চারিদিকে বড় বড় পাহাড়ের পাঁচিল তুলে আমাদের দেবতা তোমাদের দেশের আড়ালে এমন করে আমাদের লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের এ-দেশ সত্যিকারের দেবতার দেশ।

হরেন বলিল—নিশ্চয়! তোমাদের দেবতা আমাকে ডেকেছেন। তাই আমি এসেছি...দেবতার ইচ্ছায় এসেছি। দেবতার ইচ্ছা না হলে মানুষ কী করতে পারে, বলো?

একথা বুড়াকে বুঝাইয়া দিলে বুড়ার মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল।

বুড়া বলিল—ওকে নিয়ে এস।

হর্দে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং ঘোড়াকে টানিয়া ঘোড়ার পিঠে-চড়া হরেনকে সকলে লইয়া আসিল ছায়া-কুঞ্জের পিছনে পাথরের ঘরে।

বুড়া বলিল—খুব ক্লান্ত হয়েছ?

ত্র্যম্বক দোভাষীর কাজ করিল।

হরেন বলিল—হ্যাঁ।

বুড়া বলিল—ঘোড়া থেকে নামো। তোমার জন্য ডুলি আসছে।

হরেন ঘোড়া হইতে নামিল।

চারিদিক হইতে চকিতে ভুটানিরা আসিয়া ভিড় জমাইল। সকলের চোখে বিস্ময় যেন জীবন্ত-জাগ্রত! বিস্ময়ের সে-ভঙ্গি দেখিয়া হরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল!

কাহারও মুখে কথা নাই। কে যেন তালা-চাবি দিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে!

ডুলি আসিল। হরেন ডুলিতে বসিল।

অবসাদে ভরিয়া দেহ এমন হইয়াছে যে, বসিবামাত্র সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইল। হরেনের চেতনা লোপ পাইল!

চেতনা ফিরিলে হরেন দেখে, পাথরের মেঝেয় সে শুইয়া আছে—চারিদিকে পাথরের প্রাচীর—মাথার উপরে শুধু একটু নীল আকাশ।

কাছে বসিয়া ত্র্যম্বক আর সেই বুড়া পুরোহিত।

তাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া ত্র্যম্বককে বুড়া কি বলিল।

হরেনের পানে ত্র্যম্বক চাহিল, কহিল—ও-সব পোশাক ছেড়ে এখানকার পোশাক পরতে হবে। এদেশের নিয়ম।

কথাটা বলিয়া ত্র্যম্বক হরেনের হাতে ভুটানি পোশাক দিল।

হরেন বিনাবাক্যে সে-পোশাক লইল। প্রতিবাদ তুলিবার মতো শক্তি তার ছিল না।...

দু-দিন...তিন দিন...সাত দিন কাটিয়া গেল। সেই এক ঘরে হরেন সাত দিন, সাত রাত বন্দী।

আট দিনের দিন ত্র্যম্বক আসিল।

হরেন বলিল—আমায় এমনি বন্ধ করে রাখবে?

ত্র্যম্বক বলিল—না। পুরোহিত বলেছে, ঘরের বাইরে বাগান আছে! সে-বাগানে তুমি বেড়াতে পার।

তামার পাত্রে ত্র্যম্বক আনিয়াছিল পানীয়। বলিল—পূজার চরণামৃত...খাও।

হরেন বিস্ময় বোধ করিল। আমাদের দেশের মতো পূজার সেই বিধি...পূজাশেষে চরণামৃত পানের ব্যবস্থা!

কোনো দেবতার উপর হরেনের বিরাগ নাই। সকল ধর্মের সব দেবতাকে সে মানে। ত্র্যম্বকের কথায় হরেন চরণামৃত পান করিল!

ত্র্যম্বক বলিল—ভাল লাগল?

হরেন বলিল—আমাদের দেশের চরণামৃতের মতো নয়। অন্যরকম স্বাদ...ঝাল, কষা, মিষ্টি, নোনতা...

ত্র্যম্বক বলিল—হ্যাঁ। এ চরণামৃত পান করলে দেহে-মনে আরাম মেলে।

ত্র্যম্বক চলিয়া গেল।

হরেন নিঝুম বসিয়া রহিল...অনেকক্ষণ...

হঠাৎ মনে পড়িল, ঘরের বাহিরে বাগান। সে-বাগানে যাইবার অধিকার তার আছে।

নয়

আরও পাঁচ-ছ'দিন পরের কথা।

হরেন এখন ঘরের বাহিরে বাগান পার হইয়া বহুদূর পর্যন্ত যায়। অনুমতি মিলিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো আসিয়া মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়।

শূন্য মন্দির। দেখিয়া তার বিস্ময়ের সীমা নাই! এরা ধর্ম লইয়া এত তত্ত্ব-কথা বলে, অথচ মন্দির এমন শূন্য পড়িয়া আছে কেন?

সেদিন বুড়া পুরোহিত আসিল তার সঙ্গে কথা কহিতে; সঙ্গে রহিল শুধু ত্র্যম্বক—দু'জনের কথা তর্জমা করিয়া দিবে।

নর-নারীর পোশাকের রঙে পার্থক্য লক্ষ করিয়া হরেনের মনে যেমন কৌতুক, তেমনি কৌতূহল!

সে প্রশ্ন করিল—তোমাদের পুরুষদের দেখি, সকলেই লাল, নীল—নানা রঙের কুর্তা গায়ে দাও। মেয়েদের গায়ে দেখি শুধু কালো রঙের কুর্তা। এর মানে?

পুরোহিত বলিল—মানে আছে। পুরুষ-মানুষ হল আকাশের সূর্য...আর মেয়েরা হল চাঁদ। পুরুষ আলো দেয়, তেজ দেয়। চাঁদের আলো? চাঁদের ও-আলো সূর্যের কাছ থেকে ধার করা। মেয়ে-মানুষের যা কিছু শক্তি, তা শুধু পুরুষের দৌলতে!

হরেন এ-কথার অর্থ বুঝিল না...চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পুরোহিত বলিল—পাহাড়ের ওদিকে তোমরা থাকো...পৃথিবীর কিছুই জান না! তোমরা বলো বিজ্ঞান..বিজ্ঞানে তোমাদের ভয়ঙ্কর দখল। বিজ্ঞানের জোরে আলো-বাতাস, আকাশের বিদ্যুৎকে তোমরা বন্দী করেছ! বিদ্যুৎ তোমাদের পথে-ঘাটে-ঘরে আলো দ্যায়...ঘরে তোমাদের পাখা চালিয়ে বাতাস করে। আগুন তোমাদের তাঁবেদারি করে। সাগরকে তোমরা এমন করেছ যে, তার বুক বয়ে যাতায়াত কর, সাগর তোমাদের গিলতে পারে না। বাতাস তোমাদের কথা বয়ে দূর-দূরান্তরে নিয়ে যায়। এদেশে বসে তোমরা বহু দূর-দেশের গান শোনো। এখানকার খবর এক মিনিটে তোমরা পাঠাও সাতসমুদ্দুরের পারে।...আমাদের দেশ থেকে যে-সব লোক তোমাদের দেশে যায়, তারা ফিরে এসে আমাদের কাছে এইসব কথা বলে। শুনে আমরা হাসি। ...আমরা বলি, তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ...আলো, বাতাস, বিদ্যুৎ! এ-সব হল খেলনা। খেলনা নিয়ে তোমরা এমন ভুলে আছ যে, দেবতার কথা আর তোমাদের মনে জাগে না।...

হরেন বলিল—আমরা দেবতা মানি। দেবতার পুজো করি। আমাদের দেশে দোল হয়, দুর্গোৎসব হয়, কালী পুজো, লক্ষ্মী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, গঙ্গা পুজো—কোন দেবতার পুজো আমরা না করি, বলো? মায় মাকাল-ষষ্ঠী পর্যন্ত!

পুরোহিত বলিল—ও-সব ছেলেখেলা। দেবতা আছেন শুধু একজন...ঈশ্বর! তোমরা এত দেবতা লেলিয়ে দেছ বলে আমাদের দেবতা মন-মরা হয়ে আছেন। তিনি কি আদেশ দেছেন, জান?

হরেন বলিল—কি?

পুরোহিত বলিল—তিনি আদেশ দেছেন, পাহাড়ের ও-দিকটা হল সভ্যদের দেশ...অহঙ্কারের দেশ! দরকার হলে তোমরা দেবতার নাম নাও...না-হলে সব সময় নিজেদের অহঙ্কারকেই সর্বস্ব করে রেখেছ! যা কিছু কাজ করবে, সে-কাজ সিদ্ধ হলে তোমরা বলো, তোমরা করেছ! আর কাজ যখন পণ্ড হয়, বলো, দেবতার চক্রান্ত! মাঠে যখন খুব ফসল হয়, তখন বড়াই করে বলো, তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে হয়েছে! আর যে-বছর ফসল হয় না, বলো, দেবতা বৃষ্টি দিলে না, তাই এ অজন্মা! ...তোমাদের এই অহঙ্কার চূর্ণ করতে না পারলে আমাদের দেবতা তুষ্ট হবেন না! দেবতা তুষ্ট না হলে আমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে না। তাই আমাদের দেবতার আদেশ...

কথাটা বলিয়া পুরোহিত চুপ করিল। পুরোহিতের গম্ভীর মুখ দেখিয়া হরেনের বুকে মৃদু কাঁপন! হরেন বলিল—কি আদেশ, শুনি...

পুরোহিত বলিল—দেখবে দুশ্চিন্তায় আমাদের দেবতার কি-মূর্তি হয়েছে?

কথাটা বলিয়া হরেনকে লইয়া পুরোহিত কতকগুলা পাথরের সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া কহিল—ঐ দ্যাখো...

হরেন দেখিল, পাথরের জীর্ণ বেদী। সেই বেদীর উপর দেবী-মূর্তি...মূর্তির কাঁধে মাথা নাই! দেবীর দেহে নরমুণ্ডমালা...মানুষের খুলি, অস্থি-কঙ্কালের গহনা!

দেখিয়া হরেন শিহরিয়া উঠিল। বলিল—দেবীর মাথা নেই কেন?

পুরোহিত বলিল—তোমাদের অনাচার আর অহঙ্কার দেখে দেবী নিজের মাথা নিজে কেটে ফেলেছেন! দেখছ না, দেবীর সর্বাঙ্গ বয়ে রুধির-ধারা বইছে...

হরেন বলিল—ছিন্নমস্তা দেবী...দশ-মহাবিদ্যার মূর্তি...

পুরোহিত বলিল—ইনি তোমাদের দেশের ছিন্নমস্তা দেবী নন...এ-দেবী অন্য গোত্রের। দেবীর মাথা নেই...আমরা দেবীর এ-মাথা গড়ব...সাধনার জোরে। দেবী আমাদের আদেশ দেছেন...

পুরোহিতের দু-চোখ জবাফুলের মতো রাঙা!

স্খলিত কণ্ঠে হরেন বলিল—কি আদেশ?

পুরোহিত বলিল—দেবীর আদেশ প্রতি-বৎসর পাহাড়ের ওপার থেকে একজন

করে মানুষ আসা চাই...সেই মানুষকে বলি দিতে হবে।—পাঁচশো মানুষ বলি হলে তবে আমাদের দেবী তুষ্ট হবেন। স্কন্ধে আবার তিনি মুণ্ড ধারণ করবেন! তখন ও রুধির-ধারা মিলিয়ে দেবী জ্যোৎস্নাফুল্ল প্রসন্ন মূর্তিতে বিরাজ করবেন! সেদিন তাঁর সন্তোষ হবে! তাঁর সে-সন্তোষ না হওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তার অন্ত হবে না!

কথা শুনিয়া হরেনের গায়ে রোমাঞ্চ ফুটিল!

কিন্তু মনের ভয় সবলে মনে চাপিয়া হরেন বলিল—ওপারে ব্রিটিশ-রাজত্ব—বলির জন্য ওদিক থেকে মানুষ আনলে তোমরা রক্ষা পাবে না!

পুরোহিত হাসিল...তাচ্ছিল্যের হাসি!

হাসিয়া পুরোহিত বলিল—দেবতার বলি...মানুষ আনে না! দেবতার পিপাসা জাগলে তিনি ডাকেন! তাঁর ডাক মানবে না, পৃথিবীতে এমন মানুষ আজও জন্মায়নি!

হরেন বলিল—তার মানে?

পুরোহিত বলিল—চারশ নিরানব্বই বলি হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপার থেকে বলি এসেছে—তোমাদের ঐ ব্রিটিশ-রাজত্ব থেকে। দেবতার ডাকে একজন করে মানুষ ঠিক-সময়ে নিজে থেকে এসেছে আমাদের মন্দিরে। তুমি হলে পাঁচশো-নম্বরের বলি। এ বছর তুমি এসেছ। নিজে থেকে এসেছ! আমরা তোমাকে আনতে যাইনি...কেমন?

হরেনের বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল! তাকে ইহাদের দেবতা ডাক দিয়াছে, তাই সে আসিয়াছে? এবং এ-ডাক ইহাদের এই দেবীর সামনে বলি হইবার জন্য?

চকিতে মনকে নাড়া দিয়া সে সবল করিয়া তুলিল! মনকে বলিল, না, সে আসিয়াছে, দিগ্বিজয়ে...সেকেন্দর শাহ যেমন আসিয়াছিলেন নিজের ইচ্ছায়, সেও তেমনি আসিয়াছে নিজের ইচ্ছায়! কোনো দেবতা তাকে ডাকে নাই!

হরেন বলিল—তোমাকে তোমরা বলি দেবে?

পুরোহিত বলিল—বলি দেবার আমরা কে? কেউ নই। দেবতার বলি...দেবতার ইচ্ছায় সব হয়! আমাদের দেবীর চারশ-নিরানব্বই-বারের ইতিহাস খুলে দেখতে পার।

হরেনের কি মনে হইল, দীপ নিবিবার পূর্বে যেমন তার শিখা দ্বিগুণ-তেজে জ্বলিয়া ওঠে, মনে তেমনি তেজ-দীপ্তি!

হরেন বলিল—আর-বছর কে এসেছিল আমাদের মুল্লুক থেকে তোমাদের দেবীর সামনে বলি হতে, বল দিকিনি, বাপু?

পুরোহিত বলিল—একজন মাড়োয়ারি...বৈজনাথ ধুধুরিয়া। সে এসেছিল এখানকার মধু আর মোম লুঠ করে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করতে! বোঝেনি, তার এখানে আসবার ডাক গেছে দেবতার দোর থেকে!

হরেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল—সে এসেছিল ব্যবসা করতে...তোমাদের দেবতা ডেকেছিল, এ-কথা কি করে বলছ?

পুরোহিত বলিল—দেবতা ডেকেছিল বলেই এখানে এসে ব্যবসা ফাঁদবার কথা তার মনে জেগেছিল! নাহলে তোমাদের মুল্লুকে লক্ষ লক্ষ মাড়োয়ারি আছে—কত মুল্লুকে তারা কত ব্যবসা করতে যায়...এ-মুল্লুকে কেউ আসেনি!

হরেন বলিল—তার আগের বছর কে এসেছিল?

পুরোহিত বলিল—একজন ভাটিয়া। সে এসেছিল এখানকার পাহাড় লুটতে।

হরেন ভুলিল না, দমিল না, নিবৃত্ত হইল না। কহিল, তার আগের বছর?

পুরোহিত বলিল—একটা কাবলীওয়ালা! এ-মুল্লুকের একজন ভুটানি গিয়েছিল তোমাদের মুল্লুক কলকাতা শহরে পেটের দায়ে—টাকার লোভে। কাবলীর কাছ থেকে সেখানে সে টাকা ধার করেছিল। পঁচাশি টাকা! সেই পঁচাশি টাকার জায়গায় পাঁচ বছরে পাঁচশো-পঁচাশি টাকা দিয়েও কাবলীর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। শেষে এখানে পালিয়ে আসে। কাবলীর এমন লোভ যে, এখানে তাড়া করে সে এল তার খোঁজে। বোঝেনি, শুধু-শুধু তার এ-শখ হয়নি!...খাতকের পিছনে কোন মহাজন এত পথ তাড়া করে? আহাম্মক! দেবতা তাকে ডেকেছিলেন বলির জন্য...তাই সে কাবলী এ মুল্লুকে এসেছিল।

হরেনের দু-চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিবে। তবু জোর করিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল—তার আগের বছর?

পুরোহিত বলিল—একজন সাদা রঙের সাহেব। বিলিতি সাহেব! তার বাড়ি স্কটল্যান্ডে। নাম ম্যাকার্মিক। আমাদের মুল্লুকের একজন লোককে লাথি-জুতো মেরেও তার রাগ যায়নি। আমাদের দেবতার মূর্তিকে অপমান করেছিল। ভেবেছিল, একটা খেলনা! সে-পাপে তার হাতে বাত ধরল। তবু মিথ্যা বীরত্বের গল্প ছাপিয়ে সে প্রচার করেছে...দেবতাকে তাচ্ছিল্য করতে। দেবতা তাকে ডাক দিলেন...সে এল আমাদের মুল্লুকে।

ম্যাকার্মিকের নাম শুনিয়া হরেনের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইবে! এ কাহিনি সে সদ্য শুনিয়া আসিয়াছে...রঙ্গিয়ায় প্রকাশের মামা নিরঞ্জনবাবুর কাছে। এতদূর যখন মিলিয়া গিয়াছে...এবার তবে তার পালা, সত্যই?

কিন্তু তাকে ইহাদের দেবী কেন ডাকিবেন? সে তো ইহাদের দেবতাকে তাচ্ছিল্য করে নাই। অপমান করে নাই! কোনোদিন না!

হরেন বলিল—এ-বছর আমি এসেছি তোমাদের দেবতার ডাকে?

পুরোহিত বলিল—তাই।

হরেন বলিল—কিন্তু আমি তোমাদের দেবতাকে কোনোদিন অপমান করিনি, তাচ্ছিল্য করিনি। তোমাদের দেবতা যদি সত্যকারের দেবী হন, অন্তর্যামী হন, তাহলে নিশ্চয় তিনি জানেন, আমি সকলের সব দেবতাকে সমান ভাবে মানি, ভক্তি করি।

পুরোহিত হাসিল। হাসিয়া বলিল—সে-মানা মেনে আমাদের দেবতাকে যেন কৃতার্থ করছ, তাই মানো! যেন তোমার মন খুব উদার...এই অহঙ্কার-বশে মানো! তুমি না মানলে আমাদের দেবতার কোনো ক্ষতি হবে না...যে-দেবতা, সেই দেবতাই তিনি থাকবেন! তুমি ভাবো, তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি অগাধ। সে-বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কারে তুমি অন্য জাতের দেবতাকে মানো বলে প্রচার কর। তাছাড়া তোমাদের এই অহঙ্কারে পৃথিবীতে দুঃখ-অশান্তি বাড়ছে বৈ কমছে না! বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কারে তোমরা পৃথিবীতে যে অশান্তি-বিরোধের সৃষ্টি করছ...কোনোদিন তার নিবৃত্তি হবে না!

হরেন বলিল—তুমি কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বল।

পুরোহিত বলিল—ওপারে তোমাদের জাতের মধ্যে কেউ কেউ বলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান যতদিন ছিল না, ততদিন পৃথিবীতে ছিল শান্তি আর সুখ। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে তোমরাই পৃথিবীতে এনেছ মরণ আর রাজ্যের দুঃখ-কষ্ট! এ কথা জেনেও অহঙ্কার-বশে তোমাদের জ্ঞান-চর্চার বিরাম নেই। জ্ঞান-চর্চা বেড়ে চলেছে!...এ-জ্ঞান যত বাড়ছে, তোমাদের মন তত হিংসুটে হচ্ছে...পরশ্রীকাতর হয়ে ততই তোমরা অনর্থ সৃষ্টি করছ!

হরেন ঝাঁজিয়া উঠিল; বলিল—তার মানে, তুমি বলতে চাও...

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিল—চটো না! সত্য কথা তোমরা সইতে পার না জানি। জ্ঞান-চর্চার ফলে তোমাদের মন এমন হয়েছে যে, চাটু-বাণী ছাড়া আর কোনো বাণী তোমাদের ভালো লাগে না! তোমাদের অহঙ্কার এত বাড়ছে যে, অহং-ছাড়া আর কিছু জান না...পরোপকার করতে বসেও তোমরা আগে নিজেদের লাভের হিসেব কর। তাছাড়া...

পুরোহিত চুপ করিল।

হরেন বলিল—বল, থামলে কেন?

পুরোহিত বলিল—তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বাড়বার বিষয়ে শুধু একটি কথা বলব...

হরেন বলিল—বল...

পুরোহিত বলিল—পাশের পড়শির বাড়ির ছায়া যদি তোমাদের বাড়ির উঠানে এসে পড়ে, তোমার আলো-বাতাস বন্ধ হয়েছে বলে বিরোধ জাগিয়ে তোলো...পড়শিকে মামলা-মোকদ্দমার বাণে বিদ্ধ জর্জরিত করতে ছোটো। যে-টাকা তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান-মন্ত্র...তোমাদের...সেই টাকা আদালতে ঢেলে দাও! তোমরা বল, তোমাদের হক...অপরে কেন তা তুচ্ছ করবে? আগে যখন এত বিদ্যা শেখনি, এত জ্ঞান হয়নি...—তখন এত বিরোধ, এ-সমস্ত উৎপাতও ছিল না! জ্ঞানের অহঙ্কারে দুনিয়ার অন্য-জাতকে ঘৃণা কর, অবজ্ঞা কর...এই তো তোমাদের জ্ঞানের ফল!...এ-জ্ঞানের ফলে সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য হারিয়েছ। তোমাদের মনে সব-সময়েই অসন্তোষ!

কিছুতেই আরাম পাও না। মনে দারুণ পিপাসা...সে-পিপাসা মিটতে জানে না! সে পিপাসা শুধু তোমাদের ঐ বুদ্ধির আর জ্ঞানের গরম খাঁজে...ও-খাঁজে মন তোমাদের সব-সময় মরভূমি হয়ে আছে! বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে, তাতেও মনে খুঁতখুঁতুনি...কতক্ষণে এ-জঞ্জাল চুকবে! অপরকে খুশি করতে চাও, তবু মনে অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্যের কাঁটা বিঁধে থাকে! তোমাদের মনে দারুণ কাপট্য...মনের সঙ্গে ছলনা না করে বল তো বাপু, স্বার্থ ছাড়া তোমরা আর কিছু চাও? অথচ যাদের তোমরা বলো মূর্খ, অসভ্য, তারা কাপট্য জানে না...তোমাদের মতো তারা স্বার্থপর নয়!

এ কথার উত্তরে হরেনের মুখে কোনো কথা বাহির হইল না। মন বলিতে লাগিল, কথাগুলি ঠিক নয়—তবু বেঠিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জ্ঞানের সূক্ষ্মতা যত বাড়িতেছে, বিরোধ-হিংসা সত্যই তত বাড়িতেছে! কিন্তু এ কি জ্ঞানের ফলে...?

মনের উপর যেন চিন্তার পাহাড়! হরেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল...মাথা ঘুরিয়া হরেন মূর্ছিত হইল।

দশ

মূর্ছা ভাঙিল, কিন্তু দেহে শক্তি নাই! মনের উপর যেন কিসের পর্দা পড়িয়া মনকে ঢাকিয়া দিয়াছে! হরেন কিছু বুঝিতে পারে না!

মাঝে মাঝে দু-একটা স্মৃতি...অন্ধকার আকাশে দু-চারটা মলিন নক্ষত্র...বহু চেষ্টা করিলে সে-নক্ষত্র যেমন চোখে পড়ে, তেমনি...

হরেন ভাবে, প্রকাশ...সে সঙ্গে ছিল! যেন অনেক দিন আগে! তার সঙ্গে যেন কোথায় গিয়াছিল! তারপর কবে কি করিয়া দু'জনে ছাড়াছাড়ি—সে-সব যেন কেমন আবছায়া...ভালো মনে পড়ে না!

চেতনা মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়। ক্ষণেকের জন্য। তারপর নিদ্রার নিবিড় ঘোর! চেতনা জাগিলে সে উঠিয়া বসিতে চায়। ভাবে, কি আমার হইয়াছে? মন্ত্র পড়িয়া উহারা আমার জ্ঞানবুদ্ধি হরণ করিয়া লইল নাকি?

তা কি সম্ভব?

চেতনা আবার তখনি ঘুমঘোরে মিলাইয়া মূর্ছিত হয়! মনে হয়, যেন মৃত্যু আসিয়াছে...এ জগতের কথা কেন আর ভাবিয়া মরি!

সেদিন চেতনা জাগ্রত হইলে কানে শুনিল জলদ-গম্ভীর স্বর! তোমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ কর। কে চায় তোমাদের জ্ঞান? এই জ্ঞানের ফলে মৃত্যু আনিয়াছ! জানিয়া-শুনিয়াও জ্ঞান-বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া তার ফলের উপর এখনো এত লোভ? তোমরাই

জগতে দুঃখ-কষ্ট আনিয়াছ! মানুষের সব শক্তি, সব সুখ কাড়িয়া লইয়াছ! এত জ্ঞান যখন ছিল না, তখন মানুষে-মানুষে এত বিবাদ ছিল না, বিরোধ ছিল না! জ্ঞানের সূক্ষ্ম অর্থ যত আয়ত্ত করিতেছ, ততই দাবির ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া কি দুঃখই না তোমরা বহিয়া আনিতেছ! সেই জন্যই তোমাদের জ্ঞানের দর্প আমরা চূর্ণ করিয়া দিতে চাই। যে-জ্ঞানের জন্য এত বিরোধ, এত অশান্তি, সে-জ্ঞান দূর করিয়া আমরা চাই পৃথিবীতে অজ্ঞান আনিতে...সেই সঙ্গে চিরদিনকার সেই হারানো শান্তিকে!

কোনোমতে চোখ চাহিয়া হরেন দেখিল, সেই বুড়া পুরোহিত। সে একা নয়। হরেনকে ঘিরিয়া আরো-অনেক পাহাড়ি লোক!

হরেন বলিল—আমার অসুখ করেছে?

জবাব শুনিল—না।

হরেন বলিল—আমি বেঁচে আছি?

জবাব শুনিল—আছ।

হরেন বলিল—মরণ আসছে?

জবাব—আসছে।

হরেন বলিল—যদি মার, একটু দয়া করে শীগগির তোমাদের কাজ শেষ করে নাও।

জবাব—তোমার হুকুমে কিছু করব না। দিনক্ষণ দেখে করতে হবে।

হরেন বলিল—যত ভক্তি থাকুক, জীব-বলি দিয়ে দেবতাকে তৃপ্ত করতে তোমরা পারবে না। দেবতাতে আর শয়তানে তফাৎ আছে! দেবতা চায় জীবন! শয়তানই শুধু প্রাণ নিয়ে মরণের খেলা খেলে।

উত্তরে শুনিল তীব্র ভর্ৎসনা—চুপ!

তারপর আবার তন্দ্রার ঘোর! আলো-বাতাস সব মুছিয়া গেল!

এবার জ্ঞান হইলে চোখ খুলিয়া হরেন দেখে, শুইয়া আছে। মাথার উপর নীল আকাশ।

বুঝিল, খাটিয়ায় শোয়াইয়া কারা তাকে বহন করিয়া চলিয়াছে। গা ছমছম করিল! সে তবে বাঁচিয়া নাই? মানুষ মরিয়া গেলেই এমনি করিয়া পাঁচজনে তাকে বহিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু না, সে বাঁচিয়া আছে! এই যে নিশ্বাস...চোখের উপর ঐ আকাশ! আকাশের নীচে চিরদিনের পরিচিত সেই শ্যামল বনানী...নদী-নির্ঝর...

কানে আসিয়া লাগিল ঢোল-মাদলের রব।

খাটিয়া ভূমে নামানো হইল।

হরেন দেখিল, সামনে বেদী...বেদীর উপরে দেবী-মূর্তি...সেই দেবী! মাথা নাই, মুখ নাই! ছিন্নমস্তা দেবী।

দেবীর সামনে বড় থালায় লাল ফুলের রাশ! সিন্দুর...আর ঐ খড়্গ! তার বুকের রক্ত নিমেষে হিম হইয়া গেল।

পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছে, রক্তপ্রিয়াং রক্তবর্ণাং ছিন্নমুণ্ড-বিভূষিতাম্!

হরেন ভাবিল, এমন নিশ্চেষ্ট পাথরের মতো শয়তানদের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিব? না! উঠিতে গেল...পারিল না।

হাত-পা বাঁধা...দেহকে খাটিয়ার সঙ্গে লোহার শিকল দিয়া ইহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

সামনে আবার চাহিল...স্তূপাকার কাঠ। সে-কাঠে ঘৃত ঢালিয়া ঐ আগুন জ্বালিয়া দিল। দীর্ঘ লেলিহান আগুনের শিখা!

আগুনের আঁচ গায়ে লাগে—দেহ ঝলসিয়া যায়!

সে আর পারে না! পাগলের কৌতূহল লইয়া যেমন অজানা পথে বাহির হইয়াছিল, কাহারো পরামর্শ লয় নাই...

মন ভর্ৎসনা করিল, খেয়ালের ঘোরে একটা জন্ম নষ্ট করিলে! পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান—তার কতটুকু জান বাপু? সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছ! মন তোমার ছোট একটি মধুপর্কের বাটি! ওটুকু মন জগতের জ্ঞান-সমুদ্রের বারিতে ভরিয়া তুলিবে? ওরে মূর্খ, ওরে উন্মাদ, তা কি হয়?

হা-হা-হা অট্টরব...সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর হুড়মুড় করিয়া আকাশ ভাঙিয়া পড়িল! আকাশের বুকে বাজ...বিদ্যুৎ...বিদ্যুতের শাণিত খাঁড়া!

অসহ্য যাতনা...

হরেন ডাকিল—মাগো—

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা বাহির হইয়া গেল!

তারপর মেঘ-লোক...ছোট-বড়, লাল-কালো, সাদা-পাঁশুটে মেঘের পর মেঘ...সেই মেঘের স্তর ভেদ করিয়া হরেন্ চলিয়াছে...চলিয়াছে...চলিয়াছে...! চোখে কিছু দেখা যায় না...শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী! ধোঁয়া ছাড়া ত্রিভুবনে আর কিছু নাই!...

সঙ্গে সঙ্গে দূরে যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ...সেই সঙ্গে কারা ঐ কথা কহিতেছে...

১। বুনোদের মধ্যে দশজন গ্রেফতার।

২। এমনি করে মানুষ মারে! ডিটেকটিভ-পুলিশের চেষ্টা এতদিনে সফল হল!

৩। এ ছেলেটি যখন ভুটিয়া টাট্টু নিয়ে এ-পথে আসছে দেখেছি, তখনি বুঝেছি, একে চার করে এদিককার রুই-কাৎলা গাঁথব!

৪। ভাগ্যে ভুটানি সেজে আগে থেকে বস্তিতে ছিলুম! হা-হা...ত্র্যম্বক, হার্দে আর

জরদ...ভুটানিরা ভেবেছিল, আমরা ভুটানি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডিটেকটিভ-পুলিশ ছদ্মবেশে কি না সাজতে পারে! হাঃ-হাঃ-হাঃ...

চোখ খুলিতে হরেনের সাহস হইল না...চোখ খুলিলে যদি দেখে, যমালয়ে আসিয়াছে!

ডিটেকটিভ-ব্যাপারটা স্বপ্ন?...

সে চোখ বুঝিল...ঘুমের ঘোরে দু-চোখ জড়াইয়া আছে!

কানের কাছে যেন মেঘ ডাকিল...ঘন-গম্ভীর ডমরু-নাদের মতো! সে-মেঘ-গর্জনের সঙ্গে তালে-তালে ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ...অনেকগুলি ঘোড়া!

হরেন চোখ খুলিল...দেখে, ঘোড়ার পিঠে-চড়া আর সেই শর্ট-শার্ট-পরা মূর্তি...একজন নয়, দু'জন নয়, ত্রিশজন...চল্লিশজন! ঘোড়ায় চড়িয়া তীরের বেগে এই দিকে আসিতেছে! তাদের হাতে বন্দুক...বন্দুকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি...ঐ ধুরুম-ধুম শব্দ...

কানে শুনিল ত্র্যম্বকের স্বর—পুলিশ...পুলিশ!

নিশ্চেতনতার পাথর যেন খসিয়া গেল! হরেন উঠিয়া বসিল। ভুটানিদের দলে দারুণ চাঞ্চল্য...

বন্দুকে ঘন-ঘন গুলি ছুটিতেছে...ভুটানিরা ধপাধপ পড়িয়া যাইতেছে...ঐ সব পালায়।

পুরোহিত পলাইল না...হরেনের কাছে আসিল...হুঙ্কার রবে ডাকিল—মায়েজি...

কি বিকট সে ডাক...

তারপর—

হরেন...হরেন...

কে ডাকে?

মর্ত্যের ডিটেকটিভ-পুলিশ? না, হরেন স্বর্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

হরেন চোখ খুলিল।

চোখ চাহিয়া দেখে, ঘরে এক-ঘর লোক...মামাবাবু, মামীমা, প্রকাশ, সনাতন...আরও অনেক লোক...হরেন সকলকে চেনে না।

প্রকাশ ডাকিল—হরেন...

মামাবাবু ডাকিলেন—হরেন...

মামীমা ডাকিলেন—বাবা হরেন...

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন ভালো করিয়া চাহিল। চোখে বিস্ময়ের রাশি!

ভাবিতেছিল, ও-মুল্লুকের দেবতা বলি লইয়া আবার তাকে এ-মুল্লুকে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে? না, ডিটেকটিভ-পুলিশ তাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে?

প্রকাশ বলিল—ও-রকম করে চেয়ে কি দেখছ?

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—খুব ভয় পেয়েছিলে?

মামীমা বলিলেন—ভয় নেই। ভোর হয়েছে, বাবা।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরে পাখির কণ্ঠে প্রভাতী কূজন...দুঃস্বপ্নের ছায়া ভোরের আলোয় মিলাইয়া যাইতেছিল...

হরেন ডাকিল—মামাবাবু...

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—একটু ভালো বোধ করছ?

হরেন বলিল—হ্যাঁ অসুখ নয়। স্বপ্ন দেখছিলুম।

মামীমা বলিলেন—দুঃস্বপ্ন!

প্রকাশ বলিল—ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন! সে-দুঃস্বপ্নের ঘোরে খাট থেকে মেঝেয়...বাপ, যে করে পড়েছ! সঙ্গে সঙ্গে কি চিৎকার...

একে একে হরেনের মনে পড়িতেছিল ত্র্যম্বক, পুরোহিত...সেই বিপর্যয়-রকমের সব পাহাড়ি লোক...সেকন্দর, চেঙ্গিজ খান, নেপোলিয়নের মতো পাহাড়-পথে তার সেই দিগ্বিজয় যাত্রা...ডিটেকটিভ-পুলিশ...

হরেন বলিল—ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে গিয়েছিলুম..ভুটানি টাট্টু চড়ে। দেবী আমাকে ডেকেছিলেন...সে-ডাক মানুষ এড়াতে পারে না।

মামীমা বুঝিয়া লইলেন, বলিলেন—সনাতন তোমাদের গল্প বলেছে, বুঝি? কতদিন বলেছি, এ-বয়সের ছেলেদের ও-সব গল্প শুনিয়ো না।

নিরঞ্জনবাবু বলিলেন—আমার অন্যায়। ভূতের গল্প তুচ্ছ করা যায়! কিন্তু দেবতার গল্প...সত্যি, নরম-মনে বিপর্যয় ব্যাপার বাধিয়ে তোলে!

প্রকাশ বলিল—তার উপর হরেনের মনে বড়-বেশি অহঙ্কার। বলে, ও যেমন ফিলজফি বোঝে, এমন আর-কেউ বোঝে না!

হরেন বলিল—তাতে দুঃখ নেই।...স্বপ্ন যা দেখেছি, রীতিমতো উপন্যাস!

প্রকাশ বলিল—খেয়ে-দেয়ে লিখে ফ্যালো...আমি খাতা বেঁধে দেব!

হরেন বলিল—তামাশা নয়, সত্যি! ছেপে বার করলে সে-বই ঝড়াঝড় বিক্রি হবে।

তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক



শ্রী অখিল নিয়োগী



.....মোহান্ত জোরে-জোরে সংকেত ঘন্টার দড়ি টান্‌তে লাগলো....



লোকটা খুন করবে নাকি?....

তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

এক

মুক্তোর সন্ধান

কথা হচ্ছিল শিবপুর বোটানিক্যাল-গার্ডেনে বসে।

কথা হচ্ছিল চার বন্ধুতে।...বড়লোকের ছেলে—খাওয়া-পরার ভাবনা নেই; সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ সিনেমা, কাল বেলুড়, পরশু বোটানিক্যাল করে বেড়াচ্ছে। অবসর এখন ওদের যথেষ্ট।

ইস্কুলের সব-নিচু ক্লাস থেকে কলেজের শেষ-সোপান পর্যন্ত বরাবর ওরা হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে চলে এসেছে—প্রথম-শ্রেণির বৃত্তি নিয়ে। তাই ইস্কুল থেকে ওদের আসল নাম তলিয়ে গিয়ে, ছেলেদের কাছে ওরা নতুন নামে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। আজ শুধু পাড়ায় নয়, বাড়িতেও ওদের ওই নামেই ডাকে—চুনি, পান্না, মণি, মুক্তো।

পান্না সেদিনকার কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললে, হ্যাঁরে, অজ্ঞাতবাস করার দিন কি এখনও আছে?

মণি ফোড়ন দিলে, কৌরবের কাছে প্রতিশ্রুতি যখন এযুগে অচল, তখন অজ্ঞাতবাসের কী কারণ থাকতে পারে!

চুনি বললে, কিন্তু আধুনিক-কৌরব—কাবলিওলার হাত থেকে রেহাই পেতে যদি কেউ গা-ঢাকা দেয় তবে তোমরা তাকে কোনোমতেই দোষ দিতে পার না।

মুক্তো এতক্ষণ ঘাসের ওপর সটান হয়ে শুয়ে বিলিতি-গল্পের বই পড়ছিল। এত বড় একটা হাসির খোরাক পেয়ে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, তারপর গলা সাফ করে বললে, কিন্তু, আধুনিক-কৌরব এই কাবলিওলাটি কে, আর নির্যাতিত ও পলায়িত পাণ্ডুই-বা কে, সে কথা ব্যক্ত কর।

চুনি বলল, কিন্তু তুই তো বিলিতি-গল্পে মশগুল হয়ে আছিস। দেশি-খবর কি অতটা ঝাঁজাল হবে?

মুক্তো জবাব দিলে, বিলিতি-গল্পে বিলিতি এসেন্সের মতো একটা ঝাঁজ আছে সত্যি, কিন্তু সেখানে খাঁটি মাটির সম্বন্ধ খুব কম। তার চেয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে নীল আকাশে তারার মেলা দেখার আনন্দে মন বেশি উতল হয়ে ওঠে।

পান্না বললে, তাহলে আসল কথা হচ্ছে এই যে, সাময়িকভাবে তুমি তোমার বিলিতি-গল্পের রাশ টেনে রেখে, একটি অতি তুচ্ছ দেশি-খবরে নিজের মনকে আনন্দ দিতে চাও!

মন্দ কী! মুখ বদলানো তো যাবে। বলে মুক্তো অলসভাবে বিলিতি-গল্পের বইটা বন্ধ করল।

পান্না কাগজ খুলে একটা জায়গা পড়তে লাগল ঃ

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত বনকুসুমপুরের বৃদ্ধ-জমিদার, বাবু তারিণীচরণ লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে নিজ গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। শেষ-বয়সে তিনি বিশেষ ধর্মপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সারাজীবন তাঁহার অর্থের খুব স্পৃহা ছিল বটে, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে তিনি বহু দান-ধ্যানে ব্যাপৃত ছিলেন। অনুমান হয় যে, গার্হস্থ্য-জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। তিনি কোনো উইল করিয়া যান নাই।"

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ। কিন্তু মুক্তোর মুখ দেখে মনে হল, খবরটার ভেতর দিয়ে সে অনেক-কিছু দেখতে পাচ্ছে।

কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে পান্না জিগ্যেস করলে, কি হে মুক্তো! তোমার বিলিতি-গল্পের চেয়ে এই একটুকরো বাজে-খবরের ভেতর কি বেশি মুক্তোর সন্ধান পেলে নাকি?

মুক্তো বললে, খবরটা যে বাজে, সে কথাই বা তোমাকে কে বললে! যে কোনো একটা সামান্য-সংবাদের পেছনে একটা বিরাট বিস্ময় লুকিয়ে থাকতে পারে। মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার যে কোনদিক দিয়ে পূর্ণ হয় সে-কথা কেউ আজ পর্যন্ত ছক কেটে বলতে পারেনি।

চুনি মাথা নেড়ে বললে, সে-কথা সত্যি।

মণি মাথা চুলকে বললে, তোমাদের দুজনের কথাই শুনলাম। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও ঠিক করতে পাচ্ছি না যে, বিশেষ করে এই খবরটার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে। লোকটি বড়লোক—সারাজীবন খুব সুখভোগ করেছেন আর টাকার স্পৃহাও তাঁর ছিল। শেষ বয়সে তাঁর একটা বৈরাগ্য আসা স্বাভাবিক। কেননা, খবরেই রয়েছে যে, ইদানীং তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশতেন। কাজেই একদিন 'ধুত্তোর' বলে সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নয়।

মুক্তো বললে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, শেষ-বয়সে দান-ধ্যান করা যাঁর স্বভাব হয়ে উঠল তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি কোনো সৎকাজে ব্যয় না করে এমন চোরের মতো গা-ঢাকা দিলেন কেন?

সবাই চমকে উঠল। মুক্তো বলেছে ঠিক। মুক্তো যখন যে-কথা বলে, অনেক ভেবে-চিন্তে বলে। তাই বন্ধুর দলে কেউ কখনো তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না।

মণি বললে, তাইতো! এ কথাটা তো একবারও আমার মাথায় আসেনি! এত বড় সম্পত্তির ওয়ারিশান যখন কেউ নেই, তখন বৃদ্ধ জমিদারের উচিত ছিল দান-ধ্যান অথবা ভালোরকম একটা সৎকাজের ব্যবস্থা করে যাওয়া। আচ্ছা ভাই মুক্তো, তোমার কি মনে হয় এর ভেতর—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুক্তো জবাব দিলে, শুধু মনে হয় না, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এর ভেতর গোলমাল কিছু আছেই। জমিদারের তিন-কুলে কেউ ছিল না—কাজেই তাঁর কাজে বাধা দেবারও কেউ নেই। তিনি যদি সংসার ছেড়ে যেতে চান তো গোপনে যাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। আর, সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, সম্পত্তির কোনো বিলি-ব্যবস্থাই তিনি করে যাননি। তিনি যদি ইদানিং সাধু-সন্ন্যাসীদেরই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাহলে সংসার ছেড়ে যাবার আগে তাঁদের জন্যেও অনেক কিছু করে যেতে পারতেন। সেখানেও একটা খটকা থেকে যায় না কি?

আলোচনাটা যেন কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বললে না। তারপর হঠাৎ চুনি বললে, তাহলে আমাদের আলোচনায় কি সাব্যস্ত হল?

মুক্তো উদাসভাবে শুধু একবার আকাশের দিকে চাইলে। তারপর অতি সাধারণভাবে বললে, বোধহয়, কালই আমি বনকুসুমপুর রওনা হচ্ছি।

হঠাৎ সেখানে প্যারাসুটধারী নাৎসি-সৈন্য দেখলেও এরা এত অবাক হত না—যতটা বিস্মিত হল মুক্তোর মুখের ওই ছোট্ট কথাটি শুনে।

মুক্তোর কথাটাকে কোনোরকমে হেসে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না! কেননা, মুক্তো কথা বলে কম, কিন্তু যখন যেটা বলে সেটা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে। কাজেই সে যে নিছক রসিকতা করেছে, এ কথাও বলা মুশকিল।

তবু জিনিসটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেননা, বোটানিক্যাল গার্ডেনে বসে তরুণ যুবক যদি খামোকা কলকাতার আমোদ ছেড়ে হঠাৎ গণ্ডগ্রামে যেতে রাজি হয়, তবে সেটাকে ফস করে সত্যি বলে ধরে নেওয়া সত্যিই মুশকিল।

পান্না বললে, হ্যাঁরে? এ কি তুই সত্যিই বলছিস—না একটা পাগলামোই শুরু করবি?

মুক্তো বললে, দেখ, পনের-মিনিট আগেও আমার মাথায় এরকম কোনো খেয়াল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ খবরটা দেখে ভাবলাম, পড়াশুনোর পাট তো একরকম শেষ। বাড়িতে বসে শুধু পৈতৃক-অন্ন ধ্বংস করার বেশি তো আর কোনো কাজ নেই।

দেখাই যাক না একবার বনকুসুমপুরে গিয়ে। এর পেছনে একসঙ্গে আছে অ্যাডভেঞ্চার, অভিজ্ঞতালাভ আর সময় কাটাবার মস্ত-বড় একটা সুযোগ।

চুনি বললে, কিন্তু সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে তোর না আছে কারুর সঙ্গে জানা-শোনা; —কোনো দুষ্টু-লোকের পাল্লায় গিয়ে বিপদে পড়িস যদি?

বিপদের মধ্যে শিক্ষা আছে বলেই তো মনকে এমন দুর্নিবার আকর্ষণে টানে! ...মুক্তো জবাব দিলে।

এইবার উৎসাহিত হয়ে উঠল মণি। বললে, যেতে যদি হয় তো তুই একা যাবি কেন? আমরা তিনজন কি—মরে গেছি?

কথাটা শুনে তিন বন্ধুতেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল—তাই তো! বনকুসুমপুরে গিয়ে মুক্তো একা বাহাদুরি নিয়ে আসবে, কাগজে-কাগজে তার রিপোর্ট বেরুবে, ছবি ছাপা হবে, আর আমরা কলকাতা শহরে ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়ে বসে থাকব—এতখানি বোকা আমরা নই। সত্যি যদি যেতে হয় তো সবাই মিলে সিদ্ধিদাতা গণেশ বলে রওনা হয়ে পড়ি চল।

চুনি বললে, আচ্ছা, আমরা না হয় বনকুসুমপুরেই রওনা হলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের কিভাবে এগুতে হবে তার ব্যাখ্যা আমরা মুক্তোর মুখ থেকে পরিষ্কার শুনতে চাই।

চুনির কথা শুনে মুক্তো বললে, নিশ্চয় বলব—শোনো।

সেখানে আমাদের যেতে হবে খুব সঙ্গোপনে। কারণ, আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি, মৃত-জমিদার তারিণীচরণ লাহিড়ীর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সেখানে গিয়ে প্রথমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, সেই বিশাল জমিদারির কোনো উত্তরাধিকারী আছেন কিনা। যদি না থাকেন, তবে দেখতে হবে সেই জমিদারির মধ্যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয়পাত্র কে ছিলেন। এসব তথ্য আমাদের গোপনে সংগ্রহ করতে হবে।

পান্না বললে, গোপনে—মানে?

মুক্তো জবাব দিলে, এমনভাবে গিয়ে সেখানে থাকতে হবে যে, কেউ যেন আমাদের সন্দেহ না করে। কারণ, যদিও আমরা সত্য আবিষ্কার করতে যাচ্ছি, তবুও আমাদের ওখানে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে পারলে শত্রুর অভাব হবে না। কাজেই 'গোপনে' কথার খাঁটি অর্থ হল—ছদ্মবেশে। এখন কথা উঠতে পারে, ছদ্মবেশে একটা অজানা-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কিভাবে আত্মগোপন করে থাকা যায়। সে-বিষয়টাও আমি এরই মধ্যে ভেবে নিয়েছি। আমরা কলেজের ক্লাব থেকে 'ল্যান-সিয়ারের' মেক-আপ কিট একটি জোগাড় করে নেব, ঐসঙ্গে কিছু ক্রেপ-হেয়ার আর স্পিরিট-গাম। এখন বুঝতে পারছিস যে, এরপর আমরা স্টেশনে কুলি হয়ে থাকতে পারি, ফেরিওলা হয়ে সস্তায় শখের জিনিস ফেরি করবার ফাঁকে আসল-খবরের সন্ধান করতে পারি—হয়তো বা

দরকারমতো কোনো-কোনো বাড়িতে চাকর হিসাবে ঢুকেও আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

মুক্তো মেক-আপ বিষয়ে ছিল পাকা ওস্তাদ। থিয়েটারে তার মেক-আপের সুখ্যাতি কলেজ মহলে ছেলেদের মুখে-মুখে ফিরত।

মণি একটু ভেবে হাসতে-হাসতে বললে, তাহলে ব্যাপারটাকে ষোলো আনা গোয়েন্দাগিরি বলতে হয়।

মুক্তো মুচকি-হেসে জবাব দিলে, একে যদি তোমরা বল গোয়েন্দাগিরি আমি এর নাম দেব—শিক্ষার অভিযান। ইংরেজিতে তোমরা যদি এর নাম রিসার্চ দাও—তাহলেও আমি আপত্তি করব না। পি-এইচ. ডি. উপাধি নিতে হলে, তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়। আমাদের এ-অনুসন্ধান হবে তার চেয়েও রোমাঞ্চকর—ততোধিক শিক্ষামূলক আর সেইসঙ্গে ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক।

সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'হিয়ার—হিয়ার!'

চুনি জিগ্যেস করলে, আচ্ছা, নিরুদ্দিষ্ট-লোকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে, আমরাও কি নিরুদ্দেশ-যাত্রা করব—না, বাড়িতে জানিয়ে-শুনিয়েই যাব?

মুক্তো বললে, একেবারে না বলে উধাও হয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে। তাতে আমাদের পেছনেও আবার গোয়েন্দা লাগতে পারে। আমরা বাড়িতে বলে যাব, চার বন্ধুতে দেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। এতে আপত্তির কোনো কারণই থাকতে পারে না।

মণি বললে, তাহলে পাকা কথা এই দাঁড়াল যে, আসছে-কাল আমাদের চুনি-পান্না-মণি-মুক্তোর দল সাড়ম্বরে অভিযানে বেরুচ্ছে।

মুক্তো অনাড়ম্বরেই বললে, 'সাড়ম্বরে' কথাটায় আমার আপত্তি আছে। যেতে হবে আমাদের একরকম গোপনেই। নইলে খবর পেয়ে আমাদের বন্ধুমহল যদি স্টেশনে এসে ভিড় করে, তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলেই মনে হয়। সুতরাং বন্ধুগণ, ধীরে...অতি ধীরে কর মৃদু-পদক্ষেপ!

বাকি তিনজন স্মিতহাস্যে জবাব দিল—তথাস্তু।

দুই

শেয়ালদা-স্টেশন থেকে একখানা ট্রেন ছাড়বার আর বেশি দেরি নেই। মানুষের ভিড়, ফেরিওয়ালার চিৎকার, কৌতূহলী-লোকদের অনাবশ্যক-আনাগোনায় সারা প্ল্যাটফর্মটা সরগরম হয়ে উঠেছে।

সেই ভিড় ঠেলে ছোট্ট একটা তৃতীয় শ্রেণির কামরার দিকে দু-জন লোককে আসতে দেখা গেল। একজন ফেরিওয়ালা, সস্তায় খেলনা আর শৌখিন-জিনিস বিক্রি

করাই তার পেশা, হয়তো মফস্বলের কোনো জায়গায় ছোট-খাটো ব্যবসা ফেঁদেছে, মাল ফুরিয়ে যেতে কলকাতায় এসেছিল সওদা করতে। আর-একটিকে দেখে মনে হয়, মেদিনীপুর অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির লোক। কলকাতায় এক শ্রেণির লোকে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করে খানসামা-শ্রেণির গৌরব বৃদ্ধি করে।

দুজনে পর-পর এসে সেই কামরাতে ঢুকল।

যখন দেখা গেল, কামরার ভেতর এবং কামরার বাইরে প্ল্যাটফর্মে বিশেষ আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, তখন চুনি জিগ্যেস করলে, কি রে পান্না, মূল-গায়েনের যে দেখা নেই!

পান্না বললে, কে জানে, ও হয়তো কাবলিওলা সেজেই আসছে! 'মেক-আপ' করতে গিয়ে গাড়ি না ছেড়ে দেয়!

ওরা দুজনে যখন তৃতীয় শ্রেণির কামরায় বসে চুপি-চুপি কথাবার্তা কইছিল, সেই সময় প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার ফটকে দুটি লোকের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

এক ভদ্রলোকের পরনে দারোগার পোশাক, চেহারাটা জাঁদরেল-গোছের আর মেজাজটাও ভারিক্কি।...আচমকা মাথা ঠুকে যেতে মুখ ফিরিয়ে দারোগা-সাহেব বললেন, কোথাকার উজবুক...

তারপর হঠাৎ সেই লোকটির হাতখানা ধরে ফেলে বললেন, একি! আমাদের কলেজের মুক্তো, না? উড়ে ঠাকুর সেজে সিনেমায় প্লে করতে চলেছিস নাকি?

মুক্তো প্রথমটা খুব হকচকিয়ে গিয়েছিল—ফেললে বুঝি ধরে!...না, গজেন, ও পড়েছে ওদের সঙ্গে, এখন কোথায় যেন দারোগাগিরি করে।

মুক্তো ওর কথায় জবাব দিলে না, শুধু ঠোঁটের ওপর তর্জনীটা রেখে ওকে চুপ করতে অনুরোধ করলে।

প্ল্যাটফর্মের একটু ফাঁকা-জায়গায় চলতে-চলতে গজেন জিগ্যেস করলে, হ্যাঁরে মুক্তো, ব্যাপারটা কি খুলে বল তো! চলেছিস কোথায়?

মুক্তো প্রথমে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলে। বললে, একটা নতুন সিনেমা-কোম্পানি খুলেছি আমরা। প্রথমটা কমিক বই নিয়েই শুরু করা গেল। চুনি, পান্না—ওরাও যাচ্ছে। আজই শুটিং শুরু হবে কিনা—

চুনি-পান্নাও যাচ্ছে? গজেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।...কিন্তু তোরা বোধ করি সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছিস? আমার কিন্তু তা নয়। ফোর্থ-ক্লাসের ব্যবস্থা নেই বলেই থার্ড-ক্লাসের টিকিট কিনি।

মুক্তো জিগ্যেস করলে এখন তুই কোথায় আছিস, গজেন?

গজেন পান চিবুতে-চিবুতে জবাব দিলে, গিয়েছি সেই ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর। নদীয়ার ভেতর বনকুসুমপুর বলে একটা জায়গা—আমি সেই থানারই চার্জে আছি।

গজেনের মুখের কথা শুনে মুন্তো প্রথমটা ভারী ভয় পেয়ে গেল। আর-কেউ নয়, স্বয়ং থানার দারোগা—দিলে বুঝি সব ভেস্তে!

তারপর হঠাৎ তার মনে হল, দারোগা হাতে থাকলে খোঁজখবরের অনেক সুবিধে হবে। তাই গোড়াতেই কোনো কথা না ভেঙে বললে, আরে ভাই, আমরাও সেকেন্ড-ক্লাসের যাত্রী নই। ও-বিষয়ে আমরা মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত। চল না, একসঙ্গেই বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

গজেন যেন হাতের ভেতর আকাশের চাঁদ খুঁজে পেলে। পৃথিবীতে এক শ্রেণির লোক থাকে, যারা আশপাশের সঙ্গীদের সঙ্গে সারাক্ষণ বকতে না পেলে একদণ্ডও তিষ্ঠুতে পারে না। গজেন সেই দলের লোক। কলেজে অতি বেশি কথা বলতো বলে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ওকে বাচালের পার্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্টেজে উঠে সেই 'বাচাল' একেবারে 'মৌনীবাবা' হয়ে গেল। সে-সব কথা মনে হলে এখন হাসি পায়।

ওরা দুজনে কামরাতে ওঠবার একটু পরেই ঢং-ঢং করে গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল।

মুন্তো চারদিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, এ কি। মণিটা এখনও এসে পৌঁছয়নি?

চুনি বললে, মণি বোধহয় আসবার মুখে ভয় পেয়ে গিয়েছে! আজ সকালেও আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু—

গজেন বললে, তাহলে তার পার্টটা কে করবে?

ওর কথা শুনে কিছু বুঝতে না-পেরে এরা পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ওদের দুজনের রকম-সকম দেখে মুন্তো হো-হো করে হেসে উঠল।

চুনি, পান্না জানে না যে, এর ভেতর গজেন হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুটল, আর গজেনও জানে না, ওদের তিনজনের আসল ব্যাপারটা কী! মুন্তো একা সব জিনিসটা উপভোগ করে প্রাণভরে খুব একচোট হেসে নিলে।

গজেনকে যখন আস্তে আস্তে সব খবরই খুলে বলা হল, তখন সে একেবারে থ হয়ে গেল। বললে, এই সামান্য কারণে তোরা আবার দল-বেঁধে গোয়েন্দাগিরি করতে চলেছিস? আমি ভাবলাম, ভালোই হল তোরা সিনেমা-কোম্পানি খুলছিস! মাঝে-মাঝে যখন কলকাতায় আসব, বিনা-পয়সায় বায়স্কোপ দেখা হবে—আরে, ছ্যা!

মুন্তো তার পিঠ চাপড়ে বললে, আমরা সিনেমা-কোম্পানি না খুললেও তোকে বিনি-পয়সায় খুব সিনেমা দেখাতে পারব। কিন্তু এখন সে-কথা নয়। ভাগ্যক্রমে তুই যখন ওখানকার থানার চার্জেই আছিস, তখন ঐ ভদ্রলোকের সম্পর্কে আগে-থেকেই আমরা অনেক-কিছু শুনতে পাব আশা কচ্ছি।

গজেন কথাটাকে মোটেই আমোলে না-এনে, মাথা দুলিয়ে বললে, আরে, লোকটা ছিল ভারী কৃপণ। সারাজীবনে অনেক টাকাও জমিয়েছিল। শেষ বয়সে একটা ধর্মের ভাব এসেছিল বটে, তবে আমার মনে হয় ওটা নিছক বাইরের 'শো'। এটা আমরা কিছুতেই ঠিক করতে পাচ্ছি না যে, যে-লোকটার অর্থের প্রতি এত মমতা, সে এমন হুট করে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হল কেন?

গজেনের কথা শুনে মুক্তো তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগল। কারণ, এই ধরনের কথাই সে শুনতে চায়। মৃত-তারিণীচরণ যে ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেনি, এইটেই মুক্তোর মনের কথা।

ওদের চুপ করে থাকতে দেখে গজেন মনে করলে যে, গোয়েন্দাগিরি করবার শখ তার এক-কথাতেই ধুলোয় লুটিয়েছে। তাই সবাইকে একটু খুশি করবার জন্যে বলল, বেশ তো। তোরা বেড়াতে বেরিয়েছিস, খুব ভালো কথা। চিরটা দিন তো কলকাতাতেই কাটালি, বাংলাদেশের গ্রামগুলো কেমন তাও তো একবার দেখতে হয়! চল, আমার ওখানে ক-দিন ফুর্তি করে কাটিয়ে আসবি। দুধ-মাছ তো প্রচুর পাওয়া যায়ই, তার-ওপর বিস্তর পাখি—আমার বন্দুক আছে, যত খুশি শিকার করে বেড়াবি।

পান্না মাথা দুলিয়ে বললে, না-না, ও-ব্যাপারে আমরা একেবারে অহিংস। গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু 'রবার্ট ব্লেক' কিংবা 'স্মিথ'কে আমাদের ত্রিসীমানায়ও দেখতে পাবে না—গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি তো অনেক দূরের কথা।

গজেন শুধু একবার গর্বের হাসি হেসে বললে, হুঁ!

মুক্তো এতক্ষণ ওদের কথা-কাটাকাটি উপভোগ কচ্ছিল; এইবার দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বললে, বাজে কথা এখন থাক। আমি গজেনকে কয়েকটা কথা বলতে চাই—

গজেন চলন্ত-ট্রেনের জানলায় মাথাটা রেখে চোখ বুঁজে জবাব দিলে, স্বচ্ছন্দে।

মুক্তো বললে, আমরা তোমার ওখানে গিয়েই উঠব, কিন্তু এক শর্তে।

শর্তটা কি, শুনি? গজেনের চোখে-মুখে ব্যগ্র-কৌতূহল ফুটে উঠল—অহিংস তোরা? তাহলে নিরামিষ খাওয়া ধরেছিস নাকি?

মুক্তো বললে, না-না, সে-সব কিছু নয়। আমাদের প্রকৃত পরিচয় তুই কাউকে দিতে পারবি না। আমরা যে-বেশে চলেছি, সেই বেশে গিয়েই তোর বাসায় উঠব এবং সেই অবস্থাতেই থাকব।

গজেন একবার গোঁফটা পাকিয়ে নিয়ে জবাব দিলে, মানে, শখের গোয়েন্দাগিরিটা তোমরা কিছুতেই ছাড়তে চাও না—কেমন?

মুচকি-হেসে মুক্তো জবাব দিলে, তোমরা একে বলছ গোয়েন্দাগিরি, আর আমরা বলছি—অভিজ্ঞতা লাভ।

গজেন হো-হো করে হেসে উঠল। যেন খুব রসিকতা কচ্ছে এইভাবে জবাব

দিলে, হ্যাঁ, দারোগাগিরি করে ওসব আমাদের জানা আছে। বড়লোকের টাকা থাকলে তারা হয় বেড়ালের বিয়ের আয়োজন করে, আর না-হয় করে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—

পান্না তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কিন্তু আমাদের এটা বেড়ালের বিয়েও নয়, আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধও নয়। অবশ্য এখানে কিছুদিন থাকলে তারিণীবাবুর শ্রাদ্ধটা হয়তো দেখতে পেতে পারি—

চুনি ব্যঙ্গস্বরে বললে, কিন্তু নেমন্তন্নর আশা মোটেই কোরো না বন্ধু! কারণ, উড়ে-বামুন, ফেরিওলা আর মেদিনীপুরের চাকরকে কেউ লুচি-মণ্ডা খাওয়াতে আসবে না এ-কথা খুবই সত্যি।

গজেন আর একবার হো-হো করে হেসে উঠে বললে, কিন্তু দারোগাবাবুর বাড়িতে লুচি-পাঁটা, দই-সন্দেশ, মেঠাই-মণ্ডা—কোনোটারই অভাব হবে না। এ ছাড়াও যদি তোমরা ঐ কিপটে বামুনটার শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে চাও, তবে তাতেও বাদ পড়বে না। কারণ, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আজ কালকার দিনে সৎব্রাহ্মণ ভোজন করাবার সময় লোকে দারোগা-বাড়িতেই আগে ভোজের খাবার পাঠিয়ে থাকে।

মুক্তো বললে, বেশ! বেশ! এই ছদ্মবেশে আমরা তোমার বাড়িতেই থাকব। আমরা পুলিশের কোনো সাহায্য চাই না, শুধু খোঁজখবর নিতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ে নাকাল না হই বন্ধু, এই সুবিধেটুকু তোমায় করে দিতে হবে।

গজেন গোঁফে তা দিয়ে বললে, যথা আজ্ঞা...

যথাসময়ে দারোগাবাবু—উড়ে ঠাকুর, মেদিনীপুরের চাকর আর ফেরিওলাকে নিয়ে থানার পাশে নিজের কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হলেন।

দিনের বেলা আর কোনো কথা হল না। গভীর রাত্রে চার বন্ধুর গোপন-পরামর্শ সভা বসল।

গজেন বললে, তোমরা আমার এই ভাঙা-বাড়িতে এসেছ সে আমার পরম ভাগ্য; কিন্তু তোমাদের যদি উপযুক্ত সম্মান দিতে না পারি তবে সেটা আমার পক্ষে কতটা মর্মান্তিক হবে সেটা আশা করি বেশ বুঝতে পাচ্ছ?

মুক্তো বললে, দেখ গজেন, বিনয়ের অবতার হয়ে তোমাকে—সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার মতো বক্তৃতা আওড়াতে হবে না। আমরা চাকর-সেজে থাকি আর ঠাকুর-সেজেই আসি, পেট না ভরলে কিছুতেই থানা ছেড়ে উঠছি না, আর তোমার দেওয়া রাজভোগেও কিছুমাত্র আপত্তি জানাচ্ছি না। কলেজ-ইউনিয়নে একসঙ্গে প্লে করতাম—কেউ হত রাজা, কেউ সাজতো চাকর, তাতে যদি বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়ে থাকে তবে আজও হবার কথা নয়। জীবনে আমরা যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এসেছি, সে-কাজে যদি তুমি আমাদের সাহায্য কর, তাতেই আমরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হব।

গজেন হো-হো করে হেসে উঠে বললে, সভাপতির অভিভাষণে তুমি আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ বন্ধু! যাক, এই দুপুর-রাতে কী তোমার বক্তব্য চটপট শেষ করে ফ্যালো। জানো তো আমি মোটা লোক, তাই ঘুমটা আমার একটু বেশি।

মুক্তো বললে, ঘুমটা যে তোমার বেশি তা দেহের অনুপাতে ছোট চোখ দেখেই অনুমান কর্‌তে পারা যায়। থাক, শোনো—আজ দিনের বেলায় চাকর-ঠাকুরদের সঙ্গে মিশে জানতে পেরেছি যে, তারিণীবাবুর সদর-নায়েব হলধরবাবুর বাসার ঠাকুর-চাকর একসঙ্গে দেশে চলে গেছে। ওঁরা নাকি তাতে একটু বিব্রতই আছেন। আমার অনুরোধ, কাল সকালেই তোমার একজন জমাদার দিয়ে ঐ বাসাতে চুনি আর আমাকে কাজে লাগিয়ে দাও, পান্না আপাতত তোমার বাসাতেই থাক আর খেলনা বিক্রি করতে থাকুক।

প্রস্তাব শুনে গজেনের ছোট চোখ দুটোও যেন একটু বড় হয়ে উঠল। বললে, পাগল নাকি! তুই রান্না করবি কি করে? জীবনে হেঁসেলে ঢুকেছিস কখনও?

মুক্তো তার পিঠ চাপড়ে বললে, সেজন্যে তোকে বিন্দুমাত্র ভাবতে হবে না। এমন ঝালচচ্চড়ি আর এঁচোড়ের ডালনা রেঁধে খাওয়াব যে, সদর-নায়েবমশাই আমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে পথ পাবেন না।

কৌতুকের সুরে গজেন জবাব দিলে, হুঁ। কিন্তু এখানে এত লোক থাকতে সদর-নায়েবের দিকে তোদের দৃষ্টি গেল কেন। তোদের কি ধারণা, সদর-নায়েব জমিদারকে গুম-খুন করেছে?...হা—হা—হা।

মুক্তো জবাব দিলে, ধারণা আমাদের কিছুই নেই? তবে এমন এক জায়গায় আস্তানা গাড়তে হবে, যেখান থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ করা খুব সহজ হয়।

গজেন বললে, বেশ! তোমরা যখন অভিনয় করবার জন্যে গালে চুনকালি মেখেছ, তখন আর আমি বাধা দেব না। তারপর দু-হাতের তালুতে একটা শব্দ করে বললে, আচ্ছা! ঐ-কথাই পাকা রইল, কাল সকালে একটা চিঠি লিখে মহাবীর সিং-এর সঙ্গে তোমাদের দুজনকে সদর-নায়েবের কাছে পেশ করব।

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে গজেন ধীর-মন্থর গতিতে পাশের ঘরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চলে গেল।

তখন শয্যায় লম্বমান হওয়া ছাড়া আর কী জরুরি কাজ থাকতে পারে!

দারোগাবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে, হলধরবাবু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। একসঙ্গে ঠাকুর ও চাকর লাভ—বিশেষ করে এই পাড়াগাঁয়ে...গজেনবাবুর দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি ওদের দুজনকেই কাজে বাহাল করলেন।

হলধরবাবুর সংসার। শুধু ছেলে-ছোকরার ভিড়। জনকয়েক ভাইপো-ভাগনে আছে, তারা স্কুলে পড়ে। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন, অভ্যাগত, আশ্রিত ইত্যাদিরও অভাব নেই।

এক-কথায় একটি বিরাট হট্টমন্দির আর কি! এই দঙ্গলের ভেতর মিশে যেতে পারলে আসল কাজের অনেক-কিছু সুবিধে হবে।

এতে নতুন উড়ে-বামুন আর চাকর বেশ খুশিই হল। খাটুনি কিছু বাড়ল বটে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ব্যাপার জানবারও বিশেষ সুবিধে হল।

হলধরবাবু এমনি বেশ হাসি-খুশি ভদ্রলোক...কেশ-বিরল টাক-পড়া মাথা, খোঁচা-খোঁচা কদমফুলের মতো গোঁফ-দাড়িতে মুখখানা একরকম ঢাকা বললেই চলে, কিন্তু মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

মুক্তোর কেন যেন মনে হয়, এটা তার আসল রূপ নয়। এই মুখে মিষ্টি লোকটির যেন অন্তর-ভরা বিষ! কেন যে এ-কথা তার মনে হয় সেটা সে নিজেই ভালো বুঝতে পারে না। এই নিয়ে চুনির সঙ্গে তার বচসাও হয়ে গেছে, কিন্তু কেউই কোনো মীমাংসায় এসে পৌঁছুতে পারেনি।

অনেকসময় দেখা গেছে, এক-একটা লোককে প্রথম থেকেই কেমন ভালো লাগে না এবং তাকে এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কেন যে ভালো লাগে না—সে-কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত। হয়তো ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সে ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভালোমানুষ; মুখের চেহারাটা অতি বিশ্রী বলে লোকে আগে-থেকেই তার সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করে থাকে।

এখানে কাজে-লাগার পর থেকে মুক্তোর প্রথম কর্তব্য হল, মৃত-তারিণীবাবু-সম্পর্কে সঠিক খবর সংগ্রহ করা এবং হলধরবাবুর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা কতটা ছিল তা কৌশলে জানা।

প্রায়ই সে লক্ষ করে, হলধরবাবুর শোবার ঘরে প্রত্যহ গভীর রাত্রে আলো জ্বলে। হলধরবাবু বয়স্ক লোক, এত রাত্রে আলো জ্বালিয়ে জেগে থাকবার তাঁর কি প্রয়োজন সে বুঝতে পারে না। এক হতে পারে যে, তিনি সমস্ত দিন কাজ-কর্মের পর পুজো-অর্চনা ধ্যান-ধারণা করেন। আর হতে পারে—গভীর রাত্রে উঠে কোনো দুরভিসন্ধির ফাঁদ পাতবার চিন্তায় তিনি বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন।

এই ব্যাপার সম্পর্কে কিভাবে যে প্রথম অনুসন্ধান শুরু করবে—মুক্তো বসে বসে তাই ভাবতে থাকে।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে। রান্নাবান্না সব শেষ। কিন্তু এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া মেটে একটু বেশি রাত্রে। বাইরে যে দু-খানা ঘরে ছেলেরা থাকে সেখান থেকে নানা কণ্ঠের পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। হলধরবাবু পাড়ার বৃদ্ধদের নিয়ে বৈঠকখানায় পাশা-খেলায় মেতেছেন।

মুক্তোর মনে হল, হলধরবাবুর শোবার ঘরে খোঁজখবর নেবার এই উপযুক্ত অবসর। কিন্তু সমস্ত দিনের খাটুনির পর শরীরটাকে আর টেনে তোলা যাচ্ছে না।

ঠিক এই সময়ে পান্না এসে তার কাছে বসল্। যাক্, এতক্ষণ পরে দুটো মনের কথা কওয়া যাবে।

মুক্তো কি বলতে যাচ্ছিল—পান্না তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে চাপা-গলায় বললে, চুপ! খবর আছে।

মুক্তো প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি, ভাবলে, গজেন বুঝি কিছু বলে পাঠিয়েছে। বললে, বল দেখি কি খবর?

পান্না বললে, আজ ফেরি করে ফেরবার মুখে সন্ধে হয়ে গেল। ঐ যে তে-মাথার মোড়ে ঝুরি-ফেলা বট-গাছটা; ভারী নির্জন জায়গা ওটা। ভাবলাম, ঐখানে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেব। আমি তো জানি না, ও-পাশে আর দুজন লোক বসে গল্প কচ্ছে; মাথার বোঝা নামিয়ে বসতেই ওদের কথা কানে এল।

এত আস্তে ওরা কথা বলছিল যে, প্রথমে কিছু শুনতে পাইনি আর হঠাৎ অন্ধকারের মাঝে লোকও ঠাহর করতে পারিনি। আমি ঘাপটি-মেরে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে চিনলাম, ওর মধ্যে একজন হচ্ছে তোমাদের হলধরবাবু—

মুক্তো সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, হলধরবাবু?

পান্না বললে, আস্তে-আস্তে। ভুলে যেও না যে তুমি উড়ে বামুন!

মুক্তো নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, হ! হ! সে কিমিতি হলা-রে পরাণে ভাই-অ? ড়বণ কিনি-কিড়ি চলি আস্-অ—

বলা বাহুল্য, এখানে পান্নার নাম হয়েছে, পরাণে।

পান্না ততক্ষণে কোনোরকমে হাসি চেপে নিয়েছে।

মুক্তো কৌতূহলের সঙ্গে বললে, কথাবার্তা কী হল তাই বল, আর, সঙ্গের লোকটাই-বা কে?

পান্না জবাব দিলে, সঙ্গের লোকটি আমাদের চেয়ে কিছু বড় হবে। কথাবার্তায় মনে হল, তারিণীবাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগনে।

মুক্তো বললে, হুঁ, এইবার মাতুল সম্পত্তি দখল করতে এসেছে।

পান্না জবাব দিলে, কথার ভাবে মনে হল, উদ্দেশ্যটা বোধহয় তাই!

লোকটা কি জিগ্যেস করলে, হলধরবাবুকে?

ভদ্রলোকটি হলধরবাবুকে বললে, আপনি যে আমার চিঠি পেয়ে কষ্ট করে এখানে দেখা করতে এসেছেন—সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

মুক্তো জিগ্যেস করলে, হলধরবাবু কি জবাব দিলেন?

পান্না বললে, হলধরবাবু বললেন, না-না, তাতে আর কি হয়েছে। আপনি কর্তার ভাগনে—আপনি লিখলে তো আমার এসে দেখা-করা কর্তব্যই।...সে-ভদ্রলোক বললে, আরে মশাই, আপন-ভাগনে হলে তো কোনো কথাই ছিল না। দূর-সম্পর্কের ভাগনে

যে। আমার দাবি টিকবে কিনা তাই-বা কে বলতে পারে! তারপর গলা খাটো করে জিগ্যেস করলে, আচ্ছা হলধরবাবু, নগদ টাকাগুলো কোথায় আছে বলতে পারেন? ব্যাঙ্কে নাকি? ....তার কথার উত্তরে হলধরবাবু বললেন, কাঁচা-টাকা তো তিনি কখনো ব্যাঙ্কে রাখতেন না, নিজের কাছেই থাকত। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর সে টাকার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি!...অ্যাঁ, বলেন কি? বলে ভদ্রলোকটি প্রায় লাফিয়ে উঠল। তারপর একটু রাগ করেই বললে, যে-লোক সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সে-কখনো টাকার পুঁটুলি সঙ্গে করে নিয়ে যায় না! এ কিন্তু আপনাদের অত্যন্ত অন্যায় কথা।...হলধরবাবু মুখখানা ছোট করে বললেন, এজন্যে আমাদের অনর্থক দুষছেন আপনি। এতে আমাদের কি হাত আছে, বলুন?...এবারে ভদ্রলোক হলধরবাবুর হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরে বললে, আপনি আমার সহায় হোন হলধরবাবু। সম্পত্তি আমার হাতে এলে আমি আপনাকে সিকি-অংশ লিখে দেব, কেউ জানবে না। আর তাছাড়া মামা যখন কোনো উইল করে রেখে যাননি তখন ও-সম্পত্তিতে তো আমার ন্যায্য-দাবি রয়েছে। জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করে আপনি চুল পাকিয়েছেন—আপনিই বলুন ন!...হলধরবাবু বললেন, এসব—মামা-ভাগনের সম্পর্কে আপনি আমাকে টানছেন কেন? কোর্ট থেকে সাব্যস্ত হলে সম্পত্তি আপনিই পাবেন, তার জন্যে আমাকে সিকি-অংশ দেবার কি প্রয়োজন আছে, শীতাংশুবাবু?

শীতাংশুবাবু!...নামটা শুনেই নোট্ বই বের করে আমি নামটা লিখে নিলাম।

তারপর শীতাংশুবাবু কি করলে? হলধরবাবুকে মারতে গেল নাকি?...উৎসুককণ্ঠে মুন্তো জিগ্যেস করলে।

পান্না জবাব দিলে, না-না, আর বেশি কিছু বলতে সাহস পেলে না—ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে আর-একদিকে চলে গেল। যাই বলিস ভাই, আমার তো মনে হয়, হলধরবাবু খাঁটি লোক—

মৃদু-হেসে মুন্তো বললে, ঠিক তার উল্টো। এবার আমার কাছে সব-কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন রোজ রাত্রে হলধরবাবুর ঘরে অতক্ষণ আলো জ্বলে। নগদ টাকাটা ঐ ভদ্রলোকই হাতিয়েছে, সরাবার সুযোগ পাচ্ছে না তাই রোজ গভীর রাতে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে আপন মনে টাকা সরাবার ফন্দি আঁটে।

বলিস কি? এই ব্যাপার নাকি?...কথাটা শুনে পান্না যেন আঁৎকে উঠল! বললে, ভদ্রলোকের যে-রকম টাক—টাকা লুকিয়ে রাখা ওর পক্ষেই স্বাভাবিক।

মুন্তো হো-হো করে হেসে উঠে জবাব দিলে, টাকা থাকলেই বুঝি টাকা লুকিয়ে রাখতে হয়? তোর এ আবিষ্কারটি তো বেশ অভিনব। তাহলে আমাদের স্কুলের হেড-পণ্ডিত দুর্গাশঙ্করবাবু অ্যাদ্দিনে বোধকরি টাকার কুমির হয়ে গেছেন—কি বলিস?

এমন সময় চুনি একটা চাবি হাতে করে এসে চৌকাঠের ওপাশ থেকেই চেঁচিয়ে

বললে, ও বামুন-ঠাকুর, এই চাবি নাও, বাবুর ঘর খুলে আলমারিতে যে দোস্তার কৌটো আছে—সেইটে বৈঠকখানায় দিয়ে এস। আর ওই সঙ্গে তোমাদের গুল্ডি-দেওয়া পানও কিছু—বুঝলে?

তারপর রান্নাঘরের ভেতর হঠাৎ মুস্তো আর পান্নাকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে, ভেতরে ঢুকে জিগ্যেস করলে, কি গো ফেরিওলা! বামুন ঠাকুরের সঙ্গে তোমার কি শলাপরামর্শ চলছে?

মুস্তো চাপা-গলায় বললে, সে-কথা তোকে পরে জানাব। তার আগে তুই বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে হরদম অম্বুরী-তামাক সেজে দিয়ে বাবুদের এমন মশগুল করে রাখবি যে, কেউ যাতে আর ওঠবার নাম না করে। আমি এখন বাবুর শোবার ঘরে যাচ্ছি! উনি যাতে এই সময়টায় অন্দর-মহলের দিকে না এসে পড়েন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবি!

চুনি বুঝতে পারলে, তাদের আসল কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই আর উচ্চ-বাচ্য না করে পা-চালিয়ে বৈঠকখানার দিকে চলে গেল।

পান্না কি বলতে যাচ্ছিল, মুস্তো তাকে ইশারায় বসতে বলে, চাবি নিয়ে অন্দরের দিকে চলে গেল।

হলধরবাবুর শোবার ঘর সব-সময়েই চাবি বন্ধ থাকে, তাই বড় কেউ-একটা সে-ঘরে ঢুকতে পায় না। আজ যখন সুযোগ এসেছে তখন মুস্তো বেশ ভালো করে খুঁজে-পেতে দেখবে, যদি কোনো হদিশ পাওয়া যায়।

আলমারি খুলে দোস্তার কৌটো বের-করা—সে না হয় পরে হবে।...সিন্দুক-টিন্দুক কোথাও আছে নাকি? আলমারির পাশে, দো-ছাতির নীচে, খাটের তলায়...না, কোথাও নেই। লোকটা চতুর বটে।

দেয়ালের গায়ে কোনো লুকোনো-আলমারি নেই তো? মুস্তো পান-রাখার 'বটুয়া' থেকে জাঁতি বের করে দেয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখতে লাগল, কোথাও ফাঁকা-আওয়াজ দেয় কিনা!

উঁহু! সেদিক-দিয়েও আশাপ্রদ কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে বৈঠকখানা ঘরের কলগুঞ্জনও ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে।

আচ্ছা, মেঝেয়? ঘরের মেঝেটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না! ঐ যে ওই টালির মতন একটা চৌকো দাগ, ওটা কি?

প্রবল উৎসাহে মুস্তো খাটের তলায় উপুড় হয়ে পড়ল।

...ঠুক-ঠুক! ঠুক-ঠুক! ঠুক-ঠুক!...

দরজার মুখে হঠাৎ বজ্র-গম্ভীর স্বর...ওকি ঠাকুর? খাটের তলায় কি করছ?

দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং হলধরবাবু।

বামুন-ঠাকুর মাথা চুলকে জবাব দিলে, গুটে সুপারি পড়ি গিলা বাবু-দেখুচি।

তিন

এবার আর হলধরবাবুর বাসায় নয়, গোপন-পরামর্শ-সভা বসেছে—গজেনের দোতলার নিভৃত-ঘরে।

মুন্তো বললে, ঠিক এভাবে অগ্রসর হলে সারাজীবনেও আমরা আসল কারণ খুঁজে বের করতে পারব না।

পান্না বললে, তোমরা যদি ঐ হলধরবাবুর বাসায় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে বসে থাক, তবে সারাজীবন কেন, সাত-জন্মের তপস্যার ফলেও এর কোনো হদিশ পাবে কিনা সন্দেহ।

চুনি বললে, তবে কি করতে হবে সেই কথা বল না! চাকর-সেজে থাকতে রাজি আছি; কিন্তু যদি পরচুলের কুটকুটুনিই সার হয় আর আসল কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, তবে কলকাতার আরাম ছেড়ে এখানে হলধরবাবুর মোটা চালের ভাত আর শাক-চচ্চড়ি খেয়ে পড়ে থাকবার কী প্রয়োজন আছে তা-তো বুঝতে পারি না।

মুন্তো বললে, হলধরবাবুই যে আসল অপরাধী সে বিষয়ে কি তোমাদের এখনও সন্দেহ আছে? এটা তোমরা মনে রেখ যে, প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। হলধরবাবু অত্যন্ত চতুর লোক, তাই লোকচক্ষুর সামনে এমনভাবে দশজনের একজন হয়ে বসে থাকতে পারছেন। এটা তিনি ভালোরকমই জানেন যে, তাঁর পদমর্যাদার কথা ভেবে কেউ তাঁকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবে না। কিন্তু তিনি যদি সাধারণ বুদ্ধির লোক হতেন, তবে ঐ লুকোনো নগদ টাকা নিয়ে রাতারাতি পালাতে চেষ্টা করতেন এবং ধরা পড়তেন। এখানে গদি চেপে বসে আছেন বলেই সমস্ত লোকজন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। ভদ্রতার মুখোশ পরে সবাইকে এমন বশীভূত করে ফেলেছেন আর পাশার আড্ডা বসিয়ে পাড়ার মোড়লদের এমন আটকে রেখেছেন যে, যেদিন আসল জিনিস উধাও হবে সেদিন কাক-পক্ষীটিও জানতে পারবে না।

পান্না বললে, তোমার কথা সবই শুনলাম। কিন্তু হলধরবাবুই যে আসল অপরাধী এ পর্যন্ত তার অকাট্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই তার দিকে পুরো নজর দিয়ে, আর সব উপেক্ষা করে থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার মনে হয়, এসব ব্যাপারে এগুতে গেলে আমাদের প্রথম থেকে সবাইকেই সন্দেহ করতে হবে। একদিকে স্থির-নিশ্চয় হয়ে থেকে যেন হতাশ হতে না হয়।

চুনি বললে, তাহলে আমি একটা প্রস্তাব কচ্ছি, তোমরা মন দিয়ে শোনো। মুক্তো কোনো বিষয়ে এমন কোনো আন্দাজ পেয়েছে, যার ওপর নির্ভর করে সে হলধরবাবুর দিকেই সমস্ত জোর দিতে চায়। আমাদের দিক থেকে তাতে যদি আপত্তি থাকে, তবে আমরা এক-একজন এক-এক দিক থেকে অনুসন্ধান চালাতে পারি। তাতে মুক্তোর রাগ করবার কিছুই নেই। কারণ, ষড়যন্ত্র যদি কিছু থাকে তবে খুব শীগগিরিই তার হদিশ মিলবে।

মুক্তো বললে, বেশ। এ খুব ভালো প্রস্তাব! কারণ, তোমরা সবাই শিক্ষিত—মৌলিকভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা তোমাদের সকলেরই আছে। সন্দেহ আর যুক্তিতর্কের জাল বিছিয়ে যদি তোমরা সেই রাঘব-বোয়ালকে তাড়াতাড়ি জালে ফেলতে পার, তবে তার চাইতে কেরামতির কাজ আর কি হতে পারে? আমি তো তাই-ই চাই।

পান্না এতক্ষণ পরে কথা কইলে, বললে, আমি এতক্ষণ এই ধরনেরই একটি প্রস্তাব করব আঁচ কচ্ছিলাম। কিন্তু পাছে মুক্তো মনে করে যে, আমরা তার বাধার সৃষ্টি করছি, সেইজন্যে সাহস করে সেটা উত্থাপন করতে পারিনি। যাই হোক, এ ভালোই হল। আমাদের সবাইকার অনুসন্ধান যদি বেড়াজালের মতো চারদিক থেকে এসে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে, তবে রহস্যের সমাধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না!

এই আলোচনা-সভায় গজেন বরাবর চুপ করেই ছিল। এদের 'রহস্য', 'বেড়াজাল' ইত্যাদি বড় বড় কথা শুনে সে এতক্ষণ পরে কথা কইলে, বললে, তোমাদের এই গভীর আলোচনা-সভায় এতক্ষণ আমি শুধু শ্রোতা হয়েই ছিলাম। ভেবেছিলাম একটিও কথা কইব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়ে তবে ছাড়লে। আমিও ভাই দারোগাগিরি করি। চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু যে ব্যাপারটার পেছনে তোমরা ছুটে চলেছ সেটা আলেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। রহস্য বলে কোনো পদার্থই ওর মধ্যে নেই। এ যেন ঠিক 'মশা মারতে কামান দাগা'!

গজেনের চ্যালেঞ্জে সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আচ্ছা, দেখা যাবে।

চার

পান্নার কথা

সেদিন আমাদের গোপন-পরামর্শ-সভায় স্থির হল যে, নিজের-নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে প্রত্যেকে আলাদাভাবে রহস্যের সন্ধান করবে। যে কৃতকার্য হবে—জয়-গৌরব তার।

এর মধ্যে যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব আছে, সেটা কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। সেটা মন্দ নয়। তাতে মনকে আরো সতেজ করে তোলে। অবশ্য

মুক্তোর বুদ্ধি-বিবেচনা এবং কর্ম-শক্তির উপর আমাদের যে আস্থা নেই তা নয়, তবে প্রত্যেকে যদি আলাদাভাবে কাজ করে যায় তাহলে অতি শীঘ্রই একটা মীমাংসা হবার সম্ভাবনা।

আমি স্থির করলাম, বাসা থেকে যখন ফেরিওলা হয়েই বেরিয়েছি, তখন সেইভাবেই আমার কাজ চালিয়ে যাব। তাছাড়া ফেরিওলা হবার আর-একটা সুবিধে এই যে, যখন যেখানে খুশি চলে যাওয়া যায়। বোকা সেজে অনেক কথা জেনে নেওয়া চলে তাতে কেউ কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারে না। ফেরিওলা হওয়ার সুবিধের ফল সেদিন তো হাতে-হাতেই পেয়েছিলাম। ফেরিওলার গতি অবাধ—অবারিত। কলেজ-জীবনে অভিনয়ে বেশ নাম কিনেছিলাম। এবার দেখা যাক, ফেরিওলার ভূমিকায় 'প্লে' জমে কি না আর শেষ পর্যন্ত সেরা-পার্টের পদকটা কার নামে নাচে।

ভোরে উঠেই ফেরি করবার জিনিস-পত্র মাথায় চাপিয়ে, সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম...

বেলোয়াড়ি চুড়ি চাই...ভালো-ভালো খেলনা চাই...সাবান কাঁটা ফিতে চাই...তরল-আলতা চিরুনি চাই...পমেটম—স্নোও-ও...আপন মনেই হেঁকে চলেছি।

কিছুক্ষণ পথ চলবার পর ভয়ানক তেষ্টা পেল। সামনেই দেখি এক মুদির দোকান! ভাবলাম, ওখান থেকে এক পয়সার বাতাসা কিনে এক ঘটি জল চেয়ে নিয়ে তেষ্টা মেটাব।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, দোকানের ভেতরে বহু লোক বসে তামাক খাচ্ছে আর গল্প-গুজব চালাচ্ছে। বুঝলাম, এই পাড়াতেই হচ্ছে আসল আড্ডাখানা। মাথার মোট নামিয়ে বারান্দার একপাশে রাখলাম। তারপর ময়লা চাদরখানা দিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে আনমনে ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

মুদি জিগ্যেস করলে, তোমার কি চাই, বাপু? চাদর দিয়ে মুখের গায়ের ঘাম মুছে জবাব দিলাম, আমায় এক পয়সার বাতাসা দাও আর সেইসঙ্গে তোমাদের একঘটি জল। তেষ্টায় গলা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

মুদি একটা কাগজের ঠোঙায় করে এক পয়সার বাতাসা দিলে। বাইরের বারান্দায় বসে একটি একটি করে বাতাসা খাচ্ছি, কিন্তু কান খাড়া করে রেখেছি ওদের কথাবার্তার দিকে।

মাথায়-টাক এক ভদ্রলোক বললে, শেষপর্যন্ত ওই সম্পত্তি ভাগনের কপালেই নাচবে। বাবা, মাতুল-সম্পত্তি তো ভাগনেরই প্রাপ্য। নাই-বা হল আসল-ভাগনে, বোনের ছেলে তো বটে!

আর-একজন ফোড়ন দিয়ে বললে, কিন্তু মাঝখানে রয়েছেন যে হলধরবাবু। তিনি জমিদারের সদর-নায়েব! সহজে যে ছেড়ে দেবেন এমন তো মনে হয় না।

বুড়োর হাত-থেকে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে আর-একজন খুব জোরে একটা টান দিয়ে জবাব দিলে, এমন রাজভোগ কেউ-বা ছেড়ে দেয়, বল? শেষ পর্যন্ত উনি একটা প্যাঁচ কষবেনই। লোকে কথায় বলে, ওস্তাদের মার শেষ-রাতে।

খদ্দেরের জন্যে এক-পো ডাল মাপতে-মাপতে মুদি বললে, কিন্তু আমাদের হলধরবাবু তো লোক খারাপ নন! সবার সঙ্গেই বেশ ভদ্র ব্যবহার। এই যে আমার দোকান থেকে এত জিনিসপত্র নেন, কোনোদিনের তরে এতটুকু খিচিমিচি নেই। অনেক বড়লোক তো বাকি ফেলে রাখেন, কিন্তু হলধরবাবুর হিসেব, মাসকাবারে পাই-পয়সা শোধ।

টেকো-মাথা ভদ্রলোকটি ফোড়ন দিয়ে বললে, সবই কেবল ঐ জমিদারের গদি আগলে বসে আছেন বলে। গদি থেকে সরিয়ে দাও, দেখবে, একদিনে হাহাকার পড়ে যাবে। আমার মনে হয়, সমস্ত সম্পত্তিই ঐ ভাগনের প্রাপ্য। এখন সম্পত্তি পেয়ে ভাগনে হলধরবাবুকে রাখলে হয়।

মুদি বললে, শুনলাম, সম্পত্তির খোঁজ পেয়ে ভাগনে নাকি এইখানে এসে বাসা করেছে আর জোর তদ্বির চালাচ্ছে?

টেকো-ভদ্রলোক বললে, তা চালাবে বৈকি! তার পাওনা-গণ্ডা সে ছাড়বে কেন? তোমরা হলে ছাড়তে?

আর-একটি বেঁটে-ভদ্রলোক তামাক টেনে কাশ্‌তে কাশতে মুচকি হেসে বললে, আমার তো মনে হয়, ঐ ভাগনের সঙ্গে হলধরবাবুর যোগাযোগ আছে!

ওরা আগে থেকেই ভাগাভাগি করে মোহরগুলো সরিয়েছে। সেয়ানায়-সেয়ানায় কোলাকুলি আর কি!

মুদি জিগ্যেস করলে, আচ্ছা, ভাগনে-ভদ্রলোকটি কোন পাড়ায় বাস করছে তোমরা কেউ জান?

টেকো-ভদ্রলোক হাসতে হাসতে শুধোলে, কি ভায়া! এখন থেকেই খদ্দের করতে চাও নাকি?

মুচকি হেসে মুদি বললে, আপত্তি কি? একদিন নাহয় দেখা করে আবেদনটা জানিয়ে আসব। এখন হয়ত অল্প-সল্প জিনিস যাবে...পরে তো একেবারে রাজবাড়ির যজ্ঞি!

ওই যে নদীর ধারে লাল-রঙের ছোট্ট একটি বাড়ি আছে, সেইটে ভাড়া করেই আছে শুনেছি...টেকো-ভদ্রলোক একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলে।

আর এক ভদ্রলোক বললে, জানি, জানি। বাসাটার নাম দিয়েছে, 'রাঙাকুটীর'। ছোটো-খাটো দিব্যি ঝকঝকে বাসাটি! তুমি যে ভায়া, বৈঠকখানায় বসেই বাঘ শিকার করতে চাও! ছাতা-মাথায় একটু নাহয় বেরিও?

মুদি জবাব দিলে, এবেলা আর হয়ে উঠবে না; ওবেলা দোকানে আসবার মুখে হয়ে আসব। দোকান চালাতে হলে এরকম হবু-বড়লোক-খদ্দের চাই বৈকি। যদি তেমন কিছু দেখি, একমাস নাহয় বাকিই চালাব—

আমার আর এর-বেশি শোনবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। জল খেয়ে আমি আবার রাস্তায় পা বাড়ালাম।

পোস্টাপিস ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে এগিয়ে গেলেই মার্বেল-পাথরের ওপর "রাঙা-কুটির"-লেখা বাসা। বাসাটার কাছাকাছি এসেই আমি জোরে জোরে হাঁকতে লাগলাম, মাথার কাঁটা, ফিতে চাই...স্নো চাই...পাউডার চাই...তরল আলতা...!!

একটি ছোটো মেয়ে জানলার দিকে উঁকি মেরে দেখলে, তারপর তার মাকে বললে, ওই যে একটা লোক ফিতে-আলতা বিক্রি কচ্ছে। তুমি যে বলেছিলে মা, আজ আমার চুলে বিনুনি করে পায়ে আলতা পরিয়ে দেবে?

মেয়েটির মা এগিয়ে এসে বললে, তোমার বাবা তো এখন বাসায় নেই, ফিরে এলে কিনে দেবো'খন।

আমি দেখলাম, এই মহা সুযোগ। বাড়ির কর্তা বাসায় নেই। এইসময় জিনিস বেচবার ছলে বাসার ভেতরটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

তাই জানলার কাছে গিয়ে বললাম, তাতে কি হয়েছে মা, ছোটো মেয়ে নিতে চাচ্ছে, আমি এখন এমনিই দিয়ে যাব। এ তো আমার চেনা-রাস্তা—দু-বেলা যাই-আসি। না হয় বিকেলবেলা এসেই পয়সা নিয়ে যাব'খন।

ছোট্ট মেয়েটি সেই কথা শুনে কি খুশি। ছুটতে-ছুটতে এসে দরজার খিল খুলে দিয়ে বললে, ও ফিতে-ওলা, এসো—এসো...এই যে আমি দরজা খুলে দিয়েছি। এই বাইরের ঘরে এসো।

এ-ডাকের জন্যে আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। কাজেই মায়ের তরফ থেকে কিছু আপত্তি ওঠবার আগেই বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে আমার ঝুড়ি নামিয়ে ফেললাম।

মেয়েটি এসে আমার জিনিস-পত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল—এই যে মা, জরির কাজ করা কেমন চমৎকার ফিতে! এক কৌটো পাউডার নেব মা...ও-বাসার বিনু কেমন পাউডার মেখে নদীর ধারে বেড়াতে যায়...হাঁ মা, নেব মা?

আমি বললাম, তোমার কি কি দরকার আমায় বল—সব আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটির মা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না-না বাপু, ছেলেমানুষ যা বলে সব কথা শুনতে আছে? চুল বাঁধবার ফিতে একটি তুমি দিয়ে যাও। ওবেলা এসে পয়সা নিয়ে যেও।

কথা বলার ফাঁকে আমি বাড়িটির ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাইরের

বৈঠকখানার পাশেই একটি ছোট্ট আধ-তলা দো-ছাতির মতো জায়গা আছে। সেখানে যত রাজ্যের বাজে জিনিসপত্র গুদোমজাত করা। নিরিবিলি লুকিয়ে থাকবার পক্ষে জায়গাটি বেশ সুবিধের। অমনি আমার মগজের ভেতর একটা অভিসন্ধি খেলে গেল।

মুখে বললাম, বেশ তো মা! ওর ফিতে আমি দিয়ে যাচ্ছি! পয়সা ওবেলা এসেই নেব। আর এই ছোট এক শিশি তরল-আলতা। এর পয়সা কিন্তু আমি নেব না, মা। ছোট বোন হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি।...এই বলে আমার ঝুড়ির ভেতর থেকে নমুনার একটি ছোট তরল-আলতা মেয়েটির হাতে তুলে দিলাম। মেয়েটির মুখে-চোখে সে কী খুশির হাসি! কোঁকড়ানো চুলগুলি দুলিয়ে ছুটতে-ছুটতে সে বাড়ির ভেতরে পালিয়ে গেল।

বেশিক্ষণ আর সেখানে অপেক্ষা করলাম না—যদি জমিদারের ভাগনে ফিরে আসে!

রাস্তায় চনচনে রোদ্দুর! আর অন্য কোনোদিকে না গিয়ে, সোজা বাসার দিকেই পা চালিয়ে দিলাম। খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা দেব এক লম্বা ঘুম। কারণ, এরপর সন্ধের দিকে রয়েছে আমার সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার!

সমস্ত দিন গজেনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কি একটা জরুরি তদন্তে ওর বাইরে যাতায়াতটা যেন বেশিমাত্রায় বেড়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। আমার ভাত ঢাকা দেওয়া ছিল। স্নানটা সেরে নিয়ে ভাত খেয়ে নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

সারাদিন গাঢ় নিদ্রা। সন্ধের একটু আগে ঘুম ভাঙল। বুঝলাম একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে।

এখন 'রাঙা-কুটীরে' গিয়ে যদি ভাগনেবাবুকে না পাই তবে বাড়ির ভেতরে ঢোকা মুস্কিল হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে সাজ-পোশাকটা ফেরিওলার মতোই ভালো করে ঝালিয়ে নিলাম। তারপর দ্রুতবেগে হেঁকে চলেছি নদীর ধারের দিকে।

ওই যে 'রাঙা-কুটীরের' বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। তাহলে বোধহয় ভাগনেবাবু বাড়িতেই আছে।

পা দুটোকে আরও তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিয়ে সেই বাড়ির কাছে গিয়েই জোরে হাঁক দিলাম—জরি-দেওয়া ফিতে চাই...তরল আলতা স্নো চাই...

সঙ্গে সঙ্গে ডাকের ফল পাওয়া গেল। ঘরের ভেতর শোনা গেল সেই ছোট মেয়েটির কথা—বাবা, সেই ফেরিওলা এসেছে! ওবেলা আমায় চুলের ফিতে আর আলতা দিয়ে গেছে। তুমি বাড়ি ছিলে না তাই পয়সা নেয়নি!

মেয়ের মুখের কথা শুনে ভাগনেবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল—আবার তুমি বাকিতে জিনিস-পত্তর কেনা শুরু করেছ? বললাম, দুটো দিন একটু সামলে চল, তোমাদের একটু সবুর সয় না?

মেয়ের মা বললে, না-না, আমরা নিতে চাইনি, ফেরিওলা এমনি দিয়ে গেল। মেয়ের জন্যে শুধু একটা চুলের ফিতে রাখা হয়েছে।

ততক্ষণে আমি দরজা দিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়েছি।

ভাগনেবাবু চোখটা একটু গরম করেই আমায় জিগ্যেস করলে, কি হে! কত পাওনা তোমার?

মুখখানার মধ্যে যথাসম্ভব বিনয়ের ভাব এনে বললাম, আজ্ঞে, জরির একটি ফিতে—মাত্র চার পয়সা ওর দাম।

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললে, বা—রে! তরল-আলতা দিয়েচ যে! তার দাম নেবে না?

আমি জবাব দিলাম, না দিদিমণি, আমি ওটা তোমাকে এমনি দিয়েছি। সেজন্যে তো পয়সা নেব না!

আমার কথা শুনে ভাগনেবাবু খুশি হয়েছে বলেই মনে হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বস একটু তুমি, এখুনি পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

বাড়ির কর্তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভেতরে চলে গেল।

এখুনি খুকু পয়সা নিয়ে ফিরে আসবে। আমি ভাবছিলাম, কি-করে ঐ দো-ছাতির ওপর আত্মগোপন করা যায়। কিন্তু পয়সাটা না নিয়ে এখন লুকোলে ওরা সন্দেহ করতে পারে, তাই মেয়েটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই লাফাতে-লাফাতে খুকু ফিরে এসে আমার হাতে একটা আনি গুঁজে দিলে, তারপর বললে, মাঝে-মাঝে এসে আমায় ভালো-ভালো জিনিস দিয়ে যেও...

ততক্ষণে আমি মতলব ঠিক করে ফেলেছি। খুকুকে বললাম, আমার জন্যে এক গেলাস জল নিয়ে এস তো দিদিমণি,—ভারি পিপাসা পেয়েছে।

ও! জল খাবে তুমি? আচ্ছা, দাঁড়াও। ...বলে মেয়েটি তার কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আমি বাসা থেকে বেরুবার সময় ইচ্ছে করেই পুঁটুলিটা ছোট করে এনেছিলাম। খুকু ভেতরে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আস্তে-আস্তে গিয়ে সেই দো-ছাতির ওপর লুকিয়ে বসে রইলাম। উঃ, যেমন গুমোট গরম, তেমনি ভ্যাপসানি দুর্গন্ধ! সেই স্তূপীকৃত জিনিসপত্রের পেছনে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি ছিল, হাওয়া পাবার জন্যে সেইটে তুলে দিলাম। অন্ধকার এখানে বেশ জমে আছে...না, ধরা পড়বার আর বিশেষ ভয় নেই।

খানিক পরে মেয়েটি ছুটতে-ছুটতে এসে বাইরের ঘরে হাজির। তার এক-হাতে একঘটি জল, আর-এক হাতে দুটি বাতাসা! ...ফেরিওলা গেল কোথায়? চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়!...ফেরিওলা! ও ফিতেওলা?...

ওরা ডাকে সাড়া দিতে পাচ্ছি না বলে মনে ভারী কষ্ট হল। মেয়েটির ডাকা-

ডাকিতে তার মা বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে বললে, কি রে? এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

মেয়েটির চোখ ততক্ষণে ছলছলিয়ে এসেছে। বললে, তুমি বাতাসা দিতে দেরি করলে বলেই তো সে চলে গেছে! আমার কাছে জল খেতে চাইলে!...

ও হয়তো অন্য পাড়ায় ফেরি করতে গেছে...ভেতরে চল। বলে মেয়েটির মা সদর দরজা বন্ধ করে মেয়েটির হাত ধরে ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভাগনেবাবু একটা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাইরের ঘরে এসে বসল আর মাঝে-মাঝে রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল।

তার মুখের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কারও আসবার প্রতীক্ষায় আনচান করছে।

রাত ক্রমে গভীর হতে লাগল। ভদ্রলোক একবার ভেতরে আর একবার বাইরে দ্রুত-পায়চারি করতে লাগল।

আরও কয়েকটা সিগারেট পোড়ানোর পর জানলার ধারে হঠাৎ থমকে থামল। ...বোধ হয় কেউ এসেছে। ঠিক তাই। পরমুহূর্তেই দুটো গুন্ডা-গোছের লোককে জানলার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। তাদের দুটিকে দেখে ভাগনেবাবুর চোখ-মুখ খুশিতে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি তক্তপোশ থেকে উঠে সে দরজা খুলে দিলে।

লোক দুটো ভেতরে এসে বসল, তারপর ফিস-ফিস করে কথা কইতে শুরু করে দিলে।

ভাগনেবাবু জিগ্যেস করলে, কি হল হে নটবর! কিছু কিনারা করতে পারলে?

নটবর মাথাটা দুলিয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে, অনেক রাত্তিরে হলধরবাবুর ঘরে আলো জ্বলে এ-ব্যাপার আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু তার ঘরের কাছে এগুতে পারিনি।

বিরক্ত হয়ে ভাগনেবাবু জিগ্যেস করলে, কেন হে? তোমরা এমন দিকপাল লোক; একটা বুড়োর ঘরের কাছে যেতে পারলে না কেন? তাছাড়া বুড়ো তো তোমাদের যাবার কথা বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

নটবর আগের মতোই মাথা দুলিয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে বাবু, সে-কথা সত্যি; তবে কিনা—হলধরবাবুর ঘরের বাইরে যে প্রকাণ্ড একটা বিলিতি কুকুর ছাড়া থাকে, আমরা সে-কথা একেবারেই জানতাম না।

এই কথা শুনে ভাগনেবাবু বললে, তাহলে যা ভেবেছি তাই ঠিক। মোহরগুলো ওই বুড়ো-শয়তানটাই সরিয়েছে—

দেখ নটবর, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হবার আগে ওই মোহরের থলি হলধরের ঘর থেকে তোমাদের সরাতে হবে। জমিদারি যদি পাই তাহলেও তোমাদের লাভ,

আর যদি না-পাই তাহলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। তোমাদের যা প্রাপ্য তা ওই মোহর থেকেই আমি দিয়ে দেব—তারপর রইল ওই বিশাল জমিদারি আর রইলে তোমরা।

ঠিক এই সময় হঠাৎ আমার এমন একটা হাঁচি এল যে, কোনোমতে সেটা সামলাতে না-পেরে...এই—এই—হ্যাঁচ্-চ্-চ্ছোঁ-ও...!! সঙ্গে-সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কম্প আর সারাদেহ কদম্ব-কেশরের মতো কণ্টকিত!

ওদিকে শব্দের চোটে নীচে নটবরে-জটাধরে জড়াজড়ি আর ভাগনেবাবুটি তক্তপোশের ওপর থেকে একেবারে সশব্দে পপাত ধরণীতলে!

তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেই ভাগনে-ভদ্রলোক ব্যাপারটা বোধহয় বুঝে নিলে, নিয়ে নটবরকে বললে, নিশ্চয়ই ওখানে কেউ লুকিয়ে থেকে আমাদের পরামর্শ শুনেছে।

শুনেই নটবর আর জটাধর আস্তে আস্তে গিয়ে দো-ছাতির ওপর উঠলে, তারপর দু-জনে দু-পাশ থেকে আমার দুটি কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে, নীচে নামিয়ে নিয়ে এল।

ভাগনেবাবু আমার দিকে একবার চেয়েই বললে, ও-ও! তুমি সেই ফেরিওলা? এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন তুই বিনি-পয়সায় তরল-আলতা দিয়ে গিয়েছিলি! নটবর, ও ফেরিওলা নয়, হলধরের গোয়েন্দা! ধর ওকে ভালো করে, থানায় দিতে হবে।

নটবর এগিয়ে এসে আমার গোঁফ ধরে টানতেই সেটা থিয়েটারের আলগা-গোঁফের মতো খুলে এল।

তারপর আমার ওপর চলল গোটাকয়েক বিরাশি-ওজনের লাথি-ঘুষি, তারপরে দুজনে আমার দুটি হাত ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টার গজেনের হাতে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে!

পাঁচ

চুনির কথা

মুক্তো যখন উড়ে বামুন হয়ে হলধরবাবুর বাসায় রয়ে গেল, তখন আর আমার চাকর হয়ে সেখানে থাকতে মন টিকল না।

কাউকে কিছু না বলে—এমন কি, মুক্তোকেও না জানিয়ে শুধু 'মেক-আপ-কেস'টি নিয়ে এক-পা দু-পা করে বাসা ছেড়ে চলে এলাম।

পান্না তো ফেরিওলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন আমি কোনপথে চলি? চলতে চলতে, পথের পাশে দেখলাম বেদের দল আগের দিন রান্না করে খেয়ে গেছে।

ভাঙা ইটের তৈরি আলগা উনুনের মাঝখানে কাঠের ছাইগুলো তেমনি পড়ে আছে...চমৎকার প্ল্যান।

আর একমুহূর্তও দেরি করা ঠিক নয়। ছাইগুলো একটা ছেঁড়া খবরের কাগজে তুলে নিয়ে পাশের একটা ঝোপের ভেতর আত্ম-গোপন করলাম। সমস্ত গা ভস্মাচ্ছাদিত করতে খুব বেশি দেরি লাগল না, আর জটাজুট। 'মেক-আপ-কেস' তো সঙ্গেই আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই একেবারে চমৎকার সাধুবাবা! এবার একটা গাছের ডালে বেশ করে মেক-আপ-কেসটি বেঁধে রেখে সেই গাছের গুঁড়িতে একটি চিহ্ন এঁকে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর শ্মশানে গিয়ে একটা বুড়ো-বটগাছের তলায় আস্তানা নিয়ে—কিছু শুকনো কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বেলে দিলাম।

ধুনি জ্বালাটা হচ্ছে আধুনিক পাবলিসিটি অর্থাৎ প্রচার-কার্য। সমস্ত দিন গলা ফাটিয়ে একটা লোক যদি চিৎকার করত—নদীর ধারে শ্মশানে এক সাধুবাবা এসেছে, কিংবা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াত—তাতেও তত কাজ হত না, যত বেশি কাজ পাওয়া গেল এই ধুনি জ্বালিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে দু-একজন করে আসতে লাগল সাধুবাবাকে দেখবার জন্যে!

সাধুর কাছে লোকে যেমন মনের কথা খুলে বলে এমন আর কারও কাছে নয়। কার সংসারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, কে ব্যবসায় লোকসান দিয়েছে, কার ছেলেপুলে হয় না—মাদুলি ধারণ করা দরকার, বাপ তাড়াতাড়ি পটল তুললেই কে বাঁচে, কে লটারিতে টিকিট কিনে রাতারাতি বড়লোক হতে চায়...তাদের সকলকার গোপন কথা সাধুবাবার কাছে শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করে প্রতিবেশীর কাছে যে-কথা বলা চলে না, দূরের অচেনা-সাধু একমুহূর্তে সে গণ্ডি ভেঙে চুরমার করে এক করে দেয়।

দেখে-শুনে আমি কেমন ঘাবড়ে গেলাম। প্রথম দু-দিন আমি কথাবার্তা বন্ধ করে মৌনী হয়ে রইলাম।

এখন বুঝছি শুধু সাধু হলেই হয় না—বাণী প্রচারের জন্যে সঙ্গে একজন চ্যালা থাকা দরকার।

বোধকরি রতনেই রতন চেনে। তাই তিনদিনের দিন ভিড় কমলে একটি লোক এসে আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

প্রথমটা আমার ভয় হয়েছিল, গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নয় তো? তারপর চোখ পিট-পিট করে একটুখানি তাকাতেই সে ঠিক আমাকে চিনে নিলে—যেমন সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে!

কাছ ঘেঁষে বসে আবদারের সুরে বললে, এখন তো আর কেউ নেই দেবতা—

গাঁজার কলকেটা একটু বের কর না, ভালো করে সেজে দি। তারপর নাহয় একটু প্রসাদ পাব'খন—

সাধুবাবা হতে গেলে যে গাঁজা খেতে হয় সে-কথা একেবারে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। যাই হোক, ওকে হাত-ছাড়া করা হবে না, ওকে আমার দরকার হবে।

গলা খাটো করে জিগ্যেস করলাম, হ্যাঁরে, এদিকে তোকে কেউ চেনে?

ভক্তি-গদগদকণ্ঠে লোকটা জবাব দিলে, কেউ না প্রভু, কেউ না। দু-ক্রোশ উত্তরে একদল সাধুর সঙ্গে ছিলাম। তারা যে হঠাৎ কোথায় উধাও হল বুঝতে পারলাম না। তাদের সন্ধানে ঘুরতে-ঘুরতেই তো তোমার দর্শন পেলাম দেবতা! চ্যালাকে আর ছলনা কচ্ছ কেন প্রভু?

বললাম, ভালো হয়ে বস, তোর সঙ্গে কথা আছে। আমি এখানে মৌনী বাবা হয়ে আছি। তুই আমার চ্যালা হয়ে থাকবি?

বত্রিশ-পাটি দন্ত বিকশিত করে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে লোকটি জবাব দিলে, তা আর থাকব না কেন দেবতা? আমার ব্যবসাই তো ওই। তবে গাঁজা না-খেলে কিন্তু থাকতে পারব না...বোম—বোম...মহাদেব! বলে দু-হাতের তালু দিয়ে সে অদ্ভুত একটা শব্দ করলে।

ট্যাঁক থেকে গোটাকয়েক পয়সা বের করে ওকে দিলাম। ওকে দিয়ে যখন কাজ হাসিল করতে হবে তখন হাতে রাখা ভালো।

বললাম, গাঁজার পয়সা নাহয় তোকে দিচ্ছি, কিন্তু কিনে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি আর আসবার সময় গাঁয়ে রটিয়ে আসবি যে, কাল অমাবস্যা—কাল রাত্রে সাধুবাবা মৌন-ব্রত ত্যাগ করবেন।

লোকটি হি হি করে হেসে উঠে বললে, আর-কিছু?

বললাম, কথাটা যাতে সদর-নায়েব হলধরবাবুর কানে যায় সেই ব্যবস্থা করে আসতে হবে।

লোকটি বলল, সেজন্যে ভেব না তুমি দেবতা। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো কথার ঠিক পাবে।

হলধরবাবুর জন্যে যে টোপ ফেলেছিলাম তা যে এমনভাবে কাজে লাগবে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

সন্ধে থেকে মাদুলি, জল-পড়া আর আশীর্বাদের বায়নায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ক্রমাগত ভাবছিলাম, মৌন-ব্রত ভঙ্গ করবার সংবাদ এমন করে না জানালেই হত। কিন্তু তাতেও ভয় ছিল এই যে, গ্রামসুদ্ধু সবাইকে না জানিয়ে একমাত্র হলধরবাবুকে খবর দিলে তিনি হয়তো সন্দেহ করতেন।

যাক, নারকেল খেতে হলে বাইরের ছোবড়া ও খোলার অত্যাচার সহ্য করতেই হবে—নইলে ভেতরের শাঁস পাওয়া যাবে না।

আমার শিষ্যটি এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ। ক্রমাগত লোক তাড়িয়েই যেন তার আনন্দ। আবার যারা খাবার আর পয়সা নিয়ে আসছে, তাদের খাতির করতেও জানে।

খাবারের দিকে আমার বিশেষ লোভ নেই। ক্ষিদের জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু। এই ব্যাপার দেখে চ্যালা-মহারাজ আরও আমার ভক্ত হয়ে উঠেছে। পয়সাগুলো ক্রমাগত ট্যাকে গুঁজছে—সন্ধেবেলা ওর কাজে লাগবে।

গ্রামসুদ্ধ সবাই সন্ন্যাসীর বাণী শোনবার জন্যে পাগল, আর সন্ন্যাসী নিজে যাকে দেখবার জন্যে আকুল তার টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত হলধরবাবু আমায় নিরাশ করলেন না, এলেন। এলেন একেবারে গভীর রাত্রে।

অর্ধনিমীলিত নয়নে আমি তাঁর হাবভাব দেখতে লাগলাম।

প্রথমেই এগিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দুটি টাকা দিয়ে আমার চরণ বন্দনা করলেন। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম অন্যরকম। সদর-নায়েব যখন, হয়তো একটা মোহরই প্রণামী দিয়ে বসবেন। তাতে আমার এক-কাজে দু-কাজ হত। প্রথমে হত একটা মোহর লাভ, আর তাই দিয়ে অনুসন্ধান চলত—এই মোহরই জমিদারের সাবেক কালের জমানো-মোহর কি না।

যাই হোক, তা যখন হল না তখন অন্যভাবেই কথা পাড়তে হবে।

আমার চ্যালা-মহারাজ হলধরবাবুকে বিশেষ যত্ন করে বসালে। তারপর বললে, মহারাজ ধ্যানস্থ হয়েছেন, ধ্যান ভঙ্গ হলেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারবে।

সন্ধে থেকে ঠায় বসে বসে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। তাই আর বেশিক্ষণ ভণিতা না করে নিমীলিত চক্ষু খুলে ফেললাম।

তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ললাট তো বেশ প্রশস্ত...কপালে রাজচক্রবর্তী হওয়ার যোগ আছে।

আমার কথা শুনে হলধরবাবুর মনটা একটু ভিজল মনে হল। ভালো হয়ে আমার সামনে বসে ডান-হাতখানি তিনি এগিয়ে দিলেন।

হাতখানা নেড়ে-চেড়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললাম, আপনার হাতে তো স্বর্ণলাভের যোগ রয়েছে দেখছি।...দেখি—দেখি? না, একটা বিঘ্ন রয়েছে এই যে!

এই কথার পর ভদ্রলোক যেন আমাকে পেয়ে বসলেন। বললেন, বলুন সাধুবাবা, সব-কথা খুলে বলুন, কিসের বিঘ্ন তাও বলুন...আমি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেব।

কপালে হাত ঠেকিয়ে, মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব আনবার চেষ্টা করে মৃদু হেসে বললাম, আমায় প্রলোভন দেখাবেন না বাবু! যেদিন একবস্ত্রে সংসার ছেড়েছি, সেইদিন

থেকে অর্থে কিংবা কাঞ্চনে আর আমার লোভ নেই।...দেখি আপনার হাতখানা আর-একবার?...

...এই দেখুন, স্বর্ণ আপনার গৃহ-দ্বারে এসেছে, কিন্তু থাকবে না। আবার দূরে চলে যাবে...ডান-হাতটা দেখি? এই যে, দক্ষিণ হস্তেও একইরকম রেখা দেখা যাচ্ছে।

হলধরবাবু ভাব-গদগদকণ্ঠে জবাব দিলেন, দেখুন সাধুবাবা, এখানকার যিনি জমিদার ছিলেন তিনি আমায় ছেলের মতো স্নেহ করতেন। ইদানিং বৃদ্ধ বয়সে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁরাও প্রায়ই এই জমিদারের কাছে আসতেন, কিন্তু গোপনে—সবার অলক্ষ্যে। তাঁর মোটেই ইচ্ছে ছিল না সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কথা বাইরের লোক জানতে পারুক। একমাত্র আমিই তা জানতাম। তাঁর বহু গোপন দান ছিল। পাছে কেউ জানতে পেরে তাঁকে এসে বিরক্ত করে, সেইজন্যে তিনি সাধুদের দান করতেন সবার অলক্ষ্যে।

এই কথা শোনার পর ইঙ্গিতে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে খানিকটা ছাই নিয়ে মাটিতে একটা ছক কাটলাম। তারপর তন্ময় হয়ে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর বললাম, দেখুন, আমি গণনায় দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের জমিদার বহু স্বর্ণ-মুদ্রার অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সেগুলো আপনার হাতে এসে পড়ারই কথা। কিন্তু কোথায় যেন মাঝখানে একটা গোল হচ্ছে। সে-সম্পদ কি তাহলে আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে?

হলধরবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, কর্তার যে রাশি-রাশি মোহর ছিল সেকথা এ-অঞ্চলের সবাই জানে, কিন্তু কর্তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল স্বর্ণ-ভাণ্ডারেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছি, দু-এক দিনের মধ্যেই কালেক্টর সাহেব স্টেটের ভার নিতে আসছেন। কিন্তু তিনি জিগ্যেস করলে মোহর-সম্পর্কে যে কী জবাব দেব, সেই হয়েছে আমার সত্যিকারের দুর্ভাবনা।

বুঝলাম, হলধরবাবু গভীর জলের মাছ। তাঁর কাছ থেকে কোনো গুপ্তকথা বের-করা যে-সে লোকের কাজ নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হলধরবাবু খপ করে আমার পাটা জড়িয়ে ধরে বললেন, দোহাই সাধুবাবা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তো আপনার নখাগ্রে...দয়া করে আমায় বলে দিন, সেই মোহরের থলি কে সরিয়েছে! তাহলে তাকে আমি রাতারাতি কালেক্টর-সাহেবের কাছে এনে হাজির করি।

আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে আর-একবার তাঁর হাতখানা দেখে জবাব দিলাম, মনে হচ্ছে, সেই ধনরাশি আপনার আয়ত্তের বাইরে যায়নি। এখনো যদি আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন তাহলে উদ্ধার করতে পারবেন! তারপর জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, জমিদারের কি কোনো ওয়ারিশান নেই?

হলধরবাবু বললেন, এক দূর-সম্পর্কের ভাগনে আছে বটে, কিন্তু তারই দিন চলে না। তাছাড়া ওয়ারিশানের প্রশ্ন এখন উঠতেই পারে না। কারণ, কর্তা নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তিনি তো আবার ফিরে আসতে পারেন—তাঁর প্রাণহানির কোনো খবর তো আমরা এখনও পাইনি!

স্মিতহাস্যে আমি জবাব দিলাম, কিন্তু একটু ত্যাগ স্বীকার করলে তাঁর ফেরবার পথ চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ করে দেওয়া যায়।

হলধরবাবু আমার শ্রীচরণে একেবারে লুটিয়ে পড়ে বললেন, ত্যাগ? যদি সাধ্যের বাইরে না হয়, তাহলে আপনার হুকুম পাওয়া মাত্র আমি প্রস্তুত আছি। আমায় বাঁচান আপনি।

তারপর যে-সব কথাবার্তা হল এবং একঘণ্টা পরে যে দুটি দ্রব্য এনে তিনি আমার চরণে অর্পণ করলেন, 'আলিবাবার' মতো গাধার পিঠে বইয়ে আনতে পারলে সে থলি দুটি আনতে আর আমায় গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হত না।

তার পরদিন থেকে সাধুবাবার দর্শন আশায় এসে কত ভক্তকে যে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তার সঠিক সংবাদ আমার জানা নেই।

ছয়

মণির কথা

ওদের সঙ্গে যাব প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মতো গিয়ে পৌছুতে পারিনি। ওরা সবাই নিশ্চয়ই মনে-মনে হেসেছে আর আমায় ভীতু বলে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু কি করব, সেদিন যাবার আমার কোনো উপায়ই ছিল না। সারাদিন প্রচণ্ড রোদে ঘোরবার পর হঠাৎ স্নান করে মাথাটা এমন ধরল যে, সত্যিই শয্যার আশ্রয় নিতে হল। তারপর দুটো দিন যে কেমন করে কেটেছে—মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তা ভালো করে জানতেও পারিনি।

দেহের সেই দুর্বলতা নিয়ে সংসারের কোনো কাজেই লাগতুম না। ভাগ্যে ওরা আমায় সঙ্গে নিয়ে যায়নি! নইলে সেই বিদেশে আমাকে নিয়ে ওরা কী ফ্যাসাদেই না পড়ত!

অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে শুধু বিছানায় শুয়ে থাকতাম আর খবরের কাগজ পড়ে-পড়ে সময় কাটাতাম। এই সময় হঠাৎ একটি সংবাদের দিকে আমার চোখ পড়ল। অন্য সময় হলে হয়তো এর শিরোনামের ওপর চোখ বুলিয়েই পাতা উল্টে দিতাম, কিন্তু কয়েকদিন আগে ঠিক এই ধরনের একটি সংবাদ পড়েই মুক্তো, পান্না, চুনিরা

অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছে। কাজেই, এই সংবাদটি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হল। সংবাদটি এই ঃ

'ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন নিশীথ রাতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রবাবু অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেছিলেন। বহু দরিদ্র-ছাত্র তাঁর বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিত। তাঁহার অনেক নগদ অর্থ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। তাঁহার নিরুদ্দেশের পর উক্ত অর্থের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত বলিয়াই মনে হয়। স্থানীয় পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।'

সংবাদটা পড়ে খানিকক্ষণ চুপ-চাপ বসে রইলাম। বুঝলাম, মুক্তোর দল যে-সংবাদ পড়ে নদীয়া-জেলার একটি গ্রামে ছুটেছে, তার সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার এই গ্রামের ব্যাপারটিরও একটা রীতিমতো যোগসূত্র আছে।

প্রথমে আমি মুক্তোর কথায় বিশেষ উৎসাহিত হইনি বটে, কিন্তু এই খবরটি পড়বার পর আমার যেন একটা ঝোঁক এসে গেল এইদিকে।

মনে-মনে আঁচ করতে লাগলাম, এখন কোনদিক থেকে শুরু করা উচিত!

কলকাতায় বসে যে এর কোনো কূল-কিনারা পাব তা মনে হল না।

এইসময় দুটি ভারি চমৎকার যোগাযোগ হয়ে গেল। প্রথমটি—আমাদের গজেনদার প্রেরিত একটি ভীষণ রহস্যমূলক চিঠি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, আমার দাদামশাই বগুড়া-জেলার বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি। লোকালয়ের বাইরে বহু জমি নিয়ে সম্প্রতি তিনি এক চিনির কল খুলেছেন। জমিতে আখের চাষ হয় আর তার পাশেই চিনি তৈরির কারখানা। আমি দাদামশায়ের একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। দাদামশাই লিখেছেন, বহুদিন তিনি আমায় দেখেননি। যখন আমার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, তখন কলকাতায় তো এখন আর কোনো দরকার নেই—তাই, কিছুদিন তাঁর ওখানে গিয়ে থাকতে তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।

প্রস্তাবটি আমার বেশ ভালো লাগল। কেন ভালো লাগল, সে-কথা আমি পরে জানাব। এর ভেতর বেশ সেরেও উঠেছিলাম, তাছাড়া বাইরে যাবার কথাও হচ্ছিল। দাদামশাই চিঠি লিখেছেন শুনে মা খুশি হয়েই সম্মতি দিলেন। আমি তার পরদিনই ছোট্ট একটি সুটকেস নিয়ে বগুড়ার উদ্দেশে 'নর্থ-বেঙ্গলে' চেপে বসলাম।

বাইরের খোলামেলা হওয়ায় আর দাদামশায়ের গোয়ালের গাইয়ের খাঁটি দুধ খেয়ে, দিন-কয়েকের মধ্যেই আমার শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

এরপর, একদিন সুযোগ বুঝে দাদামশায়ের সঙ্গে গোপনে অনেকক্ষণ ধরে একটা বিষয়ে পরামর্শ করলাম। প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। কিন্তু আগেই বলেছি

যে, আমি তাঁর একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে—কাজেই, জিত শেষ পর্যন্ত আমারই হল। এই গোপন-পরামর্শের কয়েকদিন পরেই কলকাতার কতকগুলি ইংরেজি-বাংলা দৈনিকে নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হল ঃ

"বগুড়া জেলার অন্তর্গত কলাডোবার বিখ্যাত চিনির কলের একমাত্র মালিক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় ভারতের দুর্গম তীর্থ অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের বসবাসের নিমিত্ত কয়েকটি পাকা-আস্তানা তৈরি করিয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ইহার ব্যয়-নির্বাহার্থ তিনি মোটা টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবেন। এই সংবাদে হিন্দুধর্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। আমরা এই বাঙালি-ব্যবসায়ীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

এই টোপটি ফেলে আমি চুপ চাপ বসে রইলাম, আর রোজ সংবাদপত্র দেখতে লাগলাম, নতুন কোনো ধনী-ব্যক্তির উধাও হওয়ার খবর বেরিয়েছে কি না।

খুব বেশি অপেক্ষা আমাকে করতে হল না। সাতদিনের দিন দুটি সন্ন্যাসী এসে দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। পরিচয়ে জানা গেল, এঁরা তান্ত্রিক-সাধু। কামাখ্যা অঞ্চলে এঁদের প্রকাণ্ড একটি মন্দির আছে। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী বাস করেন এবং তন্ত্রমতে যাগ-যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি করে থাকেন। এঁদের আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাদামশাইকে অনুরোধ করা, যাতে তিনি ঐ মন্দিরের সঙ্গে সাধুদের বসবাসের জন্যে একটি ভবন নির্মাণ করেন।

আমি জিগ্যেস করলাম, আপনাদের কথাবার্তায় জানা গেল যে, আপনারা তন্ত্রমতে ভজন-সাধন করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কী—যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের কাছে খুলে বলবেন কি? বুঝতেই তো পাচ্ছেন, আমাদের মতো সাধারণ লোকের এ সম্পর্কে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বয়স্ক সন্ন্যাসীটি এক টিপ নস্য নিয়ে বেশ ভালো হয়ে বসে বললেন, দেখুন, আজকালকার দিনে আপনাদের মতো ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা তো মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বিশ্বাস করবেন না, তাই, আমরা আসল কথা বলতে ভরসা পাই নে। আমাদের মঠের যিনি মোহান্ত, তিনি দীর্ঘকাল তিব্বতে বাস করে ভারতের আদিযুগের লুপ্ত মন্ত্র-তন্ত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন। সেই লুপ্ত-গরিমাকে জাগ্রত করবার জন্যে অতি নিভৃতে তিনি কঠিন সাধনায় নিমগ্ন আছেন। তাঁর পণ ছিল—কার্য সমাধান না করে দেশের শিক্ষিত-সমাজের কাছে তিনি এ কথা প্রকাশ করবেন না। কারণ, এই সাধনা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। মন্ত্রে যে অসাধ্য সাধন করা যায়, ভারতের লোক আজ সে-কথা একেবারেই ভুলে গেছে। আমাদের মোহান্তমহারাজের সিদ্ধিলাভ করবার আর মাত্র তিন বৎসর বাকি। এরপর, তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী হবেন যে, ভারতবর্ষকে তিনি আবার সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে তুলতে পারবেন। কিন্তু, তার আগে আপনাদের মতো শিক্ষিত ধনী-ব্যক্তির কাছে আমাদের এইটুকু মিনতি যে, তাঁর সাধনা যাতে বাধা না

পায়, সেজন্য আপনারা কিছু কিছু সাহায্য করুন। আপনারা বলবেন, এটা বিজ্ঞানের যুগ—মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না। তার জবাবে আমরা শুধু আপনাদের এই কথা জানাতে পারি যে, এই মন্ত্র-তন্ত্রই ভারতের বড় হবার আসল বিজ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নামই হচ্ছে, বিজ্ঞান। মন্ত্র-তন্ত্রকে ষোলো আনা আয়ত্তে আনতে পারলে আর কেউ দুঃখী থাকবে না। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, সে সুদিন আগতপ্রায়। তখন আর ভারতবর্ষের একটি প্রাণীকেও অনাহারে মরতে হবে না।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি বললাম, দেখুন, আপনার সব-কথাই আমি বেশ মন দিয়ে শুনলাম। কিছু মনে করবেন না, চোখে না-দেখে কিন্তু এর একবর্ণও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ধরুন, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই, তাহলে কি আপনারা মন্ত্র-তন্ত্রের এইসব শক্তি আমাকে চাক্ষুষ দেখাতে পারেন?

দুটি সন্ন্যাসীই একসঙ্গে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারি। এমন জিনিস দেখাতে পারি, যা দেখে আপনাকে খুশি হয়ে স্বীকার করতে হবে যে, সে-কাজ করবার সাধ্য আধুনিক যুগের কোনো বিজ্ঞানেরই নেই।

এইসব কথা শোনবার পর আমি একবার দাদামশায়ের দিকে চাইলাম।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি বললেন, আপনি অন্যমনস্ক হবেন না। আমাদের বক্তব্য প্রায় শেষ হয়ে এল। যা বলছিলাম, হ্যাঁ, আমাদের মোহান্তের পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হতে তিন বৎসর বাকি আছে বটে, কিন্তু তন্ত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতা লাভ করেছেন। অবশ্য, আপনারা বাইরে থেকে তা কিছুই বুঝতে কিংবা বিশ্বাস করতে চাইবেন না; তবে, এটা ঠিক যে, দীর্ঘ বারো বৎসর তিব্বতে থেকে তিনি এই বিদ্যা শিক্ষা করেছেন।...যাবেন আপনি আমাদের সঙ্গে?

দাদামশাই বোধহয় তামাক খেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। আমার যাবার কথাটা তাঁর কানে যেতেই নলটা ফেলে দিয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠে বললেন, না-না, ও কোথায় যাবে? আপনারা ক্ষেপে গিয়েছেন, না আমার নাতিটিকে ক্ষেপাতে এসেছেন? আপনারা এখন যেতে পারেন। আমি আপনাদের কোনোরকমেই সাহায্য করতে পারব না।

দাদামশাইকে কিভাবে ঠান্ডা করতে হয়, তা আমি জানতাম। কাজেই, তখন আর কোনোরকম ওজর-আপত্তি না তুলে সন্ন্যাসী-বাবাজিদের বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললাম।

এত কষ্ট করে এতদূর এসে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বোধকরি তাঁরা মোটেই রাজি ছিলেন না। তাই, দাদামশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখুন, আপনার কাছে আমাদের আরো গূঢ় এবং গোপনীয় কথা আছে...আপনি ব্যবসায়ী-ব্যক্তি, শুনলে খুশি হবেন। যদি বলেন, আমরা গোপনেই সে কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে পারি।

দাদামশাই বললেন, দেখুন, সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ব্যবসায়ের কোনো পরামর্শ জীবনে কোনোদিনই নিইনি এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন নেবার প্রয়োজন হবে না। আপনারা আত্মীয়-স্বজন ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, বেশ, ভালো কথা। হিমালয়ের গুহার ভেতর গিয়ে পরকালের চিন্তা করুন, কাজ হবে; আপনাদের মন্ত্র-তন্ত্র আপনাদেরই থাক। আমাদের সংসারী লোকের ওসব কিছুরই প্রয়োজন নেই জানবেন। আপনাদের কাছে আমার শুধু এই নিবেদন যে, দয়া করে আমার নাতিটিকে ক্ষেপাবেন না।

বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী একেবারে নাছোড়বান্দা। বললেন, দেখুন, বহুদূর থেকে আপনার বদান্যতার কথা শুনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আপনি নিজেই বলেছেন, আমরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। আমাদের সঙ্গে কি আপনাদের মতো মহানুভব ব্যক্তির এরকম ব্যবহার করা কর্তব্য?

বুঝলাম এর পর দাদামশাই একেবারে মরিয়া হয়ে উঠবেন। তাই, সন্ন্যাসী-দুজনকে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে এলাম। বললাম, দেখুন সন্ন্যাসীঠাকুর, আমাদের মতো সংসারী লোকেরা আপনাদের মন্ত্রে-তন্ত্রে কি উপকার পেতে পারে, সেই কথাটা সাদা কথায় বলুন দেখি, আমি যেমন করেই হোক দাদামশাইকে রাজি করিয়ে দিচ্ছি...

সন্ন্যাসীঠাকুর এবার বোধহয় আমার কথা শুনে খুশি হলেন। বললেন, দেখুন, আমি তো সেই কাজের কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বুড়ো কর্তা হঠাৎ এমন রেগে উঠলেন যে...

আমি বললাম, বুঝতেই তো পাচ্ছেন, ওঁর একটু বয়েস হয়েছে! তাই, মেজাজটাও হয়েছে খিটখিটে। সময়মতো ওঁকে আমি শান্ত করে রাজি করিয়ে নেব'খন। এখন কাজের কথাটা আমায় বলুন দেখি—

বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, আমাদের মোহান্তমহারাজ স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এইরকম একটি সংবাদই পাব আশা করেছিলাম। তাই, খবরটা শুনে যেন আমি ভারী উল্লসিত হয়ে উঠেছি, এইরকম মুখের ভাব দেখিয়ে বললাম, একি আপনি সত্যি বলছেন, সন্ন্যাসীঠাকুর? আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মুখখানায় যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে সন্ন্যাসীঠাকুর জবাব দিলেন, এ প্রক্রিয়া বড়ই কঠিন! তার পূর্বে আপনাকে অনেকগুলি ক্রিয়াকর্মের ভেতর দিয়ে অনেক-কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে।

আমি বললাম, দেখুন, স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে যদি রৌপ্যমুদ্রা হয়, তবে কি আসল-কাজের কোনোরকম বিঘ্ন হবে?

সন্ন্যাসীঠাকুর মুখে একটি প্রশান্ত ভাব এনে বললেন, দেখুন, রৌপ্যমুদ্রায় খাদ মেশানো থাকে। তন্ত্র-সাধনায় মেকির স্থান নেই। স্বর্ণমুদ্রা হলে সবদিক দিয়ে সুবিধে। অনুষ্ঠানেও কোনো ত্রুটি থাকবে না, আর সঙ্গে সঙ্গে লাভের অঙ্কটাও হবে অনেক বেশি। আপনারা সংসারী-লোক, অর্থে আপনাদের কত প্রয়োজন! লোকের মুখে অন্ন যোগাবেন—তাতে তো অর্থেরই দরকার সকলের আগে!

আমি তখন সন্ন্যাসীঠাকুরকে বললাম, দেখুন, আমি আপনাদের সব কথাই বুঝতে পেরেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। যদি বুঝতে পারি, মন্ত্র-তন্ত্রের সত্যিই শক্তি আছে—স্বর্ণমুদ্রার অভাব হবে না।

বেশ, বেশ! আপনার কথায় বড় প্রীত হলাম। এই বলে সন্ন্যাসীঠাকুর আমায় আশীর্বাদ করে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন।

এইবার আমায় একটি শক্ত কাজ করতে হবে। দাদামশায়ের অনুমতি চাই।

আমি জানি, অনুমতি আমি পাবই।...কারণ? কারণ আপনারা জানেন বৈকি! আমার দাদামশায়ের একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে আমি।...হাসছেন আপনারা? কিন্তু সত্যি বলছি আপনাদের, সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেয়ে গেলাম।

তারপর...

তারপর রওনা হলাম সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। ভবিষ্যতে বিপুল আশা আছে বলে সন্ন্যাসী-দুজন আমায় খুব খাতির-যত্ন করেই নিয়ে চললেন। একমাত্র গেরুয়া ছাড়া আর কিছুতেই এঁদের সন্ন্যাসীর লক্ষণ দেখতে পেলাম না। চলেছি আমরা দ্বিতীয়-শ্রেণির গাড়িতে। পথে রাজভোগের আয়োজনও যথেষ্ট। আর মজার কথা এই যে, সন্ন্যাসীরা দু-হাতে টাকা খরচ কচ্ছেন। বলা বাহুল্য, মন্দিরের অতিথি-হিসেবে আমার খরচও তাঁরাই দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি কচ্ছি না।

পাণ্ডুয়া ঘাটে আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নামালেন এবং এরপর শুরু হল আমাদের দুর্গম-যাত্রা! গরুর গাড়িতে গোটা দু-দিনের পথ। প্রথমে মাঠ-ময়দান, তারপর পল্লী-অঞ্চল ছাড়িয়ে শুরু হল পার্বত্য পথ। কিছু কিছু বনও আমাদের অতিক্রম করে যেতে হল।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম, লোক-চক্ষুর অন্তরালে ছোট-ছোট কয়েকটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক মন্দির—বহুদিনের জীর্ণ, একদিকে খানিকটা অংশ একেবারে ধসে পড়েছে।

বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে, এর ভেতর একদল সন্ন্যাসী বাস করেন এবং তাঁদের সঙ্গে লোকালয়ের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

এঁরা পাণ্ডুয়া-ঘাট পর্যন্ত এসে সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। এঁদের প্রত্যেকের ব্যবহার এত অমায়িক যে, মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। এক এক সময়

মনে হয়, এঁদের দলে মিশে গেলে মন্দ হয় না।

মূল মন্দিরটি মৃদু দীপালোকে নিষ্প্রভ, মাঝখানে কালভৈরবের মূর্তি। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি পাথরের তাক, তার ওপর হস্ত-লিখিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও তালপাতার পুঁথি।

ওখানে গিয়ে একটি জিনিস আমি দেখলাম যে, দ্বিতীয় কোনো সংসারী-লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল না। সবাই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, আর তাঁদের আদেশ পালন করবার জন্যে জনকয়েক নিম্নশ্রেণির লোক।

এখন কথা কই কার সঙ্গে? সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করবার সৎ-সাহস নেই, সদাই ভয়, নিজের অজ্ঞাতে কখন কি বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে! তাহলে উপায়?...জয় মা কালী বলে একদিন এক চাকরকে জিগ্যেস করে ফেললাম, হ্যাঁরে! এখানে সন্ন্যাসী ছাড়া ভদ্রলোক...বাবুলোক কেউ আছেন?

পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ সাপের মাথায় পা দিলে লোকে যেমন করে আঁৎকে ওঠে, ঠিক সেই রকম মুখের ভাব করে চাকরটা বললে, আমি ওসব জানিনে বাবু...আপনি সন্ন্যাসী বাবাদের কাছে জিগ্যেস কর।

সেইদিন সন্ধেবেলা—যে সন্ন্যাসীঠাকুর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, তাঁকে জিগ্যেস করলাম, দেখুন সন্ন্যাসীঠাকুর, আপনাদের এখানে ভক্তের দল, কিংবা যাঁরা আপনাদের মঠে সাহায্য দেন, তাঁরা কেউ আসেন না?

সন্ন্যাসীঠাকুর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আসেন বৈকি! প্রায়ই আসেন। এই তো সেদিন বিষ্ণুপুরের রাজা এসেছিলেন; আমাদের একটি নতুন গবেষণাগার তৈরি করবার জন্যে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গিয়েছেন। তারপর এসেছিলেন জব্বলপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী—মলেহর বড়বে। তিনি হোম করবার শ্বেতপাথর ও কৃষ্ণপাথরের বেদি তৈরি করার সমস্ত ব্যয় বহন করবেন, বলে গিয়েছেন। আপনাদের মতো দশজন মহানুভব ব্যক্তির দানের ওপরেই তো আমাদের এই মন্দিরের ক্রিয়াকর্ম, যাগযজ্ঞ, ধ্যানধারণা, সব চলছে।

বিষ্ণুপুরের রাজা...জব্বলপুরের ধনী ব্যবসায়ী...দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা....শ্বেত কৃষ্ণ-পাথরের বেদি নির্মাণের যাবতীয় অর্থ দান!...শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে এরা একটা অনর্থ বাধাবেই দেখছি। নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে শিউরে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললাম, বেশ, বেশ! তা আমাকে আপনাদের মন্ত্রতন্ত্রের শক্তি কবে প্রত্যক্ষ করাবেন, সত্যি করে বলুন তো!

স্বামীজী জবাব দিলেন না, শুধু মৃদু হাসলেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন, এতদূর কষ্ট করে এসেছেন যখন—তখন নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করবেন। আমি মোহান্তঠাকুরকে আপনার কথা নিবেদন করেছি।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। একা একা ঘুরে বেড়াই, বুনো-ফুল তুলে বোটানিক-গবেষণা করবার চেষ্টা করি, আর ঝরনার জল খেয়ে পেটের খিদে বাড়াই।

আর কিছু না হোক, এখানে খাওয়া-দাওয়ার ভারি সুবিধে। সব তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী কিনা; বলি দেবার জন্যে বহু পাঁটা পুষে রেখেছ। রোজই তাই থেকে কিছু-কিছু—তান্ত্রিক মতেই হোক, আর উদর পূরণের কারণেই হোক, বলি দেওয়া হয়। লুচি-পাঁটা কিংবা ঘিভাত-পাঁটা...এ তো লেগেই আছে। এ ছাড়া দুধ-দইয়েরও কোনো অভাব নেই। গোয়াল ভর্তি দুধোলো গাই—যত খুশি দুধ খাও। জনমানব-হীন অঞ্চলের মন্দির বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। কারণ, এখানে চাও পাওয়া যায় প্রত্যহ দু-বেলা। তবে, সন্ন্যাসীঠাকুরেরা সংসারের ধার ধারেন না, তাই নীর ত্যাগ করে ক্ষীর পছন্দ করেন বেশি। অর্থাৎ জলের মধ্যে চা না ভিজিয়ে—গরম দুধে চা ভিজিয়ে পান করে থাকেন। কাজেই, বলতে আপত্তি নেই যে, এই ক'দিনের ভেতরেই শরীরটা বেশ ভালো হয়েই উঠেছে!

সেদিন বিকেলের দিকে মন্দির থেকে বেরিয়ে আপনমনে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের অপর একটা অংশে চলে গেলাম। খেয়ালের বশে খানিকটা ওপরের দিকেই চলেছি।

হঠাৎ খানিকটা পরিষ্কার সমতল জায়গা দেখতে পেলাম—একটু কৌতূহল হল। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—একটা প্রকাণ্ড পাথর, ঠিক যেন প্রতিমার বেদি! মনে হল, নির্জন-জায়গা দেখে কেউ এখানে এসে ভজন সাধন করে।

কাছে গিয়ে দেখলাম—না, তা তো নয়, পাথরটার গায়ে কী যেন লেখা।...কোন-দেশি ভাষা কে জানে! হয়তো তিব্বতের কোনো লামা কি মন্ত্র লিখে রেখেছে। লেখাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখি—না, আমাদের বাঙলা ভাষাই বটে।

কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা। লেখার ধরন দেখে মনে হল, যিনি লিখেছেন, তিনি বৃদ্ধ, আর বহু পরিশ্রম করে তাঁকে এই কথাগুলো লিখতে হয়েছে। লেখাগুলো নীচে তুলে দিলাম :

> "লোভের শাস্তি আমাকে পাইতে হইবে। সন্ন্যাসীরা মোহর দ্বিগুণ করিবার লোভ দেখাইয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে। সঙ্গে আমার এক লক্ষ মোহর! মোহর ইতিমধ্যেই হাত-ছাড়া হইয়াছে। মনে হয়, শীঘ্রই জীবনও যাইবে। আমার এই লেখা পড়িয়া যদি কেহ সাবধান হইতে পারেন, কিংবা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তবেই পরিশ্রম সার্থক হইবে।
>
> **শ্রীতারিণীচরণ লাহিড়ী**
> (বনকুসুমপুর) নদীয়া।

তারিণীচরণ লাহিড়ী—নদীয়া...বনকুসুমপুর...

ঘণ্টায় বোধহয় হাজার-মাইল স্পিডের ঘুরপাক ঘুরতে লাগল এই মগজটার ভেতর—সমস্ত মাথাটা টনটন করে উঠল। রগ দুটো শক্ত করে দু-হাতে টিপে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে।

এই ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশ-সংবাদ খবরের কাগজে পড়েই মুক্তোরা নদীয়া রওনা হয়ে গিয়েছে।

অ্যাঁ! তবে কি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সন্ন্যাসীরা প্রাণে মেরে ফেলেছে? সন্ন্যাসীরা কি এতখানি নৃশংস হবে?

সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এখন মনে হচ্ছে, মন্দিরের অনেকগুলো ঘর তালা-চাবি বন্ধ দেখেছি। ঘর বললে সেগুলোকে ভুল বলা হয়। পাহাড়ের গুহায় দরজা-জানালা বানিয়ে সেগুলোকে ঘর তৈরি করা হয়েছে।

অনেকসময় দেখেছি বটে—সন্ন্যাসীরা যাচ্ছে আসছে, কিন্তু দরজা কখনও খুলে রাখেনি। তখন ভেবেছিলাম, সন্ন্যাসীমানুষ, বোধকরি, নির্জন-ঘরে গিয়ে ধ্যান-ধারণা করে—তা নয়...ভেতরে-ভেতরে এই কাণ্ড!

তখন দুটো সমস্যা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল।

প্রথম হচ্ছে এই যে, এইরকম ভাবে তারিণীচরণের মতো কত লোককে সন্ন্যাসীরা ভুলিয়ে এনে তাদের যথাসর্বস্ব হস্তগত করেছে! তাদের ওরা মেরে ফেলেছে, না বন্দী করে রেখেছে? বন্দী করে রাখলে তার দায়িত্ব তো বড় কম নয়!

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাকে নিয়ে ওরা কি করবে? অন্যান্য ধর্মভীরু অথচ লোভী-দলের লোকের মতো আমি তো মোহর সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি! কাজেই, বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না সোনার টাকা আনি, ততক্ষণ এরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবে বলেই মনে হয়।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই আমার চোখের পাতায় ঘুম এল না। আমার থাকবার জন্যে একটি ছোট্ট কুঠরি এরা ছেড়ে দিয়েছিল। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি পাথর—খাটের মতো করে পাতা। তার ওপর খড় বিছিয়ে তাতে পশুর ছাল পেতে বিছানা করে দিয়েছিল। এতদিন বিশেষ কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আজ যেন থেকে-থেকে গা-টা শিরশির করতে লাগল।

সেই পাথরটার ওপর বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। আমি এখানে একা মানুষ...ওদের বিরুদ্ধে গেলে মূর্খের মতোই কাজ করা হবে।

কিন্তু যাদের এনে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাদের একবার খোঁজ না নিলে মানুষ হিসাবে আমি অনেক খাটো হয়ে যাব। জীবনে আমার কোনো বন্ধন

নেই। প্রাণের ভয়ে আর ওই লোভী দস্যু-সন্ন্যাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব? তবে, এখানে এতদূর এলাম কি করতে? আবাস আর স্বাচ্ছন্দ্যই যদি জীবনের কাম্য ছিল, তবে কলকাতা কিংবা দাদামশায়ের স্নেহনীড় ছেড়ে চলে আসবার তো কোনো কারণ ছিল না!

না, ভীরু কাপুরুষ দুর্নাম আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

আকাশের এক কোণে ক্ষীণ একফালি চাঁদ নিঃশব্দে সারা মন্দির-প্রাঙ্গণ পাহারা দিচ্ছিল। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে চললাম।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর তালা-বন্ধ কতকগুলো কুঠরি নজরে পড়ল।

চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, সব নিথর-নিঝুম—জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই! শুধু মাথার উপর দিয়ে দুটো বাদুড় ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল। বাকি সমস্ত মন্দির-চত্বরটা যেন খাঁ খাঁ করে গিলতে আসছে।

সন্ন্যাসীর দল কোথায় উধাও হল, কে জানে!

তারা হয়তো আবার অন্য লোককে প্রলোভন দেখিয়ে সরিয়ে আনবার মতলবে আছে। যাই হোক, আমি আজ একবার ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখব যে সেই হতভাগ্যের দল বেঁচে আছে, না, সন্ন্যাসীর দল তাঁদের একেবারে শেষ করে ফেলেছে।

যদি সত্যি তাই হয়? এই শয়তান সন্ন্যাসীর দল যদি সত্যিই তাঁদের জীবনলীলার অবসান করে থাকে?...কথাটা ভাবতেই আমার গাটা কেমন শির শির করে উঠল। মানুষের ধর্মের গোঁড়ামি আর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা এমনি করে লোকের অর্থ লুণ্ঠন করে, তারাই আবার বাইরে সন্ন্যাসীর বেশ পরে জনসাধারণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি আদায় করে! ভারতের বুকে বহুদিন হতে এই যে পুঞ্জীভূত পাপ জমে রয়েছে, এর কি অবসান হবে না?

আমি যে সেদিন মুক্তোদের সঙ্গে যাইনি এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় এখানে একা একা চলে এসেছি, সে কথা মনে করে আমার নিজেরই ভারী ভালো লাগতে লাগল।

মনে পড়ল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত বাণী ঃ

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় সে সহে—
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে!"

এই কবিতা কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সভায় আবৃত্তি করে পুরস্কার লাভ করেছি। কিন্তু আজ যেমন করে অন্তরে অন্তরে এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারলাম, সেদিন তার এক অংশেরও যথার্থ অর্থ বোধ করি বুঝতে পারিনি।

কবির বাণী মনে মনে আবৃত্তি করে আরও এগিয়ে চললাম।

ওই যে একটা কুঠরির ভিতর দিয়ে ক্ষীণ দীপালোক আসছে না? পা টিপে টিপে তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। না, কোনো সাড়া-শব্দ নেই! সেখানে যে কোনো মানুষ থাকে, তার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না। কে জানে, হয়তো কোনো সন্ন্যাসী সেখানে ঘুমিয়ে আছে...জেগে উঠলে আমার উদ্দেশ্যের পথে অনর্থক বিঘ্নেরই সৃষ্টি হবে। সেইজন্যে সে-জানলা থেকে সরে এসে আর একটা দরজার সামনে দাঁড়ালাম।

দরজায় কান পেতে শুনলাম, খুব ক্ষীণ নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। সে শব্দের ধরন দেখে মনে হল, ভদ্রলোক বয়সে বৃদ্ধ।

ঠুক-ঠুক করে দরজায় আঘাত করলাম। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বেশি জোরে শব্দ করলেও নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। তাই, ওখানে আর না দাঁড়িয়ে পাশের কুঠরির দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের ভেতর কোনো আলো নেই, কিন্তু জানলায় আধো-আলো আবছায়ায় একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে।

প্রথমটা আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তান্ত্রিকদের দলের কেউ নয় তো?

তারপর ইচ্ছে করেই একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ক্ষীণ চাঁদের আলোয় যতটুকু বোঝা যায়, তাতে মনে হল, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সন্ন্যাসীদের কেউ নন। অনেকটা আত্মসমাহিত ভাব। দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তাঁর মন অনেক দূরে চলে গেছে। কাজেই, তিনি আমাকে লক্ষ করেছেন বলে মনে হল না।

আমি তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে আবার জানলার কাছে দাঁড়ালাম।

সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি...কারও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। প্রায় পনেরো মিনিট পরে সেই ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ ফেরালেন। চুল, দাড়ি, গোঁফে মুখখানি একরকম ঢেকে আছে। চোখ দুটি কোটরগত হলেও যেমন উজ্জ্বল, তেমনি তীব্র!

হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠে বললেন, কী! তোমাকেও আবার ধরে এনেছে বুঝি? খবরদার, ওদের কথায় ভুলো না। তন্ত্র-টন্ত্র সব বাজে কথা। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মোহরগুলো কেড়ে নেওয়া! মোহরগুলো কিছুতেই ওদের হাতে দেবে না।

আমি ফিস ফিস করে বললাম, আপনাকে ধরে রেখেছে বুঝি?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ধরে রেখেছে। মোহরও কেড়ে নিয়েছে! তুমি আমার লেখা পড়নি? সেই বনের মধ্যে পাথরের ওপর লিখে এসেছি? শীগগির পালাও...

এইবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। জিগ্যেস করলাম, আপনিই তারিণীবাবু বুঝি?

ভদ্রলোক আবার খিল-খিল করে হেসে উঠে বললেন, সব জান দেখছি।...তুমিও কি এদের দলে নাকি? বয়স তো খুব কম দেখছি...

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, না-না, আমি ওদের দলে মোটেই নই। এখান থেকে পালাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে আমি আপনাদের ঘরের তালা খুলে দেব। আপনারা মুক্ত হবেন, আর কয়েকটা দিন চুপ-চাপ থাকুন। কোনোরকমে খবরটা যেন জানাজানি না হয়!

আরে, যাও যাও ছোকরা! ...নিজে পালিয়ে বাঁচ! দেখছি তুমি একটি আস্ত পাগল! বলে, শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর!...আপনি বাঁচ, বাপ-পিতামো'র নাম থাকবে। উনি করবেন আমাদের খালাস! এইসব জ্যান্তো ঠাকুরদের তুমি চেন? এরা কাঁচাখেকো দেবতা...হিঃ—হিঃ—হিঃ!!!

হঠাৎ বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। এরকম ছাড়া-ছাড়া উদাস গম্ভীর বিশ্রী বিকট-হাসি আমি জীবনে কখনও শুনিনি। শুধু আমি কেন, বোধহয় কেউ কখনও—

আর, দ্যাখ?

সভয়ে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

ওই যে ওদিককার ওই রক্ত-কূয়া, খবরদার ওদিকে যাবে না! এতদূর যখন এসে পড়েছ, তখন আর একটু এগুলোই কিস্তি-কাবার। ওখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে ওরা কি করবে জান? দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলাবে—নীচে ধূ ধূ আগুন জ্বালাবে—তারপর চারদিক থেকে মারবে খোঁচা—ত্রিশূলের! কালভৈরবের হাতের ধারাল ত্রিশূল—হিঃ-হিঃ-হি!!!

...আবার সেই বেয়াড়া হাসি! আর একবার এই হাসি শুনলেই নিশ্চয় আমার জ্ঞান লোপ হবে। যা বলবার এইবেলা বলে নি।...বললাম, আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, তাই এইসব কথা বলছেন। ওদের কবল থেকে আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি, আমায় বিশ্বাস করুন—

ঠিক এইসময় দু-পাশে যেন কার স্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি আমার ডাইনে আর বাঁয়ে দু-জন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি যে আপত্তিজনক একটা কিছু কচ্ছিলাম, সে সম্পর্কে কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে অতি বিনীতভাবে একজন বললেন, মোহান্তমহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। তন্ত্রের শক্তি আপনি দেখতে চেয়েছিলেন, আজ আপনি তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

ভেবে দেখলাম এক্ষেত্রে আপত্তি করে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া আমার কাছে তো মোহর নেই, কিসের ভয়?

সন্ন্যাসী দুজন আমায় সঙ্গে করে মোহান্তের ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। দরজায় একজন চাকর আর ভেতরে একটি কাঠের পালঙ্কে বসে মোহান্তমহারাজ।

মোহান্তমহারাজের চেহারাখানি বেশ নাদুসনুদুস—টকটকে রং, কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ, গলায় একগোছা বড়-বড় রুদ্রাক্ষের মালা; পরনে গেরুয়া, মাঝখানে সিঁথি-কাটা লম্বা-লম্বা চুলে নীচের দিকে জটা ধরেছে। আমাকে দেখে তাঁর বাঁশির মতো খাড়া-নাকের ডগাটি ঈষৎ কুঁচকে উঠল, তীব্র চোখ দুটো কী-কারণে যেন একটু মিটমিটে হয়ে এল—ইশারায় কাছে গিয়ে বসতে বলে বললেন, কেমন আছ?

ধীরে ধীরে বললাম, ভালোই আছি।

একটু বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, বেশ, বেশ। এসব দেবস্থানে এসে কেউ অসুখী থাকতে পারে না—হ্যাঁ, ভালো কথা, শুনলাম নাকি, তুমি তন্ত্রের শক্তি বিশ্বাস কর না? তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি! যাক, এমন কথাটি আর কোথাও বল না—লোকে ঠাট্টা করবে হে! এই বলে মোহান্তমহারাজ নিজেই একচোট হো-হো করে হেসে নিলেন। আশ্চর্য! লোকটা নিজেই নিজের কথা বলে আর অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দেয় না। বুঝলাম, মহারাজের চ্যালারা যত সহজ, ইনি তত নন—একেবারে বাস্তু-ঘুঘু।

হাসি থামিয়ে মহারাজ বললেন, বলি, তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু জান কি বাপু?...জান না। সেইটুকু স্বীকার করতে তো লজ্জা নেই!...না-না, লজ্জা পাবার কী আছে? ...ছেলেমানুষ...এই দ্যাখ!...

এ তো মহা বিপদ! লোকটা জোর করেই আমাকে বোকা বানাতে চায়!

গম্ভীরকণ্ঠে বললাম, বাজে কথা ছাড়ুন, কী দরকার বলুন।

আবার সেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মহারাজ-জী অভয় দেওয়ার মতো হাতখানা তুলে বললেন, অত উতলা হও না—দরকার একটা আছেই।

রেগে বললাম, চালাকি রাখুন, যদি কিছু না বলেন তো আমি চলে যাই।

আমার রুক্ষ কথা শুনে মহারাজ চমকে উঠে আমার দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, চুপ করে থাক অর্বাচীন।

এ রকম বিশ্রী হিংস্র-মূর্তি আমি জীবনেও দেখিনি। এ যে সদ্য নরপিশাচ! মুহূর্তের জন্য একটি অজানা ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল—লোকটা খুন করবে নাকি?

বজ্রকণ্ঠে মোহান্তমহারাজ বললেন, এদিকে সরে এস, যা বলি শোনো—তোমাকে শুনতেই হবে, নইলে এই ত্রিশূলের খোঁচায় তোমার মানবলীলা শেষ হবে জেনে রেখ। এই বলে তিনি হাঁটুর নীচে থেকে একটা হাতল-বিহীন ত্রিশূলের ফলা তুলে নিয়ে বললেন, একটা চিঠির বিনিময়ে আমি তোমার প্রাণটা ফিরে দিতে পারি—নেবে ফেরত তোমার প্রাণ?

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, চিঠি? কিসের চিঠি?

মুখে মৃদুহাসির রেখা টেনে মোহান্তমহারাজ বললেন, চিঠিখানা লিখবে তোমার দাদামশায়ের কাছে। বেশি নয়—হাজার ষাটেক মোহর নিয়ে এলেই হবে। তুমি শুধু তাঁকে এই কথা জানিয়ে দেবে যে, তন্ত্রের আশ্চর্য শক্তি তুমি নিজেই চোখে দেখেছ, অভিভূত হয়েছ এবং তার শক্তি অসাধারণ। ষাট-হাজার মোহরকে মোহান্তমহারাজ তিনগুণ করে দেবেন—এই সামান্য-কথাটাই তাঁকে শুধু তুমি চিঠিতে জানিয়ে দাও।

আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম, দেখুন, আপনি তিব্বত ফেরত মোহান্তই হোন আর শয়তানই হোন, চিঠি আমি কিছুতেই লিখব না। আমি বৃদ্ধ নই, ধর্মের গোঁড়ামি আমার নেই—অর্থের লোভ তো দূরের কথা।

মোহান্তমহারাজ এইবার একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, নাটকীয় বীরত্ব ভুলে গিয়ে এখন চটপট চিঠিখানা লিখে দাও তো! সময় আমার খুব বেশি নেই—

এমন সময় দরজার পাশে দাঁড়াল চাকরটা, আর হঠাৎ বলে উঠল, চিঠি লিখিসনি মণি! মোহান্তমহারাজের সময় আছে কি না এখখুনি জানা যাবে!

চাকরের মুখে এই কথা শোনার পর মোহান্তমহারাজ আর আমি একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

গলার স্বরটা অনেকটা মুক্তোর মতো—কিন্তু চেহারা দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই। আকুল-আগ্রহে জিগ্যেস করলাম, মুক্তো, তুই? কিন্তু এ কি তোর চেহারা? তুই এখানে এলি কি করে?

বিস্ময় বিহ্বলদৃষ্টিতে চেয়ে মোহান্তমহারাজ জিগ্যেস করলেন, কে তুই? তুই কি—শম্ভু নোস?

শম্ভু প্রণাম জানিয়ে বললে, মহারাজ, আপনার কাছে আমি শম্ভু। তবে আপনার আগের চাকর বোঁচাকে তার বাপের মরার খপরের ছুতোয় দেশে পাঠাতে আমার বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন তার পরিবর্তে আমি আপনার চাকর—শম্ভু।

মোহান্তমহারাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, বটে! এতদূর তোর সাহস? ছুঁচো হয়ে সিংহের গর্তে এসে ঢুকেছিস?

মুক্তো অর্থাৎ শম্ভু চাকর আর-একবার প্রণাম ঠুকে বলল, গর্তটা যে কার সেটা এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে মোহান্তমহারাজ! গজেন-দারোগার ওপর সব ভার দিয়েই এসেছিলাম। এখানকার পুলিশসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এসে সে পৌঁছে গেল বোধহয় এতক্ষণ—ওই যে বাইরে অনেক ভারী জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে! এইবার আপনার তন্ত্রের খেলটা একবার দেখিয়ে দিন না, বাবাঠাকুর!

এই যে দিই!...বলে ভণ্ড-তান্ত্রিক পাথরের দেয়ালে-ঝোলানো একটা মোটা দড়ি ধরে জোরে জোরে টানতেই বাইরে ঢং-ঢং-ঢং করে ভীষণ শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল।

আর সেই মুহূর্তেই ওদিকে ঝন-ঝনাৎ শব্দে চত্বরের বাইরে মন্দিরের ফটকও বন্ধ হয়ে গেল।

এবার নিরুপায় অবস্থাতেই গজেনদাকে সদলবলে ফটকের বাইরে আটকে থাকতে হবে।

ভাগ্যিস এখানে কিছুদিন চাকরি নিয়ে মুক্তো কতকগুলো গুপ্তপথের সন্ধান জেনে নিয়েছিল, তাই ইশারায় মণিকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলে, গজেনকে পথ দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে মুক্তো যেই সে-ঘরের দরজা ছেড়ে চলে গেল, অমনি পালঙ্ক থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে মণির ডান-হাতের কব্জিটা সজোরে চেপে ধরে মোহান্ত তাকে হিড়হিড় করে দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল। তারপর একটা ছোট শেকল ধরে টানতেই, পালঙ্ক-সমেত পাথরের দেয়ালটা—মোহান্ত আর মণিকে নিয়ে রিভলভিং স্টেজের মতো আস্তে আস্তে ঘুরে গেল।

সাত

এখানকার হুদ্দোর ইনস্পেক্টার সাহেব, একদল পুলিশ-কনেস্টবল আর গজেন মুক্তোর দেখানো গুপ্তপথ দিয়ে মোহান্তর ঘরের সামনে এসে ফাঁকা-ঘর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আসার পথে মুক্তোর মুখে মণির বর্তমান অবস্থার কথা শুনে খুব তাড়াতাড়ি ওরা এখানে এসে পড়েছিল। কিন্তু একি, ভেল্কি! এত শীগগির এরা উধাও হল কোথায়?

প্রায় কান্নার সুরেই মুক্তো বলে উঠল—মণি? গজেন-দা, মণি গেল কোথায়? ভণ্ড-তান্ত্রিক বেটা এবার নিশ্চয়ই মণিকে মেরে ফেলবে!

ডান-হাতের তর্জনীটা নিজের মুখে দিয়ে, ইঙ্গিতে মুক্তোকে চুপ করতে বলে, ইনস্পেক্টার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে গজেন-দারোগা বললে, মিস্টার চ্যাটার্জি, এবার তাহলে তদন্ত শুরু করা যাক, কেমন?

ইনস্পেক্টার সাহেব সম্মতি দিলেন।

গজেন-দারোগা প্যান্টের জেব থেকে 'টর্চ'টা বের করে সকলকে নিয়ে সেই ঘরের ভেতরে ঢুকল।

ঘরে ঢোকবার দরজা-ছাড়া চারদিকেই পাথর-ঘেরা উঁচু উঁচু পাঁচিল—মাথায় জমাট পাথরের প্রকাণ্ড ছাদ। আশ-পাশের ঘরের আলো এ-ঘরে ঢুকতে পারে এমন এতটুকু ছিদ্রও কোথাও দেখা গেল না।

সেই পাথরের গুহা-ঘরে কিছুক্ষণ তদন্ত করেও যখন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না, তখন বাইরে বেরিয়ে অন্যপথে সন্ধান করা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই ভেবে যেমন সকলে ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করছে, সেইসময় হঠাৎ দড়াম করে ঘরের দরজা-দুটো বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত ক্ষীণ-কণ্ঠের অস্ফুট অট্টহাসি!...দারোগা নিয়ে এসেছিস ভৈরবানন্দের দল ধরতে, অর্বাচীন? থাক ছুঁচোরা, চিরদিনের জন্য ওই ঘরে বন্দী হয়ে! ওইখানেই তোদের জীবন্ত সমাধি হোক! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

তারপর কিছুক্ষণ সব চুপ-চাপ।

সেই বন্ধ-ঘরের মসীমলিন স্তব্ধ-অন্ধকারে ওই না কার গোঙানোর শব্দ?...গজেন টর্চটা জ্বেলে দেখলে, মুক্তো। মুক্তো অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে! এসময় চাই একটু জল—ঠাণ্ডা জল।

ঘরে আর-একটা টর্চ জ্বেলে উঠল। ইনস্পেক্টার সাহেব মুখ-খোলা থার্মোফ্লাস্কটা এগিয়ে ধরলেন গজেনের দিকে। দু-চার-ঝাপটা ঠাণ্ডা জল চোখে-মুখে দেবার পর মুক্তোর জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু থার্মোফ্লাস্কটা ফিরিয়ে দেবার সময় সেটা সাহেবের হাত থেকে টিপ করে পড়ে গেল পাথরের মেঝেয়। পাথরের মেঝেয় কাচের বা লোহার জিনিস পড়ার শব্দ তো একরকম নয়। দারুণ সন্দেহে ইনস্পেক্টার-সাহেব ও গজেন-দারোগা দুজনেই একসঙ্গে সেখানে টর্চ ফেলে দেখলে, পাথরের সঙ্গে সমান মিলিয়ে রং-করা এক-চাবড়া তুলো ফ্লাস্কের জলে ভিজে গিয়ে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করছে।

এঁরা দুজন ও বন্দী-পুলিশের দল মহা উৎসাহে ব্যাপার দেখবার জন্যে সেইদিকে ঝুকে পড়ল। তারপর গজেন দু-হাতে সেই ভিজে-তুলোর চাঁইটা তুলতেই দেখতে পেলে, পায়ে চেপে ঘণ্টা বাজাবার মতো একটা মাথা-ওলা মস্ত পেরেকের মাথা তার নীচে দেখা যাচ্ছে। সে জিনিসটা কী পরীক্ষা করবার জন্যে খুব জোরে জুতোর গোড়ালি দিয়ে সেটাকে টিপে ধরতেই—জয় জগদীশ্বর! ঘরের সমস্ত লোকদের নিয়ে মেঝে-সমেত দেয়ালটা আস্তে-আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করল। যতটা ঘোরবার ঘুরে থামতেই সেখানে বন্ধ-দরজার কপাট-দুটো গেল অমনি খুলে।

আলো-অন্ধকারে-মেশা মাথা-চাপা দরদালানের মতো লম্বা সরু পথ। তার একপাশে ছাদ পর্যন্ত পাথরের পাঁচিল, আর-একপাশে সারি-সারি তালা-বন্ধ কুঠরি।

মুক্তোকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এ-পথ, বা এ-সব চোরা-কুঠরির সন্ধান সে কিছুই জানে না। তারপর অতি সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে সকলে এগিয়ে চলল—সবার আগে গজেন। সেই আধো-আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় দু-তিনটে কুঠরি পার হবার পর হঠাৎ গজেন থমকে থামল। পাশের কুঠরিতে যেন একটা আলো জ্বলছে—ক্ষীণ আলো! কনেস্টবলদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে ইনস্পেক্টার-সাহেবকে নিয়ে

গজেন দরজার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে, দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। বহুকালের পুরনো দরজা বলেই তার ফাঁকে-ফাঁকে ক্ষীণ আলোর মলিন-আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

তারপর বাইরে শেকল কিংবা তালা-চাবি লাগানো আছে কিনা হাতড়াতে গিয়ে গজেন শিউরে উঠল—সাপ না কি!

টপ করে একবার টর্চটা জ্বেলেই গজেন দেখে নিলে। না। দড়িই বটে। এ দড়ির নিশ্চয়ই একটা গুণ আছে—দেখাই যাক না!

দড়িটা ধরে নিঃশব্দে খুব আস্তে গজেন একটু করে টানে আর দরজার কপাট দুটো ভেতরদিকে দু-দিক দিয়ে আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। সেই ফাঁকে স্বল্প-দীপালোকে ইনস্পেক্টার সাহেব দেখে নিলেন, মাঝখানে রেলিং-এর বেড়া-দেওয়া ঘরখানা দু'ভাগে বিভক্ত। বাঁ-পাশের দেয়াল ঘেঁষে ছোটো একটা রেলিং-এর তালা-বন্ধ দরজা আর রেলিং-এর বাইরে ডানদিকের দেয়ালে একটি কালভৈরবের তৈলচিত্র। সামনে একটা থালায় একরাশ লাল জবাফুল, রক্ত-চন্দনের রেকাব, ঘট, মৃগচর্ম ও নানারকম পূজার উপকরণ—একপাশে পিলসুজের ওপর মিটমিট করে জ্বলছে একটা প্রদীপ আর তার পেছনে ধ্যানমগ্ন ত্রিপুণ্ড্রকধারী তান্ত্রিকসিদ্ধ এক সাধু—যেন যকের ধনের প্রহরায় নিযুক্ত প্রাণহীন নির্বাক পাথরের স্ট্যাচু!

আস্তে-আস্তে পিছিয়ে এসে, একটা কনেস্টবলের মাথার পাগড়ি নিয়ে আর নিজেদের পায়ের জুতো খুলে রেখে ইনস্পেক্টার-সাহেব আর গজেন-দারোগা আবার সেই ঘরে এসে ঢুকল। তারপর নিঃশব্দে এক-পা, দু-পা করে এগিয়ে গিয়েই পাগড়ির কাপড় দিয়ে পেছন থেকে একেবারে পিছমোড়া করে ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে বেঁধে ফেললে।

অতি প্রত্যূষে ফুলবাগানে রক্তপিঁপড়ের দংশন সহ্য করেও কালভৈরবের পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে নিজের হাতে ফুল তুলতে মুক্তো একে অনেকবার দেখেছে। ভৈরবানন্দ মোহান্তর সবার বড় চ্যালা—একে মুক্তো চেনে।

বন্দী-সাধুর নাকের ডগায় রিভলভার উঁচিয়ে গজেন-দারোগা বললে, তোদের চাঁই-এর ঘরে আমাদের যে ছোকরা ছিল, তার নাম, মণি। বল তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

কিছুমাত্রর ভয় না পেয়ে রক্তচক্ষু করে ভণ্ড-তান্ত্রিক জবাব দিলে, জানি না।

রেলিং-এর ভেতর যে ওইসব পাথরের সিন্দুকের সারি—ওতে কি আছে?

আমার বাঁধন খুলে দিলে হয়তো বলতে পারি।

গজেন-দারোগা রিভলভারটি তার নাকে ঠেকিয়ে বলল, এখনও যমালয়ের অন্তরালে আছিস, শীগগির না বললে, পর্দা সরিয়ে তোকে ভেতরে ঠেলে দেব।

মুখখানাকে বিকৃত করে ভণ্ড বললে, অত সোজা নয়! আমি হয়তো মরে যাব,

কিন্তু গুলির শব্দ কানে গেলে স্বামীজী তোমাদের কচু-কাটা করবেন, এটা মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে সকলেই একটু সচকিত হয়ে উঠল—তাই তো, ভণ্ড বলেছে ঠিক।

রিভলভারটা চামড়ার খাপে পুরে রেখে, গজেন-দারোগা বললে, ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, তোকে আমরা প্রাণে মারব না, বরং আমার কথার ঠিক-ঠিক জবাব দিল তোকে বড়লোক করে দেব।

চ্যালা-সাধু বললে, কেমন করে?

গজেন বললে, এতদিন ডাকাতি করে তোরা যেসব মোহর লুট করেছিস, সে-সব রেখেছিস কোথায়? ওই সিন্দুকের মধ্যে?

মোহান্তর চ্যালা বললে, বলেছি তো বাঁধন খুললে বলব। ভয় নেই, আমি পালাব না। উঃ, লাগছে বড়। দাও না একবার খুলে! না, থাক, বলছি শোনো—শুনলেও তোমরা কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। সে কি অল্প-স্বল্প? তোমাদের বাহান্ন-পুরুষ বসে খেলেও তার সিকি ফুরোবে না। আমাকে বড়লোক করবে? আ-রে নির্বোধ! আমি আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত গুপ্তধনের সন্ধান তোমায় বলে দিয়ে তাই থেকে কিছু পাব, আর বড়লোক হব? বুদ্ধির বেস্পতি!

আর দেরি করা চলে না। এখন প্রধান কর্তব্য আমাদের, মণিকে উদ্ধার করা—মণি! মণি! বলে মুন্তো একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

মুন্তোর কথা শুনে চ্যালা-মহারাজ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, মণির আশা ছাড়, বন্ধু! মণি আর তোমাদের নেই, তার বদলে ওইসব পাথরের সিন্দুকে অনেক মানিক আছে, পারো তো নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও!

এতক্ষণে ইনস্পেক্টার-সাহেব কথা কইলেন, বললেন, গজেনবাবু, ওই সিন্দুকগুলোর মধ্যে যে মোহর আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি দু-চারজন কনেস্টবল নিয়ে এখানে থাকি, বাকি সবাইকে নিয়ে আপনি চত্বরের চারিদিকে একবার তদন্ত করে আসুন।

অল-রাইট! বলে, মুন্তো ও জনকয়েক সেপাই নিয়ে গজেন-দারোগা বেরিয়ে পড়ল।

আট

দর-দালান শেষ হতে আরো-খানিকটা সরু পথ বাকি। সেই প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে খানিকটা এগুবার পরই একটা অর্ধেক-খোলা দরজার কাছে সবাই প্রচুর আলো দেখতে পেলে। গজেন বুঝতে পারলে, তাড়াতাড়ি পালাবার সময় এ-দরজাটা তারা আর বন্ধ করে যায়নি। অথবা কস্মিনকালেও কেউ এ-পথের সন্ধান পাবে না জেনে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়েই দরজা খুলে রেখে গেছে তারা।

দরজা পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়েই মুন্তো হঠাৎ সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল। ...গজেন-দা, এই দ্যাখো! বলেই কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে গজেন-দারোগাকে দেখালে। একটা চামড়ার ব্যান্ডযুক্ত রিস্ট-ওয়াচ। ঘড়িটার উল্টো পিঠে এন্‌গ্রেভ করা রয়েছে, M. Banerjee.

জয়-দুর্গা! তারা এই পথেই গেছে। তখন সকলেই দ্রুত পা চালিয়ে দিলে। তাদের অগ্রণী—মুন্তো। কিছুক্ষণ সমতলভূমির ওপর চলার পর একটা ছোট পাহাড়ের চড়াই। চড়াইয়ে উঠে উৎরাই-এ নামবার আগেই সকলে দেখল, সেই পাহাড়তলির নীচে এক ঝরনা-ঝরা স্বচ্ছতোয়া খরস্রোতা নদী। আস্তে আস্তে উৎরাই থেকে নেমে, নদীর কিনারা দিয়ে তারা দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করলে। এইভাবে মিনিট পনেরো চলার পর প্রায় দেড়-তলা উঁচু একটা পাহাড়ের পাঁচিলের ধারে সবাই উপস্থিত হল। প্রায় দু-মাইল লম্বা পাঁচিল, তার তিন পাশে কি আছে সেখান থেকে দেখা যায় না। ভগবান সহায় থাকলে, মানুষে কি অনিষ্ট করতে পারে? পাঁচিলের দরজা খোলা। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে একসঙ্গে সকলেই ঢুকে পড়ল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছে!

সকলেই দ্রুত চলেছে। হঠাৎ পেছন থেকে একটা করুণ আহ্বান ভেসে এল—মুন্তো? গজেন-দা?...

পেছন ফিরেই মুন্তো দেখলে...একি। মণি? তোর এই দশা, ভাই? বলেই মুন্তো ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। একটা গাছের গুঁড়িতে মণির সাষ্টাঙ্গ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

গজেন-দারোগা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছুরি বের করে মণির বাঁধনগুলো সব কেটে দিয়ে তাকে কোলে করে নামিয়ে নিলে। তারপর শুশ্রূষার জন্যে দুজন কনেস্টবল সেখানে রেখে আবার দ্রুত এগিয়ে যাবে, এমন সময় মণি বললে, ওদিকে নয়, এই পুব-দিকে ওদের আস্তানা।

মণির কথামতো সকলেই তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পুবের দিকেই ছুটল। শুধু মুন্তো, মণিকে ছেড়ে যেতে চাইলে না।

সেই পাঁচিল-ঘেরা পাহাড়ের মাঝে যেখানে যত চোরা-গুপ্তি, গুহা, কুঠরি, ঝোপ-জঙ্গল ছিল, তন্নতন্ন করে—পাতি-পাতি করে খুঁজেও ভন্তবিটেল-মোহান্তর তল্লাশ পাওয়া গেল না। যদি-বা দূরে দু-একজন বাচ্চা-সাধুকে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে দেখা গেল, কিন্তু ধাড়ি-সন্ন্যাসীর পাত্তাই নাই। তাছাড়া তাকে চেনেই-বা কে? আবার গজেন-দারোগা মুন্তোর কাছে ফিরে এল।

মুন্তোকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর যাবার পর একটা কূয়ার ভেতর থেকে একজন সাধুকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারতে দেখে গজেন-দারোগা জিগ্যেস করল, ওই সাধুটাকে চিনিস, মুন্তো?

আর-একবার মুখ তুললেই বলতে পারব—বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই মুস্তো চেঁচিয়ে উঠল, ওই বেটাই ভৈরবানন্দস্বামী, এই নষ্ট-দলের ইষ্টিগুরু—এই হারামজাদাই খোদ-মোহান্ত।

সকলেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কূয়ার কাছে উপস্থিত হল। সেই অন্ধকূপের ভেতর—ওপর-থেকে মুখ বাড়িয়ে একরাশ অন্ধকার ছাড়া গজেন আর কিছুই দেখতে পেলে না।

কূয়ার গা-ঘেঁষে আপনমনে ছুটে চলেছে সেই বিস্তীর্ণ খরস্রোতা নদী। মুস্তোকে নিয়ে গজেন নদীর কিনারায় গিয়ে দেখলে, জাহাজের মাথায় হাওয়া ঢোকবার জন্যে যেমন মুখ বাঁকানো নল থাকে, সেইরকম মস্ত-বড় একটা দক্ষিণ-মুখো বাঁকা নল নদীর জলের প্রায় দু-হাত ওপরে জেগে আছে আর নদীর কিনারে, বাঁ-দিকের পাথরে একটা লম্বা সরু ছিপ বাঁধা আছে।

নদীগর্ভে এই নলের তলায় নিশ্চয়ই কোনো গুপ্তগৃহ আছে। একসঙ্গে গজেন আর মুস্তোর মনে সেই নল-তত্ত্ব আবিষ্কার করবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

আর দেরি না করে, ছিপের ওপর উঠে বাঁধন খুলে দিতেই স্রোতের মুখে ছিপটি তরতর করে ছুটে চলল। নলের কাছাকাছি পৌঁছুতেই ছিপের কাছি-দড়ির একটা ফাঁস সেই নলের গলায় গজেন পরিয়ে দিলে। তারপর শক্ত করে নলের সঙ্গে ছিপটি বেঁধে ফেললে।

এ নলের ভেতর হাওয়া-যাওয়া ছাড়া এতে অন্য কোনো কাজ হতে পারে বলে গজেনের মনে হল না। তখন তারা দুজনে প্রাণপণে সেই নলটা ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগল।

যে-কূয়া দিয়ে নেমে মোহান্ত আত্মগোপন করলে, তার তলায় নদীর গা-ঘেঁষে একটা চারিদিক-বন্ধ প্রকাণ্ড গুহা। তার একটি মাত্র দরজা। সেটাও আবার গুহার বাইরে-থেকে শেকল-আঁটা। গুহা-ঘরের ছাদের পাথরের ঠিক নীচেই হাওয়া ঢোকবার জন্যে দুটো বড়-বড় আলগা লোহার জালি-কাটা ছিদ্র আছে। গুহার ভেতর মানুষ থাকলে সেই ছিদ্র-পথের বাতাসে নিশ্বাস নেবে।

অতিভয়ে ভীত মোহান্ত হাঁপাতে-হাঁপাতে কেবলই চারদিকে নিষ্ফল তাকাচ্ছিল। হঠাৎ এক-ঝলক জলের ঝাপটা এসে তার জটা ও গেরুয়া ভিজিয়ে দিলে। ভৈরবানন্দ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিল না, বাইরের সঙ্কেত-ঘণ্টার দড়ি টানবে কিনা। শব্দে যদি পুলিশগুলো এসে পড়ে? গুহার কোণে জড়-করা কতকগুলো ছোটো পাথর পর-পর সাজিয়ে আর একখানা পাথর নিয়ে রন্ধ্র-পথের নাগাল পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে—এমন সময় ছপাৎ করে এক-ঝলক জলের ঝাপটা—আবার আবার! এবারে জল তোড়ে পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

আর পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই তার জীবন্ত সলিল-সমাধি হয়ে যাবে।...ওই লোহার জালি খসে পড়ল! পাগলা হাতির মতো জলের বেগ! তাকে রুখবে কে? নীচে জল জমতে শুরু হয়েছে! ক্রমে এক-হাঁটু—তারপর কোমর! তারপর বুক!...কালভৈরব!

এতদিন তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে এই সিদ্ধি-লাভ করলুম, ত্র্যম্বকেশ্বর! এবার ওপর থেকে গোমুখীর জলপ্রপাতের মতো ভীষণ শব্দে নেমে আসছে জলের তোড়!...

মোহান্ত জোরে জোরে সঙ্কেত-ঘণ্টার দড়ি টানতে লাগল! বাইরের গুপ্ত-গুহা থেকে বেরিয়ে সাধুরা ছুটে গেল তাদের স্বামীজীর বিপদের বার্তা বুঝে। বাইরের দরজার শেকল খুলে দেবার সঙ্কেত। প্রায় পাঁচজন সন্ন্যাসীর প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যদি বা দরজা খুলল—হঠাৎ যেন একটা প্রলয়ের প্লাবন এসে স্রোতে কুটো ভেসে-যাওয়ার মতো একসঙ্গে সব সাধুকেই পাথরের ওপর আছড়াতে আছড়াতে উল্টে-পাল্টে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, কে জানে! গুহার ভেতরে ভৈরবানন্দ জলে ডুবে খাবি খাচ্ছে! এক-একবার পাথরের দেয়ালের এক-একটি ধাক্কায় হাড়-গোড় তার ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। টিপ করে এবার ঠুকে গেল তার মাথাটা! কেউ সেখানে থাকলে দেখতে পেত, সেখানকার খানিকটা জল কেমন রক্ত-রাঙা হয়ে উঠল! পাপের সাজা ভোগ করতেই হবে। এদিকে বাইরে ছিপের ওপর দাঁড়িয়ে গজেন আর মুক্তো দেখতে পেলে, একে-একে সব সাধুর মৃতদেহই ভেসে চলেছে। সব-শেষে ভৈরবানন্দস্বামীর মৃতদেহ। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের উত্তর দিকটা জলে-জলাকার হয়ে গেল। এখন আশার কথা এই যে, এর দু-মাইল দক্ষিণে ভৈরবানন্দের সারা মন্দির-চত্বরটাই পাহাড়ের চড়াই-এর ওপর খুব নিরাপদেই বেঁচে যাবে। আর মণি ও এখানকার পুলিশদল এতক্ষণ নির্বিঘ্নেই মন্দিরে পৌঁছে গেছে।

মুক্তোর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, চুনি-পান্নার কথা। তাদের কি হল? গজেন ইনস্পেক্টার-সাহেবকে তাদের কথা শুধোতে তিনি বললেন, সে-সব কথা গুছিয়ে বলবার সময় এখন নেই! শুধু এইটুকু জেনে রাখ, 'ফেরিওলা পান্না' আর 'সাধুবাবা চুনি'—দু-জনকেই বিশেষ কারণে অপরাধী হয়ে থানায় আমার কাছে হাজির হতে হয়েছিল। তারপর তাদের অপরাধের লঘুত্ব প্রমাণ করিয়ে দিয়ে, ইনস্পেক্টার-সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাদের আমি খালাস করিয়ে দিয়েছি। শুধু খালাস কেন, সেই দিনই তাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কথাটা শুনে মুক্তো একটা আরামের নিশ্বাস ফেললে। কিন্তু জলের টানে ছিপ যে আর রাখা যায় না! অতি কষ্টে ওপারে গিয়ে এরা ছিপ বেঁধে ফেললে। তারপর পায়ে চলার পথ ধরে দ্রুত চলে এসে মন্দির-চত্বরে পৌঁছে দেখল, মণি আকুল-আগ্রহে তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। মণিকে দেখেই মুক্তো চিৎকার করে উঠল, কাজ ফতে মণি!

সে-কথা শুনে গজেন-দারোগা বললে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ভণ্ডটাকে জ্যান্তো ধরতে পারলুম না। তারপর সকলে একসঙ্গে চড়াই-এর ওপর উঠে সমস্ত উত্তর দিকটায় কেবল জল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলে না। যেদিকে চায়, সেইদিকেই শুধু জল আর জল!

বিজয়-অভিযান



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



পেছনে একটা বিকট অট্টহাসি জেগে উঠলো.....

বিজয়-অভিযান

এক

সেবার পুজোর ছুটি আসবার একমাস আগে থেকেই পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলের ছেলেরা রীতিমতো ষড়যন্ত্র করে চেষ্টায় ছিলো, যাতে বিনয়কে তারা পুজোর ছুটির সময় আটকে রাখতে পারে। কারণ, এবার তার ঘটা করে পুজো করবে এবং বিনয় না থাকলে তাদের কোনো উৎসব বা আয়োজনই যে সার্থক হবে না, তা তারা ভালো করেই জানতো।

কিন্তু তারা জানতো, আকাশে বর্ষার মেঘ কেটে গিয়ে যেই শরতের বকের পাখার মতো সাদা মেঘ একটু একটু করে দেখা দিতো, অমনি বিনয়ের মন উড়ু উড়ু করতো। প্রতিদিন তখন সে শুতে-বসতে-উঠতে বলতো, উঃ কি nasty এই শহরটা!

তার মনকে টানতো তখন সমুদ্র, পর্বত, জঙ্গল...যেখানে মাথার ওপরে চাইলেই চোখে পড়ে, মার স্নেহের মতো উদার আর স্বচ্ছ নীল আকাশ। আকাশের সে নীল রঙ কি কলকাতায় দেখা যায়! তার জীবনের প্রত্যেক শরতের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো-না-কোনো দূর পার্বত্য-নগর বা বন্য-পল্লীর স্মৃতি বিজড়িত আছেই। সে বলতো, ও হল তার বাৎসরিক তীর্থ-যাত্রা।

সারা বছরের মধ্যে শরতের সেই কটা দিন যেন তার কাছে স্বর্গের পারিজাতের সৌরভ বহন করে নিয়ে আসতো.....পড়াশুনা, খেলা-ধূলা, লোকজন, অদূর ভবিষ্যতে সিভিলিয়ান হবার আশা, সমস্ত থেকে দূরে, সেই কটা দিন যেন তার মন একলা পাহাড়ের বুনো-পথে ঘুরে ঘুরে, প্রভাতে অরণি-সুরভি-স্নিগ্ধ বাতাসে বাতাসে, নির্জন নদী-সৈকতে, আলো-ঝিকমিক অজানা সমুদ্রতটে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর-সন্ধান পেতো...ফিরে এসে বলতো, দেহমন মধুময় হয়ে আছে!

ক্রমশ ছুটির দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে, সন্ধ্যা হলেই হোস্টেলের সান্ধ্য-মজলিসে আসন্ন পুজোর উৎসবের সব ফর্দ হয়, বিনয় সেসব আলোচনা এড়িয়ে চলে, কিন্তু সহপাঠীর দল ততই সচেষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ, বিনয়কে নইলে তাদের চলবে না। বিনয় যে শুধু তাদের ক্লাসে তাদের সকলের আগে থাকে, তা নয়, ...খেলার মাঠে, শয্যাপার্শ্বে, বিনয় সব সময়ে সহপাঠীদের আগেই আছে। সে আছে বলে হোস্টেলের জীবনের একঘেয়েমি কারুর মনেই লাগতো না....হাসাতেও যেমন, কাঁদাতেও তেমন, ভালোবাসতে ও বাসাতেও তেমনি।

প্রতিমার ডিজাইন কিরকম হবে, তাই নিয়ে বন্ধুরা বিনয়কে ধরে বসল। বিনয়

কিন্তু তাদের ফাঁদে পা ফেলতে একান্তই নারাজ। বলে, আমি যখন থাকতে পারবো না, তখন আর মিথ্যে আমাকে এ নিয়ে ভাবাচ্ছো কেন?

ক্রমশ ছেলেরা বুঝলো যে, বিনয়কে ধরে রাখা যাবে না। হতাশ হয়ে তখন একজন জিজ্ঞাসা করল,—এবার তাহলে কোথায় বিজয়-অভিযানে বেরুচ্ছো?

বিজয়-অভিযান কথাটা বিনয় নিজেই ব্যবহার করতো। ছুটির সময় বাইরে গেলেই সে বলতো, বিজয়-অভিযানে যাচ্ছি।

শরৎকালে একদা আমাদের দেশের রাজারা বিজয়-অভিযানে বেরুতেন, সে-কথা উল্লেখ করেই বিনয় বলতো, আমি আমাদের দেশের সেইসব বড় বড় পুরোনো রাজাদের ধারাই বজায় রাখছি!

কোথায় যে এবার বিজয়-অভিযানে যাবে, তার কথা বিনয় কাউকে বলেনি। শুধু বলতো, বাড়ির কাছে একটা জায়গায় যাওয়া হয়নি, এবার সে-ত্রুটি সংশোধন করবো।

ছেলেরা প্রফেসরদের নিয়ে গভীরতর ষড়যন্ত্র করতে লাগল। কিন্তু ছুটির কয়েকদিন আগে একটা প্রভাতে দেখা গেল যে, বিনয়ের বেড শূন্য। সেখানে একটি চিঠি রয়েছে, তাতে লেখা আছে শুধু—তোমাদের উৎসবের সাফল্য কামনা করি—Running towards Ranchi!

দুই

পুজোর সময় রাঁচিতে মিঃ রায়ের বাড়িতে প্রত্যেক বছর যেমন হওয়া-খোর বাঙালি-ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় হয়, এ-বছরের হুল্লোড়টা যেন আরো বেশি জমে উঠেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মিসেস্ রায় একটা টি-পার্টির আয়োজন করেছিলেন, পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়েদের বাড়িতে তিনি নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই।

তাঁরা রাঁচির স্থায়ী বাসিন্দা। একটি বছর তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, কখন পুজোর ছুটির দিন আসবে। যেচে সকলের সঙ্গে আলাপ করে তিনি স্বাস্থ্যকামী নবাগতের দলকে তাঁর বাড়িতে টেনে আনতেন, পুত্র-কন্যার সৌভাগ্য থেকে ভগবান তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন, পুজোর সেই কটা দিন তাই পরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হুল্লোড় করে তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা তিনি কথঞ্চিৎ নিবারণ করতেন! এমনিভাবে কত অজানা ছেলে, কত অজানা মেয়ে, প্রবাসের সেই কটা দিনের মধ্যে, শরতের ভোরের আলোর মতো স্বচ্ছ তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে, চিরকালের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যেতো। ছুটির দিন শেষ হয়ে গেলে, ক্ষণিকের প্রবাস ফুরিয়ে গেলে,

তারা যখন রাঁচি থেকে বিদায় নিতো, তখন সত্যিই রাঁচির অন্তরলক্ষ্মী-স্বরূপা সেই নারীর জন্যে তাদের মন কাঁদতো এবং জীবনের আবর্তে তারা যেখানেই থাকুক না কেন, মিসেস্ রায়ের সঙ্গে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান তাদের কখনই বন্ধ হত না। এইভাবে একটি দল গড়ে উঠেছিল, যারা পুজোর সময় যেখানেই থাকুক না, টাইম্-টেবল-এর পাতা খুলে আগে রাঁচির তলায় লাল কালির দাগ বসাতো। কেউ তাঁকে ডাকতো মা, কেউ বলতো মাসিমা, মেয়েরা আদর করে ডাকতো, মা-মণি।

এখানে আর-একটি লোকের পরিচয় দিয়ে রাখা দরকার। তিনি হলেন মিসেস্ রায়ের স্বামী—স্থানীয় পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্‌টর মিঃ রায়। তিনি ছিলেন, যাকে আমরা বলি, কাজ-পাগলা লোক। পাছে সংসারের সঙ্গে কাজের ছোঁয়াচ লেগে কাজের কোনো ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যে তিনি নিজের বসত-বাড়িটা থানা থেকে দূরেই করেছিলেন। বাড়িতে যখন আসতেন, তখন থানার সমস্ত চিন্তা বাইরে পথের ধুলোয় ফেলে রেখে আসতেন; থানার যখন যেতেন, বাড়ির সমস্ত চিন্তা থানার বাইরে শালগাছগুলোতে যেন বেঁধে রেখে ঢুকতেন। পুলিশের কাজের আবহাওয়ার সঙ্গে বাড়ির অবহাওয়া মেশাতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। পুলিশের কাজে অনেক সময় বাইরে থেকে মানুষকে অত্যন্ত কাঠোর হতে হয়; অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে রুদ্র হতে হয়। তাঁর এই পুলিশের চাকরির জীবনের গোড়ায় গোড়ায় সেইসব ক্ষেত্রে তিনি বড়ই বিপদে পড়তেন। কোনো পাজি আসামিকে ধমকাচ্ছেন, এখন সময় থানার সংলগ্ন কোয়ার্টারের ভেতর থেকে চাকর এসে খবর দিলে, মা ডাকছেন! ভিতরে গিয়ে দেখেন, মিসেস্ রায়ের দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে....স্বামীর দু'হাত ধরে তিনি অনুনয় করেন,—আহা লোকটা কিরকম কাঁদছে, দেখেছো? ওকে ছেড়ে দাও! অতি কষ্টে তাঁকে বোঝানো হত, কান্না সব সময়ে অন্তরের নিষ্কলুষিতার পরিচয় নয়। কান্না আর কান্নার অভিনয়, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সাধু লোকদের যা স্বাভাবিক ধর্ম, অসাধু লোকেরা তারই অভিনয় করে তার আড়ালে নিজেদের দুষ্কৃতি লুকিয়ে রাখতে চায় ইত্যাদি, ইত্যাদি.....

সেদিন মিসেস্ রায়ের সান্ধ্য-মজলিসে একটি দরকারী বিষয়ের আলোচনা ছিল, রাঁচিতে যেসব ছেলেমেয়ে আছে এবং যেসব ছেলেমেয়ে এসেছে, তাদের নিয়ে একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, বিনয় যেদিন রাঁচিতে পা দিয়েছে সেইদিনই মিসেস্ রায় তার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর সান্ধ্য-মজলিসে তাকে টেনে নেবার চেষ্টার কোনো ত্রুটিই তাঁর ছিল না।

মিসেস্ রায় ছেলেদের মধ্যে থেকে একজনকে ডেকে বললেন,—বাবা বিনয়, তুমি যে-বই ঠিক করে দেবে, সেই বই-এর অভিনয় হবে।

মিসেস্ রায়ের মুখে বিনয়ের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি বিনয়ের ওপর গিয়ে পড়ল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, ফ্লানেলের শার্টের ভেতর থেকে বেশ

বোঝা যাচ্ছে যে, দেহটি শুধু ক্ষীর-সর-ননী খেয়ে গড়ে ওঠেনি, ইস্পাতের মতো পিটিয়ে দেহটিকে সুগঠিত করা হয়েছে, উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু থেকে একটা বলিষ্ঠ কৌতূহল—অন্ধকারে হীরকের মতো যেন জ্বলছে!

বিনয়কে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস্ রায় বলে উঠলেন, না বাবা, লজ্জা করলে চলবে না...এরা না জানলেও আমি তো তোমাকে জানি.....

এই বলে মিসেস্ রায় বিনয়ের যে পরিচয় দিলেন, তা সংক্ষেপে সাজিয়ে বললে দাঁড়ায়, বিনয় এই প্রথম রাঁচিতে এসেছে, এইটুকুই যা তার নিন্দের, তা ছাড়া তার মতো ছেলে ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। যথা,—য়ুনিভার্সিটির সে সেরা ছেলে, অথচ সে খুব নিরীহ ছেলে নয়, য়ুনিভার্সিটি-সেনাবাহিনীর মধ্যে সে ক্রাক-শট্। তার হাতে এই অল্প বয়সে কলম যেরকম চলে, লাঠিও সেইরকম চলে; কলকাতায় দু'একবার তার পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে নাকি। তার পড়াশোনার বহর দেখে প্রফেসররা তার সামনে কথা বলতে অনেক সময় ঢোঁক গেলেন, অথচ জীবন সম্বন্ধে তার কৌতূহল য়ুরোপীয় ছেলেদের মতোই জীবন্ত। কলেজে পড়তে পড়তে ছুটির সময় সে আসাম-অঞ্চলের জনমানবহীন পার্বত্য-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান করে এসেছে—সেখানে সেই গভীর পার্বত্য জঙ্গলের মধ্যে অপরিচিত কোনো পার্বত্য-জাতি আছে কি না এবং এই সম্পর্কে তার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ থিসিস্ ইতিমধ্যে বিলেতের বিখ্যাত নৃ-তত্ত্ব সভায় সসম্মানে গৃহীতও হয়েছে।

মিসেস্ রায়ের কথায় সকলে বিনয়ের দিকে সবেগে চাইলো। সকলের সমবেত সেই সবেগ-চাউনির সামনে যাকে পড়তে হয়, তার অবস্থা যে কিরকম হয়, তা সে যে পড়েছে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

প্রথম পরিচয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ কাটিয়ে বিনয় বলে উঠল, মাসিমা, আমার সম্বন্ধে যা বললেন, জগতের আর একজন লোকেরও যদি আমার সম্বন্ধে সেইরকম ধারণা থাকতো, তা হলে বুঝতাম এইটুকু জীবনের মধ্যে যাহোক কিছু পেলাম।

হরিহর ছিল এই দলের সিনিয়ার পাণ্ডা। বিনয়ের কথা শেষ হতে না হতেই সে বিনয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে, তার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলে উঠল, নেভার মাইন্ড! আপনি আর-একটি লোক চান তো? বেশ, মাসিমার সঙ্গে আমার নাম লিখে নিন্। আপনি আমাকে না জানলেও, আমি আপনার একজন নীরব-ভক্ত....কিন্তু এসব কথায় আসল কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে....কি বই এখন আমাদের রিহার্সালে ফেলা যায়.....

রবীন্দ্রনাথের "তপতী" থেকে কলকাতার স্টেজের লেটেস্ট নাটকগুলোর এক-একবার করে নাম করা হয়ে গেল এবং বিচার করে দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে, প্রত্যেকটিরই একটা না একটা অসুবিধা আছে। কোনো নাটকে মেয়েদের 'পার্ট

বেশি হয়ে যাচ্ছে, কোনো নাটকে 'হিরো' করবার উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা নাটক প্রায় ঠিক হয়ে এলো কিন্তু তার 'হিরো'কে গান গাইতে হবে, 'হিরো' বলে যে ছেলেটিকে ঠিক করা হয়েছিল, সে আবার গান জানে না। যে ছেলেটি গান জানে, সে আবার একটু মোটা....

এইভাবে আলোচনা ক্রমশ গভীর হয়ে উঠতে লাগল.....

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে রাত্রিও গভীর হযে আসছিল।

দলের মধ্যে কেউ কেউ চলে গেল, কারণ তাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। মিসেস্ রায়ের বাড়িটা ছিল শহর থেকে একটু দূরে, এবং তাঁর বাড়ির কিছু দূরে মাত্র আর একখানা বাড়ি, তারপরেই খালি মাঠ আর জঙ্গল।

যখন কোনো বই-ই ঠিক হয় না, তখন বিনয় বলে বসল, দেখুন, মাসিমা, এতগুলো বাঙলার ছেলেমেয়ে দু'দিনের জন্যে কলকাতার মরচে-পড়া জীবনের বাইরে যদি আসতে পেরেছি, তবে সেটুকু সময় আমার মনে হয়, অভিনয় করে আর রঙ মেখে প্রজাপতির মতো নেচে নষ্ট করা ঠিক নয়।

কথাটা হয়তো একটু রূঢ় হয়ে পড়েছিল। দু'একজনের মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। একজন বলে উঠল, তা বেড়াতে এসে কি গুণ্ডামি করে বেড়াতে হবে নাকি?

বিনয় উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর বলা হয়ে উঠল না। ঘরের মধ্যে সকলে সচকিত হয়ে শুনল, বাইরে খুব কাছে, হয়তো বাইরের দরজার সামনে কে যেন গোঙাচ্ছে....

রাস্তা থেকে কযেক ধাপ উঠে বাইরের বারান্দা, বারান্দার সামনেই একটা বড় ঘর। সেই ঘরে মিসেস্ রায় তাঁর দলবল নিয়ে বসেছিলেন। বাইরে থেকে সেই অদ্ভুত গোঙানির শব্দ শুনে বিনয় চেয়ার থেকে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, এ কিসের শব্দ, মাসিমা?

কিছু তো বুঝতে পারছি না বাবা!

বিনয় ততক্ষণ হল-ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে।

কোথায় যাচ্ছো, বিনয়?

বা রে! দেখবো না, কে এমন গোঙাচ্ছে?

এই বলেই বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করছে, এমন সময়ে বাহির থেকে ডাকলো, মাসিমা! শীগ্‌গির একটা লণ্ঠন আর জল নিয়ে আসুন!

বাইরে থেকে বিনয়ের গলার সাড়া পাওয়ার পর ছেলেদের মধ্যে যেন একটা সজীবতা এলো। তারা তখন সকলেই এক-জোটে বাইরে এলো। বাড়ির ভেতর থেকে একটা চাকর লণ্ঠন আর জল নিয়ে এলো।

লণ্ঠনের আলোয় সকলে দেখল, রাস্তা থেকে যে সিঁড়ি উঠেছে, তার তলায়

একজন উড়ে চাকর-গোছের লোক বসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে আর গোঙাচ্ছে।

বিনয় তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লোকটা চোখ চেয়ে নড়ে উঠল।

মিসেস্ রায়ের বাড়ির চাকর লণ্ঠন তুলে লোকটার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে বলে উঠল, এ যে দেখছি, আমাদের পাশের বাড়ির চাকর!

বিনয় লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, এই, কি হয়েছে? অমন গোঙাচ্ছিস কেন?

লোকটা তখনও ভালো করে বলতে পারছিলো না...কি যেন বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

তখন সকলে ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করে উঠল, বল্ না কি হয়েছে? কেউ মেরেছে?

না!

তবে? কিছু কামড়িয়েছে?

না!

তবে?

লোকটি অন্ধকারে পাশের বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অতি কষ্টে বললো, ভূত!

তিন

লণ্ঠনের আলোয় সেই অন্ধকারের মধ্যে ভূতের নাম শুনে ছেলেদের মুখের চেহারা কার কিরকম হল, তা ভালো করে দেখা গেল না।

মিসেস্ রায় শুধু বললেন, ও-টা পোড়ো বাড়ি, আর শুনেছি, ওর একটা ইতিহাস আছে—সেইজন্যে ও-বাড়িতে বড় একটা ভাড়াটে হয় না, পড়েই থাকে।

বিনয় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, মাসিমা! Eureka! Eureka!

হরিহর ভাবল, বুঝি ভূতেরই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাই শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠল, কোথায়?

সকলে একবার সামনের অন্ধকারের দিকে চাইল।

বিনয় বলল, তা নয়, আমার কাজ পাওয়া গিয়েছে, মাসিমা, আমি আজ চললাম। এতটা জীবন চলে এলাম, বাঘ, ভাল্লুক, খুনে কত কি দেখলাম, কিন্তু একদিনের জন্যেও ভূত দেখতে পেলাম না। আজ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে এই সুযোগ এসেছে, তখন তা ছাড়া হবে না....এই, তোর কোনো ভয় নেই। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দে। তোর নাম কি?

বনমালী।

বাঃ, এই তো দিব্যি কথা বলছো বাবা! এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে বলো দেখি।

আজ্ঞে কত্তা, আজ মাত্তর তিনদিন হল আমরা ঐ বাড়িতে এসেছি।

বাড়িতে কে কে আছে?

বুড়ো-কত্তা, গিন্নীমা আর আমি। বাড়িতে আর কেউ নেই।

তারপর?

তারপর কত্তা, কাল রাত্তিরে কত্তাবাবু, গিন্নীমা, সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি বাসনগুলো নিয়ে পাত্‌কোর কাছে এসেছি, এমন সময়ে অন্ধকারে কি একটা নড়ে উঠল! তারপর শুনি, খস্‌খস্‌ আওয়াজ হচ্ছে...মনে হল, কারা যেন অন্ধকারে চলাফেরা করছেন....ভয়ে বাসন-টাসন ফেলে দিয়ে কত্তাবাবুকে ডাকলাম—তানারা আর ঘর থেকে বেরুলেন-নি...

বাসনগুলো কি হল?

আজ্ঞে কত্তা, সেগুলি পরে আর পাওয়া গেল-নি। তার জন্যে কত্তাবাবু আজ আমাকে মারতে উঠলেন। এতদিন কাজ করছি হুজুর, কিন্তু কোনোদিন না বলে...

ব্যস, ব্যস্‌, আর বেশি কিছু বলতে হবে না। তারপর....আজ কি হল?

আজ শহরে গিয়েছিলাম বাজার করতে। বাজার করে থলের ভেতর নিয়ে আসতে আসতে হুজুর পথ গেলাম হারিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল, বাড়ির বরাবর এসেছি, এমন সময়ে, দোহাই হুজুর, নিজের কানে শুনলাম, পেছনে খড়ম পায়ে কারা যেন আসছেন....ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠল...রামনাম জপ করতে করতে ছুটতে লাগলাম। পা আর চলে না হুজুর, এমন সময়ে স্পষ্ট দেখলাম, হওয়ার সঙ্গে মিশে কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে গেলেন—হাতের থলি হাত থেকে পড়ে গেল, কোনোরকমে ছুটতে ছুটতে আলো দেখে এই দিকে ছুটে আসি....তারপর যা হয়েছে, কিছু মনে নেই।

তাহলে কথা হল, কালকে বাসনগুলো নিয়ে গিয়েছেন, আজ থলেসুদ্ধ বাজারটা তাঁরা নিয়ে গিয়েছেন।

আমি কি করে বাড়ি ফিরবো কত্তা! আজ তো বুড়ো আমাকে আস্ত রাখবে না হুজুর!

তোর কোনো ভয় নেই। তুই আমাকে তোদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারিস?

আপনার পায়ে পড়ি দেবতা—আপনি দেবতা! আমাকে বাঁচান!

বিনয় লোকটিকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল, তারপর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছেন?

এতদিন প্রত্যেক ব্যাপারে হরিহর মিসেস্‌ রায়ের এই দলের পাণ্ডাগিরি করে এসেছে, আজ সহসা সে বুঝল, এই নতুন যুবকটির আগমনে তার সে পদ টল্‌টলায়মান হয়ে উঠেছে। কিন্তু পদের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে, সেই পাগলা ছেলেটির পাগলামির সঙ্গে সমান তাল ফেলতে হয়; নইলে এতগুলো ছেলের সামনে তাকে ছোটো হয়ে যেতে হয়।

মাসিমার দিকে চেয়ে বিনয় বলল, মাসিমা, আজ রাত্তিরের মতো আসি, কাল আব্বার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, কেমন?

মাসিমার আর যে-কোনো বিষয়ে সাহস বা উৎসাহ থাকুক না কেন, ভূত-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর একটা বনিয়াদী ভয় ছিল। তার ওপর কি একটা উটকো ব্যাপারে তাঁর আসর যে ভেঙে গেল—এটা তাঁর আদৌ ভালো লাগছিল না। তাই তিনি অনুযোগের সুরে বিনয়কে বললেন, তোমার এর মধ্যে যাবার কি দরকার বাবা! আমি একটা চাকর দিয়ে ওকে বরঞ্চ বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছ।

এই বলে তিনি তাঁর চাকরকে ডাকলেন, বাঞ্ছা! ওরে বাঞ্ছা। কোথায় গেলিরে? বাঞ্ছা...

কিন্তু বাঞ্ছা যে বাড়িতে আছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখতে বা শুনতে পাওয়া গেল না।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁক দিলেন, বাঞ্ছা!

অতি কাতরকণ্ঠে হল-ঘরের পাশ থেকে উত্তর হল—আজ্ঞে গিন্নীমা, হঠাৎ কেমন পেটটা বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, উঠতে পারছি না।

বিনয় হেসে বলল, কাউকে ডাকতে হবে না মাসিমা, আমি যাই। লোকটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মাসিমা যখন বুঝলেন যে, বিনয় যাবেই, তখন হরিহরকে ডেকে বললেন, বাবা হরিহর, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে যাও, লোকটাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে, কেমন?

হরিহরকে সম্মত হতেই হল। কিন্তু লণ্ঠনে সে হাত দেয় না। বিনয় বুঝল, লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে যেতে হবে, তাই হরিহর লণ্ঠনে হাত দিতে চাইছে না। সে নিজেই লণ্ঠনটা এক হাতে তুলে নিয়ে, আর-এক হাতে লোকটাকে ধরে এগিয়ে চলল! হরিহর যতদূর সম্ভব বিনয়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে লাগল।

চার

কিছুদূর যেতেই বনমালী বলল, হুজুর, এই বাড়ি!

এই বলে সে দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

ভেতর থেকে বৃদ্ধ-কণ্ঠা সাড়া দিলেন, কে?

হুজুর, আমি বনমালী।

এসো ব্যাটা, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!

দরজা খুলে বৃদ্ধ দেখেন, বনমালীর সঙ্গে আর দুটি অপরিচিত লোক....

কে বাবা, তোমরা?

বিনয় এগিয়ে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বলল।

বৃদ্ধ দু'-হাত দিয়ে বিনয়কে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, বাবা, বৃদ্ধ বয়সে এক ভূতুড়ে-বাড়িতে এসে প্রাণ দিতে বসেছি। কালকে বনমালী যখন বলেছিল, তখন বিশ্বাস করিনি। আজ বাবা, সারা-সন্ধে থেকে বুড়ো-বুড়ি দুজনে ঘরে খিল দিয়ে রামনাম জপেছি, আর কেঁপে কেঁপে মরেছি। সন্ধে থেকে সে কি উপদ্রব! দোহাই বাবারা, তোমরা যেও না, আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে যাও।

এ আর মন্দ কথা কি! কি বলেন, হরিবারবাবু?....আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমরা আজ দুজনে এখানে থাকবো!

ভগবান্ তোমাদের ভালো করুন! কাল সকাল হলেই এ বাড়ি ছেড়ে বিদেয় হচ্ছি....রাম! রাম! ওরে বনমালী, আর দুটো হ্যারিকেন ছিল না? সে দুটো জ্বেলে দে!

বিনয় বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু তা হবে না, আলো জ্বালতে পারবেন না। যেগুলো জ্বলছে, সেগুলোও নিবিয়ে দিতে হবে। আপনাদের কোনো ভয় নেই, আমরা দুজনে সারারাত জেগে থাকবো।

বৃদ্ধ দুটি কম্পিত হাতে বিনয়ের হাত ধরে বললেন, দোহাই বাবা, বিদেশে বেঘোরে একে ভূতের ভয়ে মরছি, আর ভয় দেখাস নে বাবা! আলো জ্বালবো না, তার মানে? অঃ বনমালী, তুই আবার কাদের সঙ্গে করে এলি?

বৃদ্ধ তাদের উপর সন্দেহ করেছেন বুঝতে পেরে বিনয় বলে উঠল, আপনি পিতৃতুল্য লোক, গলায় দেখছি উপবীত। আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমাদের কোনো দুরভিসন্ধি নেই, আপনারা নিশ্চিন্তমনে ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোন।

তা তোমরা রাত্তিরে কিছু আহার করবে না?

আমরা খেয়েই এসেছি। আপনাদের যদি খাওয়া বাকি থাকে, সেরে নিয়ে আপনারা শুতে যান—বনমালী, বাবা, তুমি আমাদের কাছে থাকবে, কেমন?

ভীত লোক অন্তর থেকে বুঝতে পারে, তার নির্ভরতা কোথায় আছে। তাই সে দ্বিধা না করেই বিনয়ের কথায় সায় দিলো।

দুর্গানাম জপতে জপতে বৃদ্ধ বাড়ির ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বনমালী, বিনয় এবং হরিহরকে নিয়ে বাইরের একটা ঘর খুলে দিলো।....

দুখানা খাটই আছে। আমি এই মেঝেতে আপনাদের কাছেই শোবো।

বাইরে তখন অন্ধকার বেশ জমে উঠেছে। শীতের দিন, বেলা শীগ্‌গির পড়ে যায়, তাই ঘড়িতে রাত বেশি না হলেও, অনেক সময় মনে হয়, যেন রাত অনেক হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণ হরিহর বিনয়ের সঙ্গে ভালো করে কোনো কথা বলতে পারেনি। এই ছেলেটির হাবভাব, কথাবার্তা এইটুকু সময়ের মধ্যে সে যা দেখল, তাতে তার কম বিচিত্র লাগছিল না। স্নেহের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন মিসেস্ রায়ের বাড়িতে সে বিনয়কে দেখেছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই, এবং মিসেস্ রায়ের মুখে

যখন তার অজস্র প্রশংসা বর্ষার জলধারার মতো বর্ষিত হতে দেখেছে, তখন তার মনে একটা গোপন আক্রোশ এবং হিংসাই জেগেছিল, কিন্তু তার পরবর্তী সমস্ত কথাবার্তা এবং কার্য-কলাপ দেখে হরিহরের মনে এই অদ্ভুত ছেলেটির প্রতি একটা সংগোপন আকর্ষণ যে জাগেনি, তা বলা চলে না।

ঘরের মধ্যে যে লণ্ঠনটা জ্বলছিল, বিনয় নিজের হাতে তা নিবিয়ে দিলো।

বনমালী তাদের খাটের গা-ঘেঁষে নীরবে বসে রইল।

হরিহর জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বিনয়বাবু, আপনার এসব কাণ্ড আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিনয় হেসে বলল, না-বোঝবার তো কিছুই নেই! অতি স্পষ্ট ব্যাপার, ভূত ধরতে হবে।

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে হরিহর বলল, কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, আমি জানি, ভূত নিয়ে এরকম রসিকতা করা খুব আনন্দের ব্যাপার নয়!

কিন্তু মজার ব্যাপার তো?

হয়তো তা, কিন্তু তার মধ্যে আমাকে টানলেন কেন?

মজা কি একা-একা ভালো লাগে—তাই!

তারপর হঠাৎ বিনয়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো।

হরিহরবাবু, বিদেশে এসে এরকম ছোট ছেলের মতো ভয় পেয়ে, আজকের যুগের বাঙালি-ছেলে আপনারা, আপনারা যদি কাঁদতে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছু নেই।

হঠাৎ সেইভাবে আহত হয়ে হরিহর চুপ করে গেল।

বিনয় মৃদুকণ্ঠে বলে যেতে লাগল, আপনি নিশ্চিন্ত হোন.....আমাদের ঘাড়ে কোনো ভূত চাপছে না, আমরাও কোনো ভূতের ঘাড়ে চাপছি না। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে আপনি বুঝতে পারলেন না যে, এর মধ্যে ভূতের কোনো সংস্পর্শ নেই, এ হল একেবারে জ্যান্ত মানুষ-ভূতের কাজ? নইলে, থালা-বাসন অদৃশ্য হয়ে যায়, বাজারের থলি পথ থেকে উড়ে যায়! এ হল একশ্রেণির চোরছ্যাঁচোড়ের কাজ। তার প্রমাণ আজ না হয়, কার পাবেনই। আলো দেখলে পাছে বাবাজীবনরা না আসেন, সেইজন্যে আলো নিবিয়ে রাখছি।

এমন সময়ে বাইরে কিসের খস্‌খস্ শব্দ হল।

তারপর খড়ম-পায়ে খট্‌খট্ করে চলার বিচিত্র সব চাপা শব্দ.....

বনমালী তাড়াতাড়ি বিনয়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ঐ! ঐ!

চাপা কণ্ঠস্বরে বিনয় বনমালীকে ধমকে বলে উঠল, চুপ!

গায়ের ফ্লানেলের শার্টটা খুলে ফেলে হরিহরের গায়ে যে ঘন সবুজ-রঙের আলোয়ানটা ছিল, বিনয় সেটা বেশ করে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলো, তারপর আস্তে আস্তে যেদিক দিয়ে শব্দ আসছিল, সেদিকের দেওয়াল ধরে অতি সন্তর্পণে

অগ্রসর হতে লাগল।

অতি অল্পক্ষণ পরে কে একজন চিৎকার করে উঠল,—

মার্-ডালা, আরে বাপ্.....মার্-ডালা....

হরিহর এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিল। সেই শব্দ শুনে লণ্ঠনটা নিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, বিনয়বাবু। বিনয়বাবু!

কোনো ভয় নেই হরিহরবাবু! আপনার ভূত এক রদ্দাতেই ভূতলশায়ী....

হরিহর তাড়াতাড়ি শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, পাত্‌কোর ধারে মিশ্ কালো-মতো কি একটা পড়ে গোঙাচ্ছে। লণ্ঠনটা তার মুখের ওপর তুলে ধরতে তার চেহারা দেখে হরিহর বলে উঠল, উঃ! কি কালো এই লোকটা!

কালো নয়। আলকাতরা মেখে এসেছে। .....কি বৎস! ভূমি-শয্যা ছেড়ে ওঠো? না, আরো দু'একটা কোঁৎকার দরকার!

লোকটা তখন মাটিতে লুটিয়ে বিনয়ের পা ধরবার চেষ্টা করে বলছে—ছোড়-দিজিয়ে বাবু....গোড় পাকাড়তা....ছোড় দিজিয়ে বাবু—

পাত্‌কোর ধারে কাপড়ের মতো কি একটা ঝুলছিল। বিনয় সেইটে ফাঁস করে তার গলায় জড়িয়ে মোচড় দিতে লোকটা আপনি সটান উঠে দাঁড়াল।

একেবারে সোজা তোমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ওঝার হাতে ছেড়ে দিয়ে আসবো, চল...

চেঁচামেচিতে বৃদ্ধ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছেলে দু'টি কাউকে ধরেছে। কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ডাকলেন, বনমালী! অঃ বনমালী! বলি, ব্যাপারখানা কি?

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বিনয় বলে উঠল, আপনার ভূতকে জীবন্ত অবস্থায় ধরেছি এবং এখন থানায় নিয়ে চলেছি। খুব সম্ভব, আপনার বাসনগুলো আপনি ফেরত পেতেও পারেন।

এই বলে বিনয় লোকটাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো...

হরিহর লণ্ঠন-হাতে নীরবে তার সঙ্গে চলল।

আলকাতরা-মাখা তার চেহারা দেখে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, উঃ! কে বলবে যে, ভূত নয়!

পাঁচ

যখন চোর আর ভূত নিয়ে রাঁচির একপ্রান্তে সেদিন সন্ধ্যা-রাত্রি থেকে এই ব্যাপার চলছিল, দৈব-চক্রে রাঁচির থানায় সেদিন ঠিক সেই সময়েই আর-এক ঘটনা ঘটেছিল।

সন্ধ্যাবেলা মিঃ রায় থানার ডে-বুক ইন্‌স্‌পেক্‌শন করছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। রাঁচি থেকে পুরুলিয়া-রোডের কিছু দূরে বিহারের এক ধনী ব্যবসায়ী নিজে থাকবার জন্য একটি অতি সুন্দর বাড়ি করেছিলেন।

সুখলালবাবুর বাংলো নামে বাড়িটা সে-অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত ছিল এবং ধনী হিসাবে সুখলালবাবুরও খ্যাতি সে অঞ্চলে কম ছিল না।

মিঃ রায় ফোন তুললেন....

হ্যালো! হ্যালো! Ranchi Police Station Speaking!...কি বললে! ডাকত? সুখলালবাবুর বাংলোতে? Right-ho....এক্ষুনি....এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছি...

ফোন রেখে দিয়ে মিঃ রায় ডাকলেন, চন্দন সিং। চোবে!

হুজুর!

তোমরা থানাতে এখন ক'জন আছো?

আটজন!

বেশ! তোমরা আটজনই মোটর নিয়ে এক্ষুনি সুখলালবাবুর বাংলোতে যাও! সেখানে ডাকতে পড়েছে!...Speed!

দেখতে দেখতে সেই আটজন পুলিশকে নিয়ে মোটর সশব্দে পুরুলিয়া-রোড দিয়ে সুখলালবাবুর বাংলোতে গিয়ে পৌছুল। চারিদিকে অন্ধকার! কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

ধাক্কা-ধাক্কি করার ফলে ভেতর থেকে দরোয়ান হেঁকে উঠল—আরে, কৌন হ্যায় রে?

পুলিশ!

ক্যাহে-বা!

আগাড়ি কেওয়াড়ি তো খোলো।....দরজা খুলতেই পুলিশের লোকেরা দরজার ভেতরে লাফিয়ে পড়ল।

সুখলালবাবুর শরীর খারাপ থাকাতে সেদিন তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ফটকে গোলমাল শুনে তিনি মনে করলেন, হয়তো ডাকাত পড়েছে। বন্দুক-হাতে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাঁকলেন, কৌন্ চিল্লাতা রে!

সুখলালবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পুলিশের একজন এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার, মিঃ রায় রাঁচি থানা থেকে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন, আপনার বাড়ি থেকে এইমাত্র ফোন গিয়েছিল যে, আপনার বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে....তাই আমরা ছুটে এসেছি।

সুখলালবাবু বন্দুক নামিয়ে হেসে বললেন, মিঃ রায়ের সঙ্গে কেউ practical joke করেছে নিশ্চয়ই! আমার বাড়িতে ছটা বন্দুক, এ-অঞ্চলের ডাকাতরা তা জানে।

We are so sorry to disturb you!—বলে পুলিশের লোকেরা হতাশ হয়ে মোটরে গিয়ে বসল, মোটর আবার রাঁচির থানায় ফিরে এলো।

থানায় ফিরে এসে সকলে মিঃ রায়ের ঘরে ঢুকে দেখল, ঘর অন্ধকার, তিনি আরামে ইজি-চেয়ারে ঘুমুচ্ছেন।

স্যার!

কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

একজন এগিয়ে জোরে ডাকলে,—স্যার!

তবুও কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

ঘরে আলো জ্বেলে দিতে, তারা সকলে একসঙ্গে ডেকে উঠল,—স্যার!!

কিন্তু মিঃ রায়ের কোনো সাড়াই নেই। যেন তিনি গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছেন। কাছে এগিয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই, তাঁর মৃত্যু-হিম অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময়ে বিনয় আর হরিহর সেই লোকটিকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হল।

সমস্ত থানা থম্‌থম্ করছে!

বিনয় থানায় ঢুকতেই একজন পাহারাওয়ালা এগিয়ে এলো। বিনয় তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ রায় আছেন?

কি দরকার?

তাঁর পাশের বাড়িতে এই চোরটিকে আমরা ধরেছি, তাই, থানায় নিয়ে এসেছি।

চোরটি বলে বসল, না হুজুর, আমি ওদের ফরমাস মতো কাজ করতে পারিনি বলে ওরা আমাকে মেরেছে....মার সহ্য করতে না পেরে আমি গালাগাল দিই....

বিনয় গর্জন করে উঠল, চোপ্‌রাও বদ্‌মাশ! .....আমি মিসেস্ রায়ের কাছে থেকে আসছি! মিঃ রায় কোথায়? তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

পুলিশের লোকটি বিনয় ও হরিহরের আপাদ-মস্তক দেখে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, বেশ তো, থানার ভেতরে আসুন!

থানার ভেতরে যেতেই আর-একজন পাহারাওয়ালা এসে চোরটিকে নিয়ে গেল। প্রথম যে-লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বিনয় আর হরিহরকে ডেকে বলল,—দেখুন, আপনারা এমন সময়ে এসেছেন যে, আপনাদের দু'জনকেও আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

কেন?

এই কিছুক্ষণ হল, এক সম্পূর্ণ রহস্যময় অবস্থায় মিঃ রায় মারা গিয়েছেন.....অথবা কেউ তাঁকে বিশেষ কৌশলে খুন করেছে।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কোথা থেকে তার কণ্ঠস্বরে যেন কান্না ভরে এলো—দেখলেন তো, দেখলেন তো বিনয়বাবু, কোথা থেকে কি দাঁড়াল! ভূত ধরতে শেষে খুনের দায়ে পড়ে গেলাম।

হরিহরকে সেইভাবে আকুল হয়ে পড়তে দেখে, বিনয় ধমকে উঠল, ছিঃ হরিহরবাবু! এ অতি নিদারুণ শোকের সময়। মিসেস্ রায়ের কথা একবার ভাবুন দেখি? তাঁকে আমরা মাতৃস্থানীরা বলে জানি....ওঁরা পুলিশের লোক, ওঁদের কাজই হল, এসব ক্ষেত্রে সব বিষয়ে সতর্ক থাকা.....ওঁর কথায় তো আমাদের বিচলিত

হবার কিছু নেই.....তবে সত্যি, এ অত্যন্ত মর্মন্তুদ সংবাদ! কারণ, রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, মিঃ রায় আমাদের পরম আত্মীয়....

বিনয় হয়তো লক্ষ করেনি যে, ইতিমধ্যে আরো তিন-চারজন পুলিশের লোক একরকম তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। যে লোকটির সঙ্গে বিনয়ের কথা হচ্ছিল, সে লোকটি নীবরে বিনয়ের সমস্ত কথা শুনছিল। বিনয়ের কথা শেষ হলে সে লোকটি বলল, আপনি দেখছি, বেশ পাকা লোক!

লোকটির কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিনয়ের সমস্ত মুখের চেহারা বদলে গেল। তার অন্তরের শোকের কথা পুলিশের লোকের কাছে প্রকাশ না করলেই হত। রুক্ষস্বরে বিনয় বলল আপনি কি বলতে চান?

কিছুই না।

তা তো নয়! আপনি বলতে চান যে, মিঃ রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের যোগ আছে।

সে সন্দেহ করা খুব অন্যায় হবে না।

সত্যি, আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। আমি যদি এই খুনে লিপ্ত থাকবো, তবে এমন একটা লোককে সঙ্গে করে আনবো কেন, যে আমার বিরুদ্ধে যে-কোনো কথাই বলতে পারে?

এমন সময়ে থানার দরজায় একখানা মোটর এলো। মিসেস্ রায়ের কাছে খবর যেতে তিনি নিজেই চলে এসেছেন।

মোটর থেকে নেমে বিনয় আর হরিহরকে দেখে তিনি আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন।

বিনয় আর হরিহরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বুঝতে পেরে বিনয়ের ওপর সন্দেহ করার দরুন পুলিশের লোকেরা লজ্জিত হয়ে পড়লো।

সে-রাত্রির মতো মিসেস্ রায় যে-ঘরে মিঃ রায়ের মৃতদেহ পড়েছিল, সে ঘর থেকে নড়লেন না। শোকে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। সারারাত্রি বিনয় আর হরিহর সেই মৃত্যুর সম্মুখে, সেই অকস্মাৎ-বিপদের অপঘাতের সম্মুখে, বিমূঢ় শিশুর মতো মিসেস্ রায়কে সান্ত্বনা দিতে লাগল, যেন তিনি সত্যই তাদের জননী।

এধারে পুলিশ, তাঁদের যা কর্তব্য সবই করতে লাগলেন! তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে হয়তো শোক আছে, কিন্তু শোকের প্রকাশ নেই।

ছয়

মিঃ রায়ের অকস্মাৎ সেই মৃতুতে মিসেস্ রায় এতদূর ভেঙে পড়লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

মিঃ রায়ের মৃতদেহকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে পাবার জন্যে তিনি পুলিশের

কাছে বিশেষভাবে আবেদন করেন, কিন্তু পুলিশের কর্তারা তাঁর সে আবেদন গ্রাহ্য করলেন না। তাঁরা বললেন, এহেন ক্ষেত্রে মৃত-ব্যক্তির দেহ পোস্ট-মর্টেম করে দেখা কর্তব্য, কিসে তাঁর মৃত্যু ঘটল। বাইরে থেকে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, মুখ দেখলে মনে হবে যে, ঘুমিয়ে আছেন, এখুনি জেগে উঠবেন। জোর করে গলা টেপারও কোনো চিহ্ন গলায় নেই। এহেন ক্ষেত্রে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে, এই সন্দেহই হয়। কিন্তু পোস্ট-মর্টেম করে পেটে বিষেরও কোনো অস্তিত্ব পাওয়া গেল না।

পুলিশ-হেড্ কোয়ার্টার্স থেকে পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেনট্ মিঃ গার্ভিস্ এসেছেন, এই অদ্ভুত খুনের ব্যাপার তদন্ত করবার জন্যে। সঙ্গে তাঁর অ্যাসিস্‌টেন্ট্ পণ্ডিত হরিসিং। পুলিশের লোকেরা তাঁকে শুধু পণ্ডিতজী বলেই জানে।

পণ্ডিতজী হঠাৎ একদিন বলে বসল, স্যার, এ খুন-টুন নয়.....

তবে?

Simple case of heart-failure!

কিন্তু সেদিনকার সেই ফোন.....কায়দা করে থানা থেকে সব পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া?

কিন্তু মিঃ রায়ের সেই আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে রাঁচিতে আগত কলকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী, মিঃ যাদবচন্দ্র পাল, হঠাৎ ঠিক এইভাবেই মারা পড়লেন। তিনি শুধু মারা পড়লেন, তা নয়, তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত গয়না-পত্র ছিল, তিনি সেগুলি একত্র করে নিজের হাতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁর বাড়ির আর কেউ জানতো না যে, তিনি সে গয়নার বাক্স কোথায় রাখেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, সে গয়নার বাক্সও নেই! একদিন সন্ধেবেলায় ডুরাণ্ডায় তাঁর বাড়ির কিছু দূরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়ির মেয়েরা সব বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত চাকর এবং দারোয়ান ছিল। মেয়েরা বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, মিঃ পাল চেয়ারে ঘুমিয়ে আছেন। ডাকাডাকি করাতে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল না, তখন তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই তাঁর মৃত্যু-হিম দেহ মাটিতে পড়ে গেল। সেইদিন রাত্রিতেই দেখা গেল, তাঁর গয়নার বাক্সটি খোলা এবং খালি পড়ে রয়েছে!

যখন রাঁচির লোকেরা এই খবর জানতে পারল, তখন ভয়ে রাঁচি আধখানা হয়ে গেল, অর্থাৎ হাওয়া খেতে যারা বাইরে থেকে এসেছিল, তারা হাওয়া খাওয়ার চেয়ে হাওয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করল। দেখতে দেখতে রাঁচির সে পুজোর ভিড় একেবারে পাতলা হয়ে গেল।

মিসেস্ রায়ের আড্ডাতে ছেলেমেয়েদের আর ভিড় হয় না। কিন্তু দুটি ছেলে তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেনি, বিনয় আর হরিহর। যখন একে একে সব ছেলেরা চলে যেতে লাগল, তখন বিনয় একদিন হরিহরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কবে

মিঃ দত্তের দিকে চেয়ে বলে উঠল, তা বেশ, ভালো। আসল যারা, তাদের পারছেন না ধরতে, এখন ভিখিরি ধরে তার শোধ তুলতে চান!

হঠাৎ তার মুখে সেইভাবে স্পষ্ট কথা শুনে তাঁরা তিনজনেই চমকে উঠলেন।

পণ্ডিতজী গর্জন করে উঠলেন, যত বড় মুখ না তত বড় কথা!

ভিখারি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে আপনার মনে বলে উঠল, ঐ তো জ্বালা! আমরা শুধু বড় বড় কথাই বলি, কাজের বেলায় ঠুটো-জগন্নাথ!

এই বলে ভিখারি হরিহরের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাইল। সে দৃষ্টিতে হরিহর যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।

পণ্ডিতজী চেয়ারে বসে থাকতে না পেয়ে হরিহরকে ডেকে বললেন, দেখুন হরিহরবাবু, ঐ রাস্তার মোড়ে একজন পাহারাওয়ালা আছে, তাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো! লম্বা-লম্বা কথা বলা ওর দেখাচ্ছি....

এই বলে চেয়ার ছেড়ে তিনি ভিখারির দিকে এগিয়ে এলেন।

ভিখারি সিঁড়ির ধাপ দিয়ে ওপরে উঠে এলো, বারান্দা দিয়ে হল-ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মিঃ দত্ত বাধা দিয়ে বললেন, এই, ওধারে কোথায় যাচ্ছিস্?

ভিখারি কাঁধ থেকে ভিক্ষার ঝুলিটা নামিয়ে রেখে শান্তকণ্ঠে বলে উঠল—মাসিমার কাছে।

মিঃ দত্ত বলে উঠলেন, কে তোর মাসিমা?

কেন আপনার দিদি, মিঃ দত্ত।

এমন সময়ে গোলমাল শুনে মিসেস্ রায় দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন,—কে, বিনয় এলি নাকি?

ভিখারি উত্তর দিল, হ্যাঁ, মাসিমা!

পণ্ডিতজী, মিঃ দত্ত এবং হরিহর পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলেন।

আট

ভেতর থেকে ভিখারির সাজ খুলে ফেলে বিনয় যখন তার স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে বাইরে এলো, তখন পণ্ডিতজী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে তাকে তাঁর পাশে নিয়ে বসালেন। বললেন, মাপ করবেন বিনয়বাবু! আপনি যে ইতিমধ্যে আপনার কাজে লেগে গিয়েছেন, দেখে বড় আনন্দ হল।

মিঃ দত্ত কৌতূহলী হয়ে বিনয়ের চেয়ারের কাছে নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর? কিছু Clue-র সন্ধান পেলে?

হরিহরের চোখে যেন এক অজানা আলো জ্বলছিল। ইদানীং যতই সে বিনয়কে দেখে, ততই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভালো-ছেলেটির উপর তার যেন কি এক অপূর্ব শ্রদ্ধা বেড়ে যায়! বিনয়ের সজীবতার ছোঁয়াচ তারও মনে এসে লেগেছিল। বাংলাদেশের যুবক বলে যখন সে নিজের দিকে চাইতো, তখন কি এক গোপন-আকাঙ্ক্ষায় তার মন ভরে উঠতো। বিনয়কে দেখে সে যেন বুঝতে পারল, যৌবনের অপরূপ রূপ কোথায়, কোথায় তার বিচিত্র আবেদন, যার জন্যে বৃদ্ধ যযাতি নিজের পুত্রের কাছে, পুত্রের যৌবনের বিনিময়ে নিজের যৌবন ফিরে পেতে চায়। এক নবীন কিশোর-দেবতার মতো বিনয় যেন হরিহরের চোখের সামনে এক অপরূপ মূর্তিতে জেগে উঠছিল! সেও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, এ-রকম ভিখিরি সেজে কোথায় গিয়েছিলি?

প্রথম পরিচয়ের "আপনি" কখন যে "তুমি" থেকে অতিঘনিষ্ঠতায় "তুই"-তে পরিণত হয়েছে, তা দুজনেই লক্ষ করেনি।

বিনয় রাস্তার দিকে সোজা চেয়ে, তাদের তিনজনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, আপনাদের তিনজনের উত্তর আমি একসঙ্গেই দিচ্ছি। আজ তিনদিন ধরে এই ভিখিরির সাজে আমি রাঁচির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেখানে-যেখানে এই ধরনের লোকেরা চলা-ফেরা করতে পারে, সেইসব আড্ডায়, চা-খানায়, গাড়োয়ানদের পাড়ায়, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু আমরা তো এর কিছুই জানি না!

জানেন একমাত্র মিঃ গার্ভিস্। তিনিই এই ব্যাপরে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

কিন্তু কিছু সন্ধান করতে পারলে?

না। এইসব খুনের খানাতল্লাশির কোনো সূত্র আমি এখনো পাইনি। তবে, কোনো জিনিসই বৃথা যায় না। আজ এমন একজন লোকের সন্ধান পেয়েছি, যিনি আমাদের এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁর মতো লোকের সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

কে তিনি?

প্রফেসর কান্‌হাইয়ালাল।

পণ্ডিতজী হেসে বলে উঠলেন, তিনি আমাদের কি সাহায্য করবেন? শুনেছি বটে তাঁর নাম। তিনি রাঁচি থেকে একটু দূরে একটা আলাদা বাড়ি করে থাকেন। বাড়িটা খুব ছোট্ট, কিন্তু শুনেছি নাকি একজন বড় আমেরিকান-ডিজাইনারকে দিয়ে তিনি বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন। তা, শুনেছি বটে তিনি একজন মস্তবড় পণ্ডিত লোক, য়ুরোপ আর আমেরিকার খুব বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক খেতাব তাঁর আছে....

বিনয় বলে, আমি জানতাম না যে, প্রফেসর কান্‌হাইয়ালাল এখানে থাকেন। বিলেতের ক্রিমিনলজির কাগজে তাঁর থিসিস্ প্রথম স্থান পায় এবং শুনেছিলাম,

অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার কাজে তিনি তাঁর সমস্ত সময় ও সম্পত্তি নিযুক্ত করেছেন। এমন একজন লোক হাতের কাছে থাকতে, তাঁর পরামর্শ না নেওয়ার মতো অন্যায় কাজ আর কিছু হতে পারে না।

পণ্ডিতজী বলেন, তাঁর গবেষণার কথা অবশ্য আমি বলতে পারি না, কিন্তু তিনি বড় একটা কারুর সঙ্গেই মেশেন না, সর্বদাই বাড়ির ভেতর থাকেন—ক্বচিৎ কখনো তাঁর একটা বার্মিজ চাকর আছে, তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন...

হ্যাঁ। আজ গাড়োয়ানদের পটি থেকে ভিক্ষে করে বেরুচ্ছি, দেখি, তিনিও সেখান দিয়ে বেরুচ্ছেন, সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত সেই বার্মিজ্ চাকরটি।

হরিহর বলে উঠল, তুমি বুঝি অধ্যাপককে আগে থাকতে চিনতে?

আমাদের কলেজ থেকে একবার 'এক্স্পেরিমেন্টাল্ সাইকলজির' একটি আলোচনা-সভার আয়োজন হয়, সেই সভাতে ওঁকে দেখেছিলাম। তখনও সঙ্গে দেখেছিলাম ঐ বার্মিজ চাকরটিকে! চাকরটির প্রতি শুনেছি ওঁর অত্যন্ত মায়া। নিজের ছেলের মতন ওকে দেখেন এবং সর্বদাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে নাকি থাকে সে। বিলেতের এক সায়েন্টিফিক-কাগজে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আমার বেশ মনে আছে, তাতে চাকরটার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখেছিলেন।

পণ্ডিতজী এতক্ষণ উৎসুক হয়ে শুনছিলেন—অধ্যাপকের সঙ্গে এ-বিষয়ে একবার পরামর্শ করে দেখলে কেমন হয়, বিনয়বাবু? উনি শুনেছি, বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করেন না। বিশেষ করে, পুলিশের লোকের ওপর ওঁর নাকি একটা জাত-ক্রোধ আছে। তাই বলছিলাম বিনয়বাবু, আপনি যদি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে, ওঁর পরামর্শটা নিতে পারেন, বড় ভালো হয়।

আমি তো সেই মনস্থ করেই ফিরেছি। কাল সকালেই ওঁর বাড়িতে যাবো একবার।

হরিহর এতক্ষণ শুধু বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিনয়কে দেখছিল।

সস্নেহে বিনয়ের পিঠ চাপড়ে বড়ে উঠল,—এতদিন নিজে 'হিরো' ছিলাম, 'হিরো-ওয়ারশিপের' স্বাদ জানতাম না। পুজো পাওয়ার একটা আনন্দ আছে জানি, কিন্তু আজ বুঝছি, পুজো করবারও আনন্দ কম নয়।

নয়

পরের দিন ভোর না হতেই বিনয় অধ্যাপক কান্হাইয়ালালের বাড়িতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। রাঁচি থেকে তাঁর বাড়ি আরও পাঁচ মাইলের পথ। একেবারে পরিপূর্ণ নির্জনতার মধ্যে তিনি একা থাকেন। আশ-পাশে দু'এক ঘর সাঁওতাল কুলি-কামিনরা থাকে, তারাই হল তাঁর প্রতিবেশী।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বিনয় যখন অধ্যাপকের বাড়িতে এসে পৌছল, তখন রোদ উঠে গিয়েছে। বাড়ির সামনে এসে দেখল, ফটক খোলা, কিন্তু চাকর বা দারোয়ান

কেউ নেই সেখানে। দু'ধার থেকে পাঁচিল এসে সেই গেটে মিশেছে। গেটের সামনে থেকে ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়ে বিনয় ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির সামনেই খানিকটা জঙ্গল, বহুদিন সে-জঙ্গলের গায়ে যেন কোনো মানুষের হাত পড়েনি! জঙ্গল পেরিয়ে একখানা পুরোনো বাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যাঁরা বাড়ি, তিনি বাড়ি-সম্বন্ধে সব আশাই যেন ছেড়ে দিয়েছেন!

একটা সত্যিকারের য়ুরোপে খাতিরওয়ালা অধ্যাপকের সঙ্গে দেখে করতে আসার একটা বিপুল আনন্দ আছে। বিশেষ করে, আজকে বিনয়ের পক্ষে তাঁকে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তিনি কি ধরা দেবেন? একজন ছাত্রের সঙ্গে কি তিনি ভালো করে কথা বলবেন?

এই-আশা-আশঙ্কায় দুলতে দুলতে বিনয় অধ্যাপকের বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। 'কলিং-বেলের' ব্যবস্থা আছে দেখে, বিনয় কলিং-বেল টিপ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে সামনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সেই বার্মিজ চাকরটি।

চাকরটাকে দেখেই বিনয়ের মন উল্লাসে ভরে গেল। অত বড়লোকের চাকর, সে-ই বা কম কি? ইতিহাসে সে পড়েছে, নেপোলিয়নের ভ্যালেটের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে য়ুরোপের বড় বড় ঘরের ছেলে-মেয়েরা উৎসুক হয়ে থাকতো। মহাপুরুষদের যেসব অন্তরঙ্গ-মুহূর্তের একটুখানি ইতিহাস জানবার জন্যে সমস্ত জগৎ উৎসুক হয়ে থাকে, তারা সেইসব অন্তরঙ্গ-মুহূর্তের একমাত্র সাক্ষী! জগতে কেউ হয়তো দেখেনি, জোসেফাইনের জন্যে নেপোলিয়নকে চোখের জল ফেলতে, কিন্তু তাঁর ভ্যালেট তা দেখেছে। সে কি কম সৌভাগ্যের কথা!

বার্মিজ চাকরটিকে আসতে দেখে বিনয় দু'হাত বাড়িয়ে তার দুটি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, সাহেব বাড়ি আছেন?

চাকরটির দেহ যেন কলের পুতুলের মতো। বিনয় যে তার দু'খানা হাত তুলে ধরেছিল, তাতে তার মুখে চেহারার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, হাত দু'খানা ছেড়ে দিতে, তা আবার ঠিক কলের পুতুলের মতো স্বস্থানে ফিরে গেল।

বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করল, সাহেব আছেন? আমি একজন ছাত্র, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পরিষ্কার বাংলা-ভাষায় চাকরটি বলল, তাঁর শরীর তো বড্ড খারাপ....

বিনয় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল—তাহলে তাঁকে বিরক্ত করতে চাই না....

এমন সময়ে বিনয় শুনল, ভেতর থেকে সুন্দর গম্ভীরকণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, কে রে ফুচি?

চাকরটির নাম ফুচি।

ফুচি একবার ভেতরে গেল, তারপর তক্ষুনি এসে জানাল, আসুন আপনি আমার সঙ্গে, সাহেব আপনাকে ডাকছেন....

ফুচির পিছু-পিছু সামনের দরজা ঠেলে, বাইরের হল-ঘরের মতন একটা ঘরে

বিনয় গিয়ে দেখে, হলের এক কোণে এক ইজি-চেয়ারে অধ্যাপক ঘোষ অর্ধ-শায়িত অবস্থায়। বাইরের সূর্যের আলো তখন সোনার পাতের মতো ঝিক্‌মিক্ করছিল বটে, কিন্তু সেই হলঘরে তার কোনো চিহ্ন ছিল না। সেই দিনের বেলাতেই ঘরটির আধো-অন্ধকার, আধো-আলো কেমন যেন বিচিত্র লাগছিল!

বিনয় অধ্যাপকের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই তিনি তাঁর পাশে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিনয়কে বসতে বললেন।

তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না বাবা!

আজ্ঞে, না চেনবারই কথা, তবে আমি আপনাকে বিশেষভাবে চিনি! আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্‌স্‌পেরিমেন্টাল্ সাইকলজির একজন ছাত্র....এবং শুধু কলেজের বই নয়, এ-বিষয় সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আমার অসীম! ক্রিমিনলজি আমার স্পেশাল স্টাডি!

কি বললে! ক্রিমিনলজি?

হ্যাঁ। যার জন্যে আজ জগৎ-জুড়ে আপনার খাতি!

কিন্তু বাবা, আমি বৃদ্ধ মানুষ আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ও-সম্বন্ধে খুব বেশি কৌতূহল থাকা ভালো নয়। ও হল আগুন নিয়ে খেলা করা! কিন্তু তুমি আমার কাছে কি মনে করে....

বাধা দিয়ে বিনয় বলল, একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম।

এতক্ষণ ফুচি নীরবে সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। যেন সেই ঘরের একটা নির্বাক আসবাবমাত্র।

ওরে ফুচি, বাবুটির জন্যে একটু চা-টা দেখ্! আমার চাকর বলতেও ওই, ছেলে বলতেও ওই, ঐ চাকরটুকুই আমার সব। আর....

অধ্যাপক কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সে-কথাটা চেপে বিনয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো, ভালো....তোমার প্রয়োজনটা কি, তা কি শুনতে পারি?

আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, রাঁচিতে এবং তার চারদিকে যেসব খুন হচ্ছে...

এই মরেছে! পুলিশ বুঝি তোমাকে সন্দেহ করে ধরেছে?

আজ্ঞে না।

তবে?

আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, পুলিশে এসব খুনের কোনো হদিসই বার করতে পারছে না? কারণ, যে এই কাজ করছে, এত বড় 'সায়েন্টিফিক্ ক্রিমিন্যাল' সে, যে তার কোনো 'ট্রেস্' কোথাও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু এইমাত্র তুমি যে বললে, যে এই কাজ করছে....তার মানে? তোমার কি ধারণা, এগুলো সব একটা লোকের কাজ?

হ্যাঁ। আমার তাই বিশ্বাস।

বেশ, তা যেন হল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তুমি একজন নবীন ছাত্র, তোমার সঙ্গে এইসব খুনের কি সম্পর্ক?

সেই কথা বলবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। জীবনে আমার অসীম কৌতূহল...

অধ্যাপক হেসে উঠলেন,—বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি আজকের যুগের অ্যাড্‌ভেঞ্চার-লোভী বাঙালি-যুবক....বেশ, তারপর?

রাঁচিতে আমি যাঁর আশ্রয়ে আসি, তাঁর স্বামী, মিঃ রায় এখানকার পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। তিনিই প্রথমে খুন হন। আমি তাঁকে মাসিমা বলি। সত্যি, তাঁর ম্লান মুখ দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, পুলিশের সাহয্যে সে-অপরাধীকে আমি খুঁজে বার করবোই—সেইজন্যে....

আমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছো! I see কিন্তু আমার কি কথা, জানো? কি বললে তোমার নাম? বিনয়, হ্যাঁ। দেখো বিনয়, You are a young man, handsome brilliant...তোমার সামনে এই সুন্দর পৃথিবী পড়ে রয়েছে....তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে যেয়ো না।

না, স্যার, আমার জীবনের নীতি তা নয়। আমি বিপদকে ভালোবাসি...বিপদ আমাকে টানে...তাই, কোনো বিপদ আমার সামনে এলে, আমি তাকে এড়িয়ে যেতে চাই না।

তোমাকে দেখে কেন জানি না, আমার বড় মায়া হচ্ছে। সংসার বলতে আমার নিজের কিছু নেই....আমি যদি অধ্যাপক না হয়ে তোমার বাবা হতাম, তাহলে তোমাকে ঘরে চাবি দিয়ে বলতাম....এরকমভাবে এ-বিপদের মধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবো না।

কিন্তু আমি ঘর ভেঙে পালাতাম। সেইজন্যে বোধহয়, আমার বাবা ছেলেবেলাতেই আমাকে ফেলে রেখে পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যান, নইলে, এই দুরন্ত-ছেলের জ্বালায় তাঁর বার্ধক্য হয়তো কণ্টকিত হয়ে উঠতো!

তা হলে তুমি কি করতে চাও?

আমি সেই অপরাধীকে খুঁজে বার করবোই—এবং সেকাজে আমি আপনার সাহায্য চাই।

বল, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

এইসব খুন থেকে আপনার কি মনে হয়? কিভাবে, কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করলে ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে তদন্ত করা যেতে পারে....

বৈজ্ঞানিক উপায়ে তদন্তের কথা যদি বললে, তাহলে শেষ যেখানে খুন....

এমন সময় ফুচি বলে উঠল—সাব্!

তার দিকে চেয়ে অধ্যাপক বললেন, কি রে!

আপনার স্নানের টাইম্ হয়ে গিয়েছে....জল ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে!

বিনয় লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, মাপ করবেন, আপনাকে বিব্রত করলাম...

না, না, ফুচি তুই যা, জলটা আবার গরম করে ফ্যাল্। হ্যাঁ...দাঁড়িয়ে রইলে যে? হ্যাঁ....কি বলছিলাম, বৈজ্ঞানিক-তদন্তের কথা, না? শেষ কোথায় খুন হয়েছে?

এখানে থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে এক জমিদারের বাড়িতে।

সেখানে তুমি নিজে গিয়েছিলে?

না। গার্ভিস্ সাহেব গিয়েছিলেন।

ওঃ! গার্ভিস্ বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ! তাঁকে আপনি চেনেন?

না, তবে নাম শুনেছি।

তিনিও বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন, এই খুনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে।

তা, তিনি এখনও পর্যন্ত কিছু সূত্র পাননি?

একটা ব্যাপারে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন, কি করে লোকটা সিন্দুক ও সিন্দুকের চাবির সন্ধান পাচ্ছে! কোনো মারামারি বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই...যেন লোকে নিজে সিন্দুক খুলে ডাকাতকে দিয়ে দিয়েছে!

এ কার অনুমান?

আমার।

কিসে তোমার এ অনুমান হল?

আমি পড়েছি, ইদানীং য়ুরোপে একশ্রেণির বৈজ্ঞানিক ক্রিমিন্যাল 'হিপ্নটিজম' -এর সাহায্যে এভাবে ডাকাতি করছে।

যারা খুনের আর ডাকাতির কাজে এতখানি শিক্ষিত, তুমি কি সাহসে তাদের পেছনে মরতে চলেছো? তারা যদি জানতে পারে, তোমাকে তো এক মুহূর্তে সাবাড় করে দেবে!

আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আর তা ছাড়া, তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, একজন আমার মতন কলেজের ছেলে এর মধ্যে আছে। এ খবর গার্ভিস্ সাহেব আর আপনি ছাড়া, আর আমার এক বন্ধু, মিসেস্ রায় এবং পুলিশ-ইন্স্পেক্টর ছাড়া আর কেউই জানে না।

ফুচি কখন ঘরে এসেছিল, কেউ দেখেনি। সে আবার বলে উঠল, সাব্ আর দেরি নয়—

ঘাড় তুলে অধ্যাপক বললেন, তুই থাম ফুচি, তোর সবতাতেই তাড়াতাড়ি!

বিনয় বুঝল, আর বেশিক্ষণ বসে থাকলে সত্যি-সত্যিই ভদ্রতার ওপর জুলুম করা হবে। তাই, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আজ আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু কেস্টা যেমন এগোবে, মাঝে মাঝে এসে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো। আমার অনুরোধ আপনি যদি এই কেস্টার দিকে একটু attention দেন—

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সস্নেহদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি এ-হাঙ্গামার মধ্যে থেকো না... You are such a nice handsome young man...কেন জানি না, তোমাকে হঠাৎ দেখে বড় মায়া হচ্ছে মনে....

ফুচি তেমনি নীরবে দরজা পর্যন্ত বিনয়কে এগিয়ে দিলো। বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

দশ

এই ঘটনার দু'দিন পরে হঠাৎ গার্ভিস্-সাহেব স্বয়ং সন্ধ্যার মুখে বিনয়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বিনয় আর হরিহর কাজের সুবিধার জন্যে মিসেস্ রায়ের বাড়ির কাছেই একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। খুঁজে-পেতে একটা দেহাতি ছেলে তারা চাকর হিসেবে রেখেছিল। সে-ই তাদের সেই প্রবাসের ঘর-সংসার দেখতো। হঠাৎ গার্ভিস্ সাহেবকে নিজে চলে আসতে দেখে, বিনয় অবাক্ হয়ে গেল! মিঃ গার্ভিস্ গাড়ি থেকে নেমে বললেন, চলো, তোমার ঘরে।

ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, দেখ, এইমাত্র আমি ফোন পেলাম, হাজারিবাগে এক বড় জমিদারের বাড়িতে ঠিক এইরকম ব্যাপার হয়েছে। আমি ট্রেনে চলে যাচ্ছি...যতক্ষণ না আমি ফিরি, তুমি এদিকে-ওদিকে কোথাও যাবে না, আর আমার নাম করে তোমাকে কেউ ফোনে ডাকলে, তুমি বুঝবে যে, তা ষড়যন্ত্রকারীদের কাজ। যদি কোনো বিশেষ কাজে আমি তোমাকে ডাকি, তাহলে আমি লোক মারফৎ তোমার কাছে সঙ্কেত পাঠাবো, O. K. তুমি নেমন্তন্নে আসতে পারো....বুঝলে, ভুলো না।

মিঃ গার্ভিসের গাড়ি স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। ঘরের ভেতর ঢুকতেই বিনয়ের মনে হল, অন্ধকারে কে যেন চলে গেল!

তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে রিভলভারটা নিয়ে বেরুতে গিয়ে দেখে দেরাজ খোলা, রিভলভার নেই!

বিনয় ডাকল, হরিহর! আমার রিভলভার?

নেই?

তুমি তো সারাক্ষণ বাড়িতেই ছিলে?

মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে মিসেস্ রায়ের ওখানে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এইমাত্র মনে হল, কে যেন এদিক দিয়ে গেল!

হরিহর ছুটে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক খুঁজে সে ফিরে এলো।

কোথাও কেউ নেই! সেই পাগলটা শুধু শালবনের ধারে বসে আছে!

পাগল?

হ্যাঁ। রোজ দেখতে পাও না, রাস্তার ধারে ঐ শালবনের পাশটায় বসে থাকে?

কই! চল তো দেখি?

দুই বন্ধুতে গিয়ে দেখল, সে-জায়গায় কেউ নেই—পাগলার গায়ের কতকগুলো ময়লা ন্যাকড়া শুধু পড়ে আছে।

দু'জনে নীববে বাসায় ফিরে এলো।

বিনয় বুঝল যে, ষড়যন্ত্রকারীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে সে এসে পড়েছে! অন্ধকারে আলো জ্বেলে বিনয় আর হরিহর দু'জনে মুখোমুখি অনেকক্ষণ বসে রইল, তারপর বিনয়ই প্রথম কথা বললে, হরিহর, তুমি ভাই কলকাতায় ফিরে যাও।

তোকে ফেলে নয়। যেদিন কলকাতায় ফিরবো, দুজন একসঙ্গেই ফিরবো!

বিনয় বলে, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা তোর মনে আছে, যেখানে কবি বলেছেন—আমাদের দুজনের মাঝখানে পথ বেঁধে দিলো গ্রন্থি—তোর আর আমার মধ্যে সেই পথের গ্রন্থি পড়ে গিয়েছে।

এগারো

ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দু'মিনিট সময় ছিল। মিঃ গার্ভিস্ একরকম ছুটতে ছুটতে কামরায় গিয়ে উঠলেন।

কামরার মধ্যে আর দু'জন যাত্রী ছিল। একজন কোনো সম্ভ্রান্ত ভারতীয় যুবক হবে এবং আর একজন শয্যাশায়ী; সম্ভবত কোনো রোগী হবে।

গার্ভিস্-সাহেব বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে একমনে ভাবছিলেন, উপর্যুপরি এইসব দুর্ঘটনা ঘটছে....পুলিশ তার কোনো হদিসই বার করতে পাচ্ছে না—একি কম লজ্জার কথা!

দু'একটি স্টেশন পার হয়ে যাবার পর, গার্ভিস্-সাহেব লক্ষ করলেন যে, তাঁর সহযাত্রী যুবকটি শায়িত লোকটির সেবা করছেন। শায়িত লোকটির আপাদ-মস্তক ঢাকা! বিশেষ অসুস্থ বলেই মনে হয়!

শায়িত লোকটি ক্রমশ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল—উঃ, চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না একদম।

কিন্তু কামরায় আর-একজন যাত্রী রয়েছেন, আলো নিবোনই বা যায় কি করে?

মিঃ গার্ভিস্ ব্যাপারটা বুঝলেন। স্বাভাবিক ভদ্রতার তিনি নিজে থেকে বললেন, দিন্ না আলোটা একটু নিবিয়ে...আমার কোনো আপত্তি নেই।

যুবকটি আলো নিবিয়ে দিলো। অসুস্থ লোকটি অজানা সহযাত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল।

এই ব্যাপারের সূত্রে মিঃ গার্ভিস্ যুবকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

হাজারিবাগে।

ভালোই হয়েছে, আমিও সেখানে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে উনি কে?

আমার কাকা...হঠাৎ দেহের একটা অঙ্গ পড়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ এমনি কথাবার্তার পর হঠাৎ মিঃ গার্ভিস্ দেখলেন যে, পাশের যুবকটি তাঁকে অতর্কিতে গলা টিপে ধরেছে এবং সেই রুগ্‌ণ শায়িত লোকটি একটা রুমাল তাঁর নাকের কাছে চেপে ধরেছে। সেই রুমাল থেকে একটা তীব্র আরকের গন্ধ তাঁর নাকের ভেতর দিয়ে গিয়ে একমুহূর্তে তাঁকে অবশ ও সংজ্ঞাশূন্য করে ফেললো। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই সেই দু'জন লোক পেছনের দরজা দিয়ে গার্ভিসের অসাড় দেহকে দু'জনের মধ্যে তুলে নিয়ে নেমে পড়ল।

বারো

রাত্রে হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দে বিনয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

দুই বন্ধুতেই বিছানা থেকে উঠে টর্চ জ্বেলে দেখল, একজন আরদালি-ধরনের লোক কড়া নাড়ছে।

দু'জনেই বেরিয়ে এলো।

কি ব্যাপার!

গার্ভিস্-সাহেব মোটর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বটে! এবার তো যাদু ফাঁদে পড়েছো!

হুজুর, ফাঁদ-টাঁদ কিছু জানি না। তিনি বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা হলে বলতে O. K. তুমি নেমন্তন্নে আসতে পারো।

সেই সাঙ্কেকিত ভাষা শুনে বিনয়ের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

গার্ভিস্-সাহেব কোথায়?

তাঁর হাজারিবাগ যাওয়া হয়নি। পথের মাঝখানে আমাদের থানায় তিনি নেমেছেন এবং সেখান থেকে এই মোটর পাঠিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ দরকার, এক্ষুনি যেতে হবে আপনাকে।

বেশ, তুমি দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি!...হরিহর, তুমি থাকো। দু'জনে গিয়ে কাজ নেই! নিশ্চয়ই গার্ভিস্-সাহেব পথে কোনো সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে জামা পরে বিনয় বেরিয়ে এলো। পথে মোটর দাঁড়িয়েই ছিল। পুরুলিয়া রোড ধরে মোটর তীব্র বেগে ছুটল।

বিনয়ের যখন জ্ঞান হল, তখন সে দেখলে, এক অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে পড়ে আছে। মাথার ভেতর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে! অনেকক্ষণ ধরে সেই অন্ধকারে সেই রকম অবস্থায় সে ভাবতে চেষ্টা করতে লাগল, কি করে সে সেখানে এলো! তখন একে একে তার সব কথা মনে পড়তে লাগল। মোটরে সে

গার্ভিস্-সাহেবের কাছে যাচ্ছিল, মোটরেই সে হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং মোটরে যে দু'জন লোক ছিল, তারা তার মুখ চেপে ধরে.....তারপর আর কোনো কথাই তার মনে নেই।

এমন সময়ে অন্ধকারে কার গায়ে যেন তার পা লাগল!

অস্ফুটস্বরে বিনয় বলে উঠল, কে?

গড়াতে গড়াতে সে-লোকটিও অন্ধকারে বিনয়ের কাছে এগিয়ে এলো। বিনয় বুঝল যে, অন্ধকারে সেই ঘরে আর একটি যে প্রাণী রয়েছে, সেও তার মতো হাত-পা বাঁধা।

বিনয় জিজ্ঞসা করল, কে আপনি, কথা বলুন? মনে হচ্ছে, আপনার আর আমার অবস্থা এক।

হঠাৎ সেই অজানা-লোকটি বিনয়ের নাম ধরে ডেকে উঠল, কে, বিনয় নাকি? গলার স্বর শুনে তাইতো মনে হচ্ছে!

আরে, মিঃ গার্ভিস্ নাকি!

হ্যাঁ। তোমাকে যে আমি বারণ করে এসেছিলাম, বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরুবে না?

বাঃ! আপনি তো সাঙ্কেতিক কথাগুলো জানিয়ে আরদালি আর মোটর পাঠালেন!

বুঝেছি! আর বলতে হবে না। এখন আর কোনো কথা নয়। আমরা দু'জনেই তাদের চক্রান্তে পড়ে বন্দী হয়েছি। হয়তো তারা কেউ পাহারা দিচ্ছে!

এই বলে গার্ভিস্-সাহেব গড়াতে গড়াতে বিনয়ের হাতের কাছে মুখ নিয়ে এলেন। অন্ধকারে বিনয় বুঝতে পারল, সাহেব দাঁত দিয়ে তার হাতের দড়ি কাটতে চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পরে বিনয় স্পষ্ট অনুভব করল যে, গার্ভিস্-সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! কিছুক্ষণ পরে বিনয়ের বোধ হল যে, তার হাতের বাঁধন যেন হঠাৎ নরম হয়ে পড়ল, হাত তুলে নাড়তেই হাতের দড়ি আল্‌গা হয়ে গেল। বিনয় বুঝল, আত্মরক্ষার শেষ উপায়স্বরূপ গার্ভিস্-সাহেব দাঁত দিয়ে সেই অসাধ্য-সাধন করেছেন।

বিনয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে গার্ভিস্-সাহেব বললেন, এবার তুমি নিজে তোমার পায়ের দড়ি খুলে, আমার বাঁধন খুলে দাও।

পায়ের দড়িগুলো খুলতেই সমস্ত পা-টা যেন ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। দু'টো পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে আর কোনো অনুভূতি ছিল না। কিছুক্ষণ ধরে পা-টা নাড়া-চাড়া করার পর ক্রমশ তাতে রক্ত চলাচল শুরু হল এবং অসহ্য বেদনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পায়ে শক্তি আসতে লাগল। তখন তাড়াতাড়ি গার্ভিস্-সাহেবের হাতের বাঁধন সে খুলে দিল। অন্ধকারে সাহেব হাত-খোলা পেয়ে নিজের পায়ের বাঁধন খুলে ফেললেন।

গার্ভিস্-সাহেব চুপি চুপি বললেন, দড়িগুলো হাত-পায়ে জড়িয়ে অবশের মতো এখন শুয়ে থাকো, তারপর ভোরবেলা যা হয় হবে—

এমন সময়ে বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ হতেই দু'জনেই আচ্ছন্নের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। দরজা খুলে একজন লোক ঢুকল, অন্ধকারে তাঁদের উদ্দেশ করে বলল, ওঠো, বাবা-ধনেরা, রাতারাতিই তোমাদের অন্য জায়গায় পাচার করবার....

তার কথা আর শেষ হতে পারল না, সেই অন্ধকারেই শব্দ লক্ষ করে বিনয় বাঘের মতো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে তার টুঁটি এমন করে টিপে ধরল যে, লোকটা আর একটিও কথা উচ্চারণ করতে পারল না। তার অবশ দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল।

মিঃ গার্ভিস্ উঠে তাড়াতাড়ি তার জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, একটা টর্চ রয়েছে এবং কোমরে একটা রিভলভার! বিনয়ের হাতে টর্চটি দিয়ে নিজে রিভলভারটি নিলেন।

সেই ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ তাঁরা চুপ করে রইলেন, কোথাও কোনো শব্দ আসছে কি না, লক্ষ করবার জন্যে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই! দেয়াল ঘেঁষে তাঁরা দু'জনে ঘর থেকে বেরুলেন। পা টিপে টিপে এগিয়ে দেখেন, সামনের একটা ঘরে অস্পষ্ট আলো জ্বলছে! ধীরে ধীরে সেই ঘরের সামনে গিয়ে দেখেন, তিনজন লোক শুয়ে আছে আর একজন লোক বিছানা থেকে যেন সবে ঘুম থেকে উঠছে!

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বিনয় হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে দরজার শেকলটা তুলে দিল।

ঘরের ভেতর থেকে শুধু একটা তন্দ্রা-বিজড়িত ডাক এলো, ভজুয়া, আরে ভজুয়া...

ততক্ষণ মিঃ গার্ভিস্ আর বিনয় সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারিদিকে থম্‌থম্ করছে অন্ধকার! সেরকম অন্ধকারের বড় প্রয়োজন ছিল তাঁদের। কিছুদূরে দেখেন, একটা মোটর। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মোটরের পিছনে দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মোটরে কেউ নেই!

বিনয় মোটরে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মিঃ গার্ভিস্ তার হাত ধরে টেনে রাখলেন। কানে কানে বললেন, ও কাজই করো না—মোটর চালাতে গেলেই শব্দ হবে...আমাদের আর বেশিক্ষণ দেরি করা ঠিক হবে না...সামনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ি, এসো...

বিনয় বললে, একটু দাঁড়ান! তারপর মোটরের দরজা খুলে হ্যান্ডেলের সামনের খোপরে হাত দিতেই একটা ছুরি পেয়ে গেল! আর সেই ছুরিটা নিয়ে সামনের টায়ারে বসিয়ে দিলো। অন্ধকারে সহসা একটা শব্দ জেগে উঠল।

বিনয় আর মিঃ গার্ভিস্ বনের ভেতর গা-ঢাকা দিলেন।

তেরো

বিহার-অঞ্চলের জঙ্গল খুব ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। তার ওপর বিনয়ের অভ্যাস ছিল, এইসব বুনো-পথে চলা। টর্চ না জেলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর বিনয় টর্চ জ্বালল। আশেপাশে কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, চোখের সামনে গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ বিনয় ফিরে দাঁড়াল। গার্ভিস্-সাহেব বললেন, কি ব্যাপার? সামনে কিছু দেখলে নাকি? এসময় এ-অঞ্চলে বাঘ বেরোয়।

এতক্ষণ বিনয় স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে পারেনি। স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে পেরে সে যেন শরীর-মনে তার স্বাভাবিক জোর ফিরে পেলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, কিন্তু এভাবে আমাদের চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

কেন?

এখুনি ঐ বাড়িতে লোক নিয়ে এসে হানা দিতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাড়িটা কোথায়, কিভাবে চিনবো? দু'জনেই তো অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এসেছি...দৈবক্রমে সন্ধান পেয়ে এমন করে ছেড়ে চলে গেলে তো হবে না!

তা ঠিক বলেছো। কোথায় যে আমরা আছি, তার তো কোনো ধারণাই আমাদের নেই! অন্ধকারে বাড়িটার চেহারাও তো আমার মনে নেই!

চলে আসবার সময়ে বাড়ির দরজায় একটা ঢিল দিয়ে আমি চারটে ক্রাসের দাগ করে এসেছি।

Thank you, Benoy! বিপদের মধ্যেও তোমার বুদ্ধির সত্যি প্রশংসা করতে হয়। বিপদের মধ্যে পড়লে অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকই তাদের মাথা গুলিয়ে ফেলে। বিপদের মধ্যে মাথা ঠিক করে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি বাহাদুরি, তা আমি জানি।

কিন্তু এ-জায়গাটা আমরা locate করবো কি করে?

এমন সময়ে বনের ভেতর থেকে হঠাৎ মশালের আলো জ্বলে উঠল!

মিঃ গার্ভিস্ আর বিনয় দু'জনেই চম্‌কে দাঁড়ালেন।

তবে কি তারা আমাদের follow করছে?

বিনয় গার্ভিস্-সাহেবকে বলল, আপনি গাছে উঠতে জানেন?

নিশ্চয়ই!

তবে আর দেরি নয়!

এই বলে সামনে একটা বড় আমগাছ ছিল, তার ওপরে দু'জনে গিয়ে উঠলেন।

ক্রমশ মশালের আলো এগিয়ে আসতে লাগল। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো, আর তার সঙ্গে টিন-পেটানো শব্দের মতো শব্দ!

ক্রমশ শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এলো। বিনয় নিঃশ্বস ফেলে বুঝল যে, এ-শব্দ যারা করছে, তারা হচ্ছে—সাঁওতাল। নিশ্চয়ই রাত্তিরে বাঘ-টাঘ বেরিয়েছে, তাই তারা মশাল নিয়ে বনে বাঘ তাড়া করতে ঢুকেছে।

বিনয়ের অনুমানই ঠিক হল।

দেখতে দেখতে একদল সাঁওতাল সেই অরণ্যকে জাগিয়ে তুলে হৈ হৈ করতে করতে তাদের গাছতলার কাছে এলো।

মিঃ গার্ভিস্ আর বিনয় কি করবেন, ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলেন।

তারা চলে গেলে, বিনয় আর গার্ভিস্-সাহেব গাছ থেকে নামলেন। ভাবলেন, সাঁওতালদের গিয়ে ডাকেন এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাদের কাছ থেকে এই জায়গাটার সব খবর জেনে নেবেন।

সাঁওতালরা যে-পথ দিয়ে চলে গেল, তাঁর দু'জনে দ্রুত সেই পথ দিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ সেই রাত্রির অন্ধকারে, সেই নির্জন অরণ্যের মধ্যে একজন সাহেবকে দেখে সাঁওতালরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল! বিনয় এগিয়ে গিয়ে তাদের একজনকে ডেকে বলল, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই তোমাদের শব্দ শুনে আর আলো দেখে তোমাদের কাছে এসেছি!

তাদের দলের মধ্যে সাঁওতালি ভাষায় তারা কি বলাবলি করল, তারপর তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে গার্ভিস্-সাহেবকে সেলাম করে জানাল যে, একটা বাঘ বেরিয়ে তাদের বাছুর মেরে গিয়েছে, তাই তারা বেরিয়েছে বাঘটাকে মারবার জন্যে।

তার পিঠ চাপ্‌ড়ে গার্ভিস্-সাহেব বললেন, সাবাস্! সাবাস্ তোমাদের সাহস! তোমাদের গাঁ বুঝি এখানে?

হ্যাঁ। এই বনের দক্ষিণধারে হিজল-নদীর পারে আমাদের গাঁ।

গাঁয়ের নাম কি?

জোড়-জান্‌কী!

এ জঙ্গলটা কত বড়?

তা, কোশ-দু'য়েক হবে।

সামনে কোনো গাঁ আছে?

আছে।

তার কি নাম?

আমরা বলি সাহেব-কুঠি....একটা খুব বড় কুঠি আছ....সেই থেকে উ-গাঁয়ের নাম দিয়েছি সাহেব-কুঠি...

পাকা বাড়ি?

হ্যাঁ...উ-ই একটা পাকা বাড়ি!

এখানে থেকে থানা কত দূরে?

জোড়-জান্‌কীতে থানা আছে।

তোমাদের একটা লোক আমার সঙ্গে দিতে পারো? আমাদের দু'জনকে থানায় পৌঁছে দেবে...খুব ভালো বক্‌শিস দেবো...

আবার তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল এবং তাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বনের পথ ধরে তাঁরা জোড়-জান্‌কী থানার দিকে রওয়ানা হলেন।

থানায় গিয়ে যখন পৌঁছলেন, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

মিঃ গার্ভিস্ থানার ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে নিজের পরিচয় দিতে, তখনি লোকজন নিয়ে তাঁরা সাহেব-কুঠির উদ্দেশে মোটর-পথে যাত্রা করলেন।

বিনয়ের অন্তর উল্লাসে নাচছিল....

—এমনভাবে দৈব যে আমাদের পুরস্কৃত করবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি!

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মোটর সাহেব-কুঠির পথ ধরল। কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হতেই তাঁরা সেই ভোরের আধ-অন্ধকারে দেখলেন যে, সামনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে...কতকগুলো বাড়ি দাউ-দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে!

গ্রামে ঢুকে সেই আগুন লক্ষ করে গিয়ে দেখেন, যে বাড়ি খানাতল্লাসি করবার জন্যে তাঁরা চলেছেন, সেই বাড়িখানিই আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে! সামনের দরজায় তখনও আগুন লাগেনি—তখনও তাতে বিনয়ের চারটে ক্রসের চিহ্ন আগুনের আঁচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

মিঃ গার্ভিস্ আর বিনয় বুঝলেন যে, শয়তানরা সমস্ত চিহ্ন নিজের হাতেই পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়েছে।

হাতের কাছ থেকে এইভাবে শিকার পালিয়ে গেল দেখে দু'জনেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। গার্ভিস্-সাহেব স্টেশনে এসে হাজারিবাগের ট্রেনে চড়লেন। রাঁচিতে ফিরে যাবার জন্যে একটা বাস ছাড়ে, বিনয় ঠিক করল, সেই বাসেই সে রাঁচি ফিরে যাবে।

চৌদ্দ

যে-রাস্তা দিয়ে বাস ছাড়ে, সেইখানে এসে বিনয় দেখল, এক বুড়ো পুঁটলি নিয়ে বাসের অপেক্ষায় বসে আছে।

একটা কথা বলবার লোক পেয়ে বিনয় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—

আপনি বুঝি বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন?

হ্যাঁ বাবা! তুমিও বুঝি...

হ্যাঁ, আমিও বাসে রাঁচি যাবো...

ভালো হল....বৃদ্ধ লোক....আমিও রাঁচি যাবো বাবা...তা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি...বাসের বা কোনো গাড়ির তো চিহ্নই নেই।

এমন সময়ে ধুলো উড়িয়ে একখানা ভাঙা ফোর্ড-গাড়ি এসে দাঁড়াল।

শোফার গাড়ি থামিয়ে বুড়োকে ডেকে বললে, যাবেন না কি কত্তা?

যাবো বলেই তো দাঁড়িয়ে আছি...তা বাস আজ আসবে না?

বাসওয়ালারা ধর্মঘট করেছে আজ এক সপ্তাহ থেকে...জানেন না বুঝি? আমার এই প্রাইভেট-ট্যাক্সি বাসেরই কাজ করছে...

তা বেশ বাবা, তা বেশ! বলে বুড়ো পুঁটলিটি নিয়ে গাড়িতে ওঠাবার জন্যে দাঁড়াল। বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, তা, এতেই আরাম করে যাওয়া যাবে'খন...এসো বাবা, এসো!

বিনয় আর দ্বিধা না করে সেই প্রাইভেট-ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। তখন দিনের বেলা....চারিদিকে বেশ খট্‌খটে রোদ উঠেছে...

ধুলো উড়োতে উড়োতে গাড়ি রাঁচির দিকে ছুটল।

পথের দু'ধারে ছোটো ছোটো পাহাড় আর শালবন। উঁচু-নিচু পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে সামনের দিকে চেয়ে মনে হয়, পথ যেন সোজা একেবারে আকাশের কোলে গিয়ে মিশে গিয়েছে! তখনও পথের পাশে রাতের শিশির সূর্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে...মাঝে মাঝে নামহীন উড়ন্ত-পাখির দল চিৎকার করে চলেছে দিনের আহারের সন্ধানে। ক্ষণকালের জন্যে জীবনের সমস্ত ঝঞ্ঝাট, সমস্ত গণ্ডগোল, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সমস্ত লোভ ভুলে বিনয়ের মন প্রকৃতির সেই প্রভাতী রূপের মধ্যে ডুবে গেল। নিজের মনে তখন সে কল্পনার জাল বুনে চ্যলছিল, কেন মানুষ সভ্য হবার মোহে প্রকৃতির বুক থেকে এমনি করে সরে চলেছে? এই কল, কব্জা, মেশিন, শত-সহস্র যন্ত্রের নিশিদিন অক্লান্ত আবর্তন, একি মানুষকে এনে দেবে তার অন্তরের ঈপ্সিত শান্তি? মানুষ আজ ভুলে গিয়েছে, মাথার ওপর নিত্য রাত্রে ওঠে চাঁদ, ভুলে গিয়েছে, অরণ্যে অরণ্যে, ফলে-ফুলে-তৃণে নিয়ত উঠছে অব্যক্ত যে মহাবাণী, মানুষ ভুলে গিয়েছে তার পাঠোদ্ধার করতে!

ভাবতে ভাবতে বিনয় একেবারে নিজের মনের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল...হঠাৎ বৃদ্ধের প্রশ্নে তার চমক ভাঙল, অমন করে কি ভাবছো, বাবা!

ভাবছি, মানুষের লোভের কথা, তার পাপের কথা....ভাবছি, দু'মুঠো অন্নের জন্য মানুষ তার অন্তরের কী ঐশ্বর্যকে হারাতে বসেছে—

ভারি সুন্দর কথা বলো তো তুমি বাবা! তোমার বয়সের ছেলের মুখে এমন সুন্দর কথা তো আর শুনিনি কখনো! কিন্তু আমার, বাবা, এ-পৃথিবীতে বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছে! পাপ...পাপ...সব...পাপ...দেখে দেখে আমার আর কিছুতে বিশ্বাস নেই... একটা জিনিস শুধু দরকার...টাকা...অগাধ টাকা...

হঠাৎ শেষ-কথাগুলোর মধ্যে বৃদ্ধের গলায় একটা যেন আলাদা সুর এসে গেল... সে-সুর যেন বিনয় এর আগে কোথায় শুনেছে...কিছু কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

এমন সময়ে হঠাৎ একটা পথের বাঁকে গাড়িটা শব্দ করে থেমে গেল। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে দেখতে গেল কি হয়েছে! এঞ্জিনের ডালা খুলে এটা-সেটা সে নাড়তে লাগল।

বিনয় নিজে একজন খুব ভালো মোটর-মেকানিক, তাই সে আর চুপ করে গাড়িতে বসে থাকতে পারলো না। জামার আস্তিন গুটিয়ে সে এঞ্জিনে ঝুঁকে দেখতে গেল—কি ব্যাপার! এমন সময়ে ড্রাইভার পেছন থেকে একটা ছোট্ট তোয়ালে তার নাকের উপর চেপে ধরে তাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল!

গাড়ির ভেতরে বুড়োটি বলে উঠল, জোর করতে হবে না, আমার তৈরি বিষের নিশ্বাস এক সেকেন্ডের মধ্যে কাজ করে...এই পর-পর চারটে কেসেই তো পরীক্ষা করে দেখলাম—নিখুঁত!

বিনয়ের অসাড় দেহ গাড়িতে তুলে বৃদ্ধ একটা চাদরে তাকে ঢাকা দিয়ে, তার অবশ কাঁধটি নিজের কাঁধে তুলে নিলো—যেন কোনো অসুস্থ লোক তার কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে!

গাড়ি তক্ষুণি স্টার্ট নিলো, তবে রাঁচির দিকে নয়!

পনেরো

আধ-ঘুমে আধ-চৈতন্যে বিনয় শুনল, কে যেন তাকে আদেশ করছে, উঠে বসো!

বিনয় যন্ত্রচালিতের মতো উঠে বসল।

সেই কণ্ঠ আবার আদেশ করল—যাও, উঠে দরজায় খিল দিয়ে এসো!

বিনয় যেন প্রতিবাদ করবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে দরজায় খিল দিয়ে এসে বিছানায় বসল।

সেই কণ্ঠ আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি মরতে চাও?

না!

তবে, এই মরবার কাজে নেমেছো কেন?

যৌবনের ধর্ম, সে অন্যায় সহ্য করতে পারে না। আমার জীবনের ব্রত, আমি নিজে কোনো অন্যায় করবো না, কারুর কোনো অন্যায় সহ্য করবো না। আর আমি নিজে ছেলেবেলা থেকে বড় দুরন্ত—বিপদকে বরণ করবার জন্যে আমার ভেতর থেকে একটা বাসনা যেন আকুলি-বিকুলি করে! জীবন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অসীম....

তুমি জানো, তোমাকে দেখা অবধি আমার বড় ভালো লেগেছে?

জানি না। কোথায় আপনি আমাকে দেখেছেন?

প্রশ্ন করো না! প্রশ্নের উত্তর দাও শুধু! তুমি কবে কলকাতায় ফিরে যাবে?

কার্যোদ্ধার হলে, তারপর!

কি তোমার কার্য?

যে শয়তান এইসব খুন আর ডাকাতি করে অদৃশ্য রয়েছে, তাকে ধরা।

তুমি তা পারবে না।

কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি? জীবন হারাবে! আমি এখনো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি...এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করে দিতে পারি, এমন জিনিস আমার কাছে আছে....বহুদিনের বহু গবেষণার পর আমি এই বিষ তৈরি করতে পেরেছি...এর অতি ক্ষীণ গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য...কোনো যন্ত্রণা নেই—মৃত্যুর কোনো ভয়াবহ লক্ষণ নেই।

তবে...তুমি...তুমিই কি...

বলেছি না, প্রশ্ন করো না! তোমাকে দেখে কেন জানি না, বহুদিন হারিয়ে যাওয়া আমার যৌবনের কথা মনে পড়েছিল...মনে পড়েছিল, তোমারই মতন পৃথিবীকে আমি দেখতাম আদর্শবাদীর রঙিন চোখে—তারপর অতি নির্মমভাবে আমার স্বপ্ন গেল ভেঙে—কিন্তু না....তোমাকে এসব কি বলে চলেছি....তোমাকে এখান থেকে আমি ছেড়ে দেবো না...এই অন্ধকার ঘর তোমার সমস্ত যৌবন খেয়ে শেষ করে ফেলে দেবে...হয়তো তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি...কিংবা যদি তখন চাও, আমার সঙ্গেও তোমাকে নিতে পারি—যাও, এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোওগে যাও, যাও...

যন্ত্রচালিতের মতো বিনয় শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুতে শুতে সে শুনল, সেই কণ্ঠস্বর বলছে, রামশরণ, আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে...খুব হুঁশিয়ার...শীগ্‌গিরই হয়তো জ্ঞান ফিরে আসতে পারে—তার আগেই ওষুধটা খাইয়ে দিবি...তারপর...

কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না।

বিনয় অনেকক্ষণ নীরবে শুয়ে রইল। সে বুঝতে পারছিল যে, তার জ্ঞান ফিরে আসছে...কিন্তু এমনি ভান করে রইল যে, যেন যে অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দে সে ভেতর থেকে সজাগ হয়ে উঠল। সে বেশ বুঝতে পারল, যে-লোকটা ঘরে ঢুকল, সে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে এসেছে—ঘরে আলো হয়েছে। গাঢ় নিদ্রায় মানুষের যেভাবে নাক ডাকে, সেইভাবে বিনয় নাক ডাকাতে লাগল। বুঝল, লোকটা তাকে সেই ওষুধ খাওয়াতে এসেছে। সঙ্গে আর-একজন লোক। দুজনে কথা হচ্ছে—

লোকটা দেখছি, অঘোরে ঘুমুচ্ছে....

আর-একটু পরে খাওয়াবি...

দূর! আমাকে যে এখুনি যেতে হবে...গেলেই মব্‌লক্ সরিয়ে আনতে পারবো...

সব রেডি...হাজার দু'এক সরাতে পারলেই এ-কাজ ছেড়ে দি...রোজই আতঙ্কে থাকতে হয়, কখন পুলিশ এসে পড়ে...

তা, ওষুধটা তৈরি করে রেখে তুই যা...আমি তো আছি!

বিনয় মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করছিল। বুঝি, ভগবান্ সদয় হয়ে যৌবনের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তাই যাই! তবে, তুই খুব সাবধানে থাকবি...যেরকম সিদ্ধি খেয়ে আছিস্, ঘুমিয়ে না পড়িস্...

তুই হাসালি দেখছি...একটা দুধের বাচ্চা, ওকে এক ধমকেই ওখানে শুইয়ে রাখবো...তুমি যা...

বিনয় কিছুক্ষণ পরে বাইরে সদর দরজা খোলার শব্দ পেলো। চোখ চেয়ে দেখল, ঘরে কেউ নেই। কালবিলম্ব না করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা সদর দরজা বন্ধ করে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে সে যে-ঘরে ছিল, সেইদিকে অগ্রসর হল। অন্ধকারে হাত বাড়াতেই একটা কাঠের মুগুরের মতো জিনিস বিনয়ের হাতে পড়ল। লোকটা থামের পাশ দিয়ে যেতেই বিনয় পেছন থেকে সেই মুগুর তুলে সোজা তার মাথায় বসিয়ে দিলো। লোকটা একটা তীব্র আর্তনাদ করে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল! ছুটে দরজা খুলে বিনয় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হতেই দূরে সে লাল-নীল আলো দেখতে পেলো...রেলের সিগ্ন্যালের আলো। সেই আলো যেন ভগবানের প্রদীপ...সেই আলো লক্ষ করে চলতে চলতে সে রেল-লাইনের ওপর এসে পড়ল। রেল-লাইন ধরে কিছুদূর অগ্রসর হতেই সে একটা ছোট স্টেশনে এসে পৌছল। স্টেশন-মাস্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানল যে এক্ষুনি একটা ট্রেন রাঁচির দিকে যাবে। বিনয় সমস্ত কথা স্টেশন-মাস্টারকে বলতে, তিনি গাড়ি এলে, গার্ডের কামরায় বিনয়কে তুলে দিলেন। গাড়ি যখন রাঁচিতে এসে পৌছল তখন ভোর হয়ে গিয়েছে!

গাড়ি থেকে নামতেই বিনয় দেখে, অধ্যাপক কান্হাইয়ালাল!

বিস্মিত হয়ে বিনয় জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনি! আপনিও কি এই ট্রেনে এলেন?

না বাবা, ভোরবেলা এই বেড়ানোটুকুই হল আমার আনন্দ!

আমার বড় তাড়াতাড়ি আছে, এখন আসি...বলে বিনয় চলে গেল।

ষোলো

বাড়ি পৌছে বিনয় দেখল, হরিহর খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে বসে আছে। তার দেহ যেন অর্ধেক হয়ে গিয়েছে!

উঃ! কি দুর্ভাবনায় না ছিলাম! তোকে যে ফিরে পাবো সে আশাও করিনি...

যার জীবনের মেয়াদ ফুরোয়নি, তাকে কেউ মারতে পারে না, ভাই! আমাদের পুরাণে আছে, বালক প্রহ্লাদকে মত্ত হাতির পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর মত্ত হাতি শুঁড়ে করে তাকে পিঠে তুলে নিয়েছে! পুরাণ বাদ দিলেও, আমরা প্রত্যক্ষ-জীবনে এমনি ঘটনা কত ঘটতে দেখেছি। লিভিংস্টোন আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহের মুখে চলে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি মরেননি; বেঁচে থেকে তিনি লিখে গেলেন, সিংহের মুখে পড়লে মানুষের মনের কি অনুভূতি হয়...

ভগবান্ যা করেন, সব মঙ্গলের জন্যেই! আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তোর কি হল, তাই বল্!

বিনয় আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলে হরিহরের কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল, যে-লোক এই কাজ করে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে!

কোথায়?

অর্ধ-জাগরণের মধ্যে! সে-লোকটা ওস্তাদ্ হিপ্নটিক্...আমাকে হিপ্নটিজম করে রেখেছিল। কিন্তু সবল মনের ওপর অনেক সময়ে হিপ্নটিকের যাদু ব্যর্থ হয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার যা যা কথা হয়েছিল, আমার সব মনে আছে এবং সকলের থেকে মনে আছে তার কণ্ঠস্বর...

হরিহর চিন্তিত হয়ে বলল, কিন্তু তাতে আমাদের তদন্তের কি সুবিধে হবে?

সেদিন অর্থ-চেতনার মধ্যে সে-কণ্ঠস্বর আমি আরো দু'বার শুনেছি এবং সেই কণ্ঠস্বর হল...

বিনয় হঠাৎ থেমে গেল। হরিহর উৎকণ্ঠায়, চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠছিল। কিন্তু বিনয় বলল, আমি আরো দু'দিন সময় নেবো...এতবড় একটা শয়তানি-কাণ্ডের শেষ সিদ্ধান্ত এত দ্রুত আমি করতে চাই না...আমি এই দু'দিনের মধ্যেই আমার অনুমানের পেছনে যে প্রমাণের প্রয়োজন, তার যোগাড় করবো...ইতিমধ্যে আমি একবার গোপনে আজ রাত্রিতে অধ্যাপকের বাড়ির ভেতরে ঢুকবো...

হরিহর বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, অধ্যাপক!

আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, সেই অদৃশ্য শয়তান হল স্বয়ং অধ্যাপক...অর্ধ-চেতন অবস্থায় তার নিজের মুখ থেকে আমি শুনেছি যে, সে এমন একটা বিষ তৈরি করেছে, যার দৈহিক-প্রতিক্রিয়া কিছু নেই এবং যা এক নিমেষেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে...আমার বলিষ্ঠ মন সেই অর্থ-চেতনার ভেতর থেকে এই কথাগুলো সংগ্রহ করে রাখতে ভোলেনি...সেইসব কণ্ঠস্বরগুলো যে এককণ্ঠ থেকেই বেরিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে আসবার আগে...আমি তার বাড়ির ভেতর একবার ঢুকে দেখতে চাই...

হরিহর বিনয়ের দু'টি হাত ধরে বলল, ভাই আমিও যাবো!

বাড়ির ভেতরে দু'জনে যাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। তুই বরঞ্চ বাইরে কোনো জায়গায় অপেক্ষা করে থাকবি। যদি আমার ফিরে

আসতে অহেতুক বেশি দেরি হয়, সোজা থানার এসে গার্ভিস্-সাহেবকে খবর দিবি, কেমন?

সতেরো

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চারিদিক অন্ধকার। এত অন্ধকার যে, পাশ দিয়ে কেউ গেলে বুঝি দেখা যায় না। অধ্যাপকের বাড়ির কাছাকাছি এসে বিনয় হরিহরকে একটা বড় পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করতে বলে সন্তর্পণে অগ্রসর হল। অধ্যাপকের বাড়িতেও আলোর চিহ্ন নেই।

বাড়ির সামনে এসে সে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই! গেট ঠেলতে দ্যাখে, ভেতর থেকে বন্ধ! পাঁচিল ধরে ধরে খানিকটা অগ্রসর হয়ে সে দেখল, পাঁচিলটা এক জায়গায় ভাঙা, সেখানে নিবিড় জঙ্গল। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে, মাটির দিকে মুখ করে সে টর্চটা জ্বালল; তারই আলোয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সে অগ্রসর হতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে সে অধ্যাপকের বাড়ির পেছন দিকে এসে পড়েছে বলে তার মনে হল। চুপ করে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। না, একটা কুকুর-বেড়াল নড়ারও শব্দ নেই...সামনে দেখল, একটা টিনের শেডের মতো ঘর। তার ওপর দিয়ে দোতলায় গিয়ে সে উঠল। হাত বাড়িয়ে দ্যাখে, দোতলার বারান্দা থেকে বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজা খোলা! এ কি—সৌভাগ্য, না ফাঁদ? ফাঁদই হোক, আর যাই হোক, তাকে ঢুকতে তো হবেই।

খোলা দরজা দিয়ে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে দেখলে, সামনের ঘরও খোলা। বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে সে-ঘরে ঢুকে পড়ল—ঘরে ঢুকতেই একটা বিচিত্র রকমের গ্যাসের গন্ধ তার নাকে এলো। সাহসে ভর করে সে টর্চ জ্বেলে দেখলে, সেটা একটা কেমিক্যাল-ল্যাবরেটরি! আশ্চর্য! এই ভাঙা-বাড়ির ভেতরে একি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম? তার জ্ঞান-পিপাসু চিত্ত এক নিমেষের জন্যে সেই অপরূপ বৈজ্ঞানিক আয়োজন দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেল; কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, এখন সে ছাত্র নয়...ল্যাবরেটরি দেখে বিস্মিত হবার সময় তার নেই...তাহলে, এই ল্যাবরেটরি থেকেই সেই বিষের সৃষ্টি হয়েছে! অতি সন্তর্পণে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বিনয় যে-ঘরে এসে দাঁড়ালো, তার সামনে দুটো জানালা, দুটো জানালাই খোলা...

কিন্তু কোথাও তো কারুর সাড়া-শব্দ নেই। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পড়ল...সিঁড়ি দিয়ে সে নীচে কয়েকধাপ নেমেছে...এমন সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাড়িটা আলোয় ভরে উঠল...সমস্ত ইলেকট্রিক আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল...

স্তম্ভিত বিনয় দেখল, সামনে সিঁড়ির নীচে ফুচি তার দিকে পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে! পেছনে একটা বিরাট অট্ট-হাস্য জেগে উঠল। বিনয় ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তবে দিকে পিস্তল লক্ষ করে আর-একজন লোক।

বিনয় বুঝল যে, সে ফাঁদে পড়ে গিয়েছে! জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে ভাববার বা চিন্তা করবার খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না এবং আমার বিশ্বাস, তখন মানুষের মস্তিষ্ক মানুষকে আর চালায় না, মানুষকে তখন চালায় তার সহজাত আদিম ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌গুলো...তারি প্রেরণায় বিনয় হাসতে হাসতে সিঁড়ির উপরের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, অধ্যাপক কোথায়? তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম!

লোকটি মৃদু হেসে বলল, তা, দেখা না করে চুপি চুপি চলে যাচ্ছেন কেন, আসুন, ওপরে উঠে আসুন!

বিনয় কোনো দ্বিরুক্তি না-করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সে পেছন ফিরে না দেখলেও স্পষ্ট অনুভব করছিল যে, ফুচি পিস্তল নিয়ে তার পেছনে-পেছনে উঠছে।

নিরুপায় হয়ে লোকটির অঙ্গুলি-নির্দেশে বিনয় সিঁড়ির সামনে একটা ঘরে ঢুকল...

লোকটি হেসে বলল, অমন চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলেন যে? আমাদের বাড়িতে এলেন, আদর-আপ্যায়ন কিছুই হল না, অমনি-অমনি চলে যাবেন? তা, অতিথি-সৎকারে ত্রুটি দেখে রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন বুঝি?

বিনয়ের তখন সমস্ত মন পড়েছিল একটিমাত্র চিন্তায়...কি করে সেই ঘর থেকে বেরুনো যায়...অবশ্য কানে সে সব কথাই শুনছিল।

লোকটির ব্যঙ্গের উত্তরে বিনয় শুধু বলল, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভ কি? অধ্যাপক সাহেবের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারলে সুখী হতাম...

নিশ্চিন্ত থাকুন! মৃত্যুর আগে, সে সুখের স্বাদ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন!

মৃত্যু! তার সম্ভাবনা এখানে আছে নাকি?

নেই বলা কি ঠিক হবে?

বিনয়ের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দেওয়া যায়! ঘরের বাইরে নীচেই জঙ্গল...যেখানে সে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তার পেছনে জানলা...জানলার পেছনে জঙ্গল...এই জানলাই একমাত্র তার মুক্তির পথ...মনে মনে এক মুহূর্তের মধ্যে বিনয় সব ঠিক করে নিলো...মরতেই তো হবে—তবে, এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করে কি লাভ?

বিনয় যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে টেবিলের ওপর একটা বড় পাথর পড়েছিল—শৌখিন পেপার-ওয়েট! সেটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বিনয় জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিনয়ের হাব-ভাব দেখে লোকটি বলল, আপনি মনে মনে যা ভাবছেন, তাতে সুবিধে হবে না। আপনি কোথায় ঢুকেছেন আপনার তা ধারণা নেই, আর এতক্ষণ যে আপনি বেঁচে আছেন সে শুধু কর্তার দয়ায়! নইলে...

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই পাথর এক নিমেষে গিয়ে বাল্‌বে লাগতে

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে বিনয় স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে জঙ্গলে পড়ল...

লোকটা গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময়ে একজন লোক তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল...তার দরকার হবে না—পাঁচিলের ওপরের তারগুলোতে ইলেকট্রিক-কারেন্ট চালিয়ে দিয়েছি...

বিনয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পাঁচিলের কাছে আসতেই দেখল যা আগে তার চোখে পড়েনি...পাঁচিলের ওপর কাঁটা-তারের বেড়া। গেটের আলো জ্বলে উঠেছিল—তারি আলোয় বিনয় দেখল, পাঁচিলের ওপর ঠিক সেই সময়ে গাছ থেকে একটা কাঠবেড়ালি লাফিয়ে পড়ল...কিন্তু তারের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রাহতের মতো কাঠ হয়ে লট্‌কে পড়ে গেল! তখন এক নিমেষের মধে বিনয়ের মনে ধারণা হয়ে গেল যে, এই তারগুলোর সঙ্গে ইলেকট্রিক কারেন্টের যোগ আছে...পাঁচিলের যেখান দিয়ে সে ঢুকেছে, তা খুঁজে বার করতে হলে...গুলির আঘাতেই প্রাণ দিয়ে হবে...তখন জেগে উঠল অ্যাথ্‌লেট্ বিনয়...খানিকটা রেস করে এসে সে লাফ মারল...পাঁচিলের তারের এক বিঘৎ ওপর দিয়ে সে বাইরে গিয়ে পড়ল—

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন লোক সজোরে তার ওপর এসে পড়ল!

সঙ্গে-সঙ্গে শুনল, কে হুকুম দিচ্ছে—ছোড়ো মৎ।

আঠারো

লোক-তিনটির সঙ্গে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর হঠাৎ একজন লোক বলে উঠলো, আরে, এ যে বিনয়বাবু!

পাশেই পণ্ডিতজী আর হরিহর দাঁড়িয়েছিলেন। টর্চের আলোয় তাঁরা দেখলেন, ডাকাত বলে পুলিশগুলো যাকে ধরেছে, সে ডাকাত নয়—বিনয়!

কি ব্যাপার?

সে পরে হবে। পণ্ডিতজী, আপনি এখানে?

দেরি দেখে হরিহরবাবু থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে মিঃ গার্ভিস্ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বড় ভালো হয়েছে! এখুনি এই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে এবং বাড়িতে যে-যে আছে, সকলকে গ্রেফ্‌তার করতে হবে। আপনার সঙ্গে লোক ক'জন?

সবসুদ্ধ দশজন!

ভালোই হয়েছে। পাঁচজনকে দিয়ে এই বাড়িটা ঘেরাও করে রাখুন, আর পাঁচজন আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকবো।

ফটকের কাছে এসে তারা দেখল যে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে যে ইলেকট্রিক তার চলে গিয়েছে—ফটকের ওপর দিয়েও তা চলে গিয়েছে!

পিস্তলের নলটা তারের কাছে নিয়ে গিয়ে গুলি করতে তারটা ছিঁড়ে গেল। এইভাবে বাকি দুটো তারও ছেঁড়া হল। বিনয় আশা করেছিল যে, গুলির প্রত্যুত্তর হয়তো বাড়ির দিক থেকে আসবে, কিন্তু সেখানে যে কোনো প্রাণী আছে, তার অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্তও পাওয়া গেল না।

বিনয় পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে টর্চ জ্বেলে জঙ্গলের পাশ দিয়ে অধ্যাপকের বাড়ির সামনে এলো। কোথাও জীবনের কোনো চিহ্নমাত্র নেই! এই কয়েক-সেকেন্ড আগে এখানে যে জীবন-মৃত্যুর খেলা হয়ে গেল, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।

বিনয় দেখল, বাড়ি ঢোকবার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিনয় জোরে কড়া নাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ এইভাবে কড়া নেড়ে যাওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, ভেতরে আলো জ্বলে উঠল, একজনের পায়ের শব্দও পাওয়া গেল...বিনয় আর পণ্ডিতজী এবং সঙ্গে যে পুলিশরা এসেছিল, সবাই পিস্তল উঁচিয়ে রাখল! ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। সর্বাঙ্গ কাঁথায় মুড়ে নির্লিপ্ত নির্বিকার মুখ নিয়ে ফুচি চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা এত রাত্রিতে...কি চান আপনারা?

পণ্ডিতজী চিৎকার করে উঠলেন, তোমাদের শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে চাই! এই বাড়ির মালিক কোথায়?

আজ্ঞে, তিনি তো আজ কয়েকদিন হল, এখান থেকে চলে গিয়েছেন!

বটে! দেখছিস, হাতে কি? বিনয় পিস্তলটা ফুচির মুখের দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করল, এই কিছুক্ষণ আগে যে-লোকটার সঙ্গে তুই আমাকে আক্রমণ করেছিলি, সে লোকটা কোথায়?

আজ্ঞে, এ বাড়িতে...আমি...আপনাকে আক্রমণ করেছিলাম? আমি তো হুজুর সেই সন্ধে থেকে ঘুমুচ্ছিলাম...

পাজি! ফের মিথ্যে কথা? কেমনভাবে মিথ্যে কথাগুলো বল্‌ছে, যেন মহাভারত পড়ছে! বল্, সে লোকটা কোথায়?

আজ্ঞে, এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ তো নেই!

বটে! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।

এই বলে পণ্ডিতজী দু'জন পুলিশকে দরজার ভেতরে পাহারায় রেখে, পিস্তলের আগায় ফুচিকে ঠেলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। সিঁড়ির মুখে আর-একজন পুলিশকে রাখলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ছোট হলঘরের মতো ঘর...সেই ঘরের দু'পাশে আর দুখানি ঘর...

এমন সময়ে সহসা যেন মন্ত্রবলে সমস্ত আলো নিবে গেল...বিনয় আর পণ্ডিতজী নিজেদের হাতের টর্চ জ্বাললেন...আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল যে ফুচি সেইটুকু সময়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

তাঁরা তাড়াতাড়ি সামনের ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় তন্ন-তন্ন করে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই!

ঘর থেকে বাইরে এসে টর্চের সীমাবদ্ধ আলোয় তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন যে, যে-দুজন পুলিশ দেওয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ দেওয়ালের সংলগ্ন ঘড়িটা একটু ফাঁক হয়ে গেল এবং তার ভেতর থেকে দুটো লোহার হাত দু'দিক থেকে বেরিয়ে, তাদের যেন গলা টিপে ধরল—এক-নিমেষের মধ্যে পুলিশ দুটি সেখানে আচ্ছন্নের মত পড়ে গেল...

টর্চের আলোয় তাঁরা দু'জনে দেখলেন, সিঁড়ির মুখে যে পুলিশটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, সেও নেই! পণ্ডিতজী এবং বিনয় বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা একেবারে মৃত্যুর মুখে চলে এসেছেন! তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরুবার জন্যে যেই দু'জনে সিঁড়ির দিকে ছুটে যাবেন, অমনি দেখলেন, ওপর থেকে একটা ইস্পাতের দরজা সিঁড়ির পথ বন্ধ করে ঝনাৎ করে পড়ে গেল! পেছন ফিরে তাঁর ভাবলেন যে, হলঘরের খোলা জানলা দিয়ে নীচে লাফ মারবেন, কিন্তু জানলার কাছে পৌঁছবার আগেই তাঁরা দেখলেন, সেখানেও জানলার ছিদ্রপথে একটা ইস্পাতের পাত এসে পড়ল...

বাঁদিকে আর-একটা জানলা ছিল...পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাও বন্ধ হয়ে গেল...

পণ্ডিতজী আর বিনয় বুঝলেন যে, তাঁর খাঁচায় আটক পড়ে গিয়েছেন।

রাগে, আক্রোশে, অজানা-আতঙ্কে পণ্ডিতজীর মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে এলো। আপনা হতে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, উঃ শয়তানটা কি কারসাজিই না তৈরি করে রেখেছে! এ যে দেখছি—কলের বাড়ি! বাইরে থেকে কিছু জানবার উপায় নেই—আশ্চর্য!

যখন তাঁরা বুঝলেন যে, সেই ঘর থেকে বেরুবার আর কোনো উপায় নেই, কতকটা হতাশ হয়ে পণ্ডিতজী আর বিনয় সামনের একটা সোফায় বসে পড়লেন। হাতে তাঁদের তখনও টর্চ দুটো জ্বলছে!

কিন্তু সোফাটায় বসতে-না-বসতেই সোফাটা সটান মাটির দিকে নেমে গেল। কিছু ভাবতে বা বুঝতে সময় না পেতে-পেতেই তাঁরা দেখলেন, মাটির নীচে একটা অন্ধকার গর্তে এসে পড়েছেন!

পণ্ডিতজী হতাশ হয়ে বিনয়কে বললেন, বিনয়বাবু, আর তো উদ্ধার নেই!

বিনয় তখন টর্চের আলো চারিদিকে ফেলে দেখছিল, কোথাও কোনো ছিদ্র আছে কিনা? একবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার! কোথাও কোনো ছিদ্র নেই!

উনিশ

বিনয় আর পণ্ডিতজী যখন পুলিশ নিয়ে অধ্যাপকের বাড়িতে ঢোকেন, তখন গার্ভিস্-সাহেবের কাছে সমস্ত খবর দিয়ে হরিহরকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন।

হরিহরের মুখে সমস্ত খবর শুনতে পেয়ে গার্ভিস-সাহেব চুপ করে আর থানায় বসে থাকতে পারলেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে, অতি শক্ত পাল্লায় তারা পড়েছে।

তিনি আর কালবিলম্ব না করে স্পেশাল কনস্টেবল নিয়ে যাত্রা করলেন। বাড়ির সামনে এসে দেখলেন, কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

দরজার সামনে শুধু সেই ক-জন পুলিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তিনি তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

...হুজুর, সেই যে তাঁরা ঐ বাড়ির ভেতরে গিয়েছেন, আর কোনো খবর নেই! আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছেন, যাতে কেউ পালাতে না পারে...কিন্তু আমরা কাউকেই পালাতে দেখিনি!

মিঃ গার্ভিস্ স্পষ্ট বুঝলেন যে, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। নিশ্চয়ই বিনয় আর পণ্ডিতজী শয়তানের চক্রের মধ্যে এমনভাবে আটকে পড়ে গিয়েছে যে তাদের বেরুবার উপায় নেই!

ফটক ভেঙে দলবল নিয়ে তিনি জঙ্গল পেরিয়ে অধ্যাপকের বাড়ির সামনে এলেন। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই! তিনি স্পষ্ট সকলকে হুকুম দিলেন যে, যে-কেউ পালাতে যাবে, অমনি গুলি করবে!

দরজায় দমাদম ধাক্কা দিতেই ফুচি দরজা খুলে দিলো। মুখে তেমনি নির্বিকার চিহ্ন, যেন কিছুই জানে না!

অধ্যাপক কোথায়?

আজ্ঞে, তিনি তো বাড়ি নেই!

কিছুক্ষণ আগে যে সব পুলিশের লোক বাড়িতে ঢুকেছিল, তারা কোথায়?

একান্ত বিস্মিতভাবে ফুচি উত্তর দিলো, হুজুর, এ বাড়িতে কেউ তো আসেনি।

মিঃ গার্ভিস্ আর তাকে কথা বলতে না দিয়ে তক্ষুনি একজন পুলিশকে হুকুম করলেন, ব্যাটার হাতে হাতকড়ি লাগাও!

এইবার বল...কোথায় তারা আছে, দেখিয়ে দে...নইলে এই গুলিতে এইখানেই তোকে সাবাড় করে দেব!

কোনো কথা না বলে ফুচি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সঙ্গে মিঃ গার্ভিস্ এবং ফুচিকে ধরে দু'জন পুলিশও উঠল। ওপরে তখন আলো জ্বলছিল! কিন্তু যেই তারা ওপরে সেই হলঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছে, অমনি এক-নিমেষের মধ্যে সমস্ত আলো নিবে গেল...

আলো নেবার সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ গার্ভিস গুলি করলেন। তাঁর পেছনে যে দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, তারা হাতের টর্চ জ্বালল....কিন্তু সেই টর্চের আলোয় দেখা গেল যে, ফুচি এবং তাকে ধরে যে দু'জন পুলিশ ছিল, তারা নেই। এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার তাঁর হাতের গুলি দেওয়ালের ঘড়িতে গিয়ে লাগতে ঘড়িটা পড়ে গেল এবং সেইসঙ্গে পেছনের দেওয়াল দু-ফাঁক হয়ে গেল!

টর্চের আলো ফেলে মিঃ গার্ভিস্ দেখলেন যে, সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে! তিনি কয়েক মিনিট ধরে ভাবলেন, কি করা উচিত। যদি দৈব-সুযোগে সে গুপ্ত-পথ তিনি দেখতে পেয়েছেন—কাল নষ্ট না করে সেই পথে যাবেন—না, এটা পথ নয়, আর একটা ফাঁদমাত্র?

হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। হলঘরে যত চেয়ার-টেবিল ছিল, তিনি টেনে এনে সেই ফাঁকের মধ্যে ভরাটি করলেন; হলঘরে যে জানলাগুলো খোলা ছিল, সেগুলোর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওপর থেকে সেগুলো ফাঁপা, অর্থাৎ তার ভেতর থেকে কিছু এসে জানলাগুলোর ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে পারে। দুটো বড় বড় আরাম-চৌকি টেনে এনে তিনি জানলার ওপর তুলে আধাআধি করে রাখলেন। তারপর, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে তিনি দু'জন পুলিশ সঙ্গে করে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামলেন এবং তিনজন পুলিশকে সেই সিঁড়ির মুখে খোলা-পিস্তল হাতে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

কিছুদূর সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে তাঁর কানে কোথা থেকে যেন অস্ফুট মানুষের স্বর আসতে লাগল! দেওয়ালের ওপর কান রেখে-রেখে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি যতই এগুতে লাগলেন, শব্দ ততই স্পষ্ট হতে লাগল। তিনি বেশ বুঝলেন, এই সিঁড়ির পাঁচিলের ওপারে কারা যেন রয়েছে, তাদের কথাবার্তা তিনি শুনতে পাচ্ছেন!

তখন তিনি দেওয়ালের গায়ে পিস্তলের মুখ দিয়ে টোকা মেরে পুলিশের সাংঙ্কেতিক-ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, পাঁচিলের ওপারে তোমরা কে? তোমরা যদি আমার সাঙ্কেতিক-ভাষা বুঝে থাক, উত্তর দাও।

অল্পক্ষণ পরে দেওয়ালে কান পেতে মিঃ গার্ভিস্ শুনলেন যে, ঠিক অনুরূপ-সঙ্কেতে পাঁচিলের ওপার থেকে তাঁর কথার উত্তর এলো...আমি পণ্ডিতজী...আমি আর বিনয় এখানে আটকা পড়ে আছি...আপনি কে?

পুনরায় টোকা মেরে মিঃ গার্ভিস্ উত্তর দিলেন, ভয় নেই! আমি মিঃ গার্ভিস্।

কিন্তু ভরসারও কোনো উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। তবে, যখন দৈব-কৃপায় সেই গুপ্ত-পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তখন তাঁর অন্তরে একটু দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয়ই সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে কোনো গুপ্ত-পথ আছে, যা দিয়ে পাঁচিলের ওপারের ঘরে যাওয়া যায়। অনুসন্ধান করতে করতে তিনি এক জায়গায় একটা জোড়া দেখতে পেলেন। পকেট থেকে একটা শিশি বার করে, তুলোয় ভিজিয়ে খানিকটা অ্যাসিড সেই জোড়ের মুখে লাগাতে, তার বৈদ্যুতিক-সম্পর্ক আপনা থেকে ঘুচে গেল এবং ফাঁকটা একটু আলগা হয়ে গেল! তখন লোহার পাত তার ভেতর ঢুকিয়ে কায়দা-মতো চাড় দিতেই ছোট্ট দরজার মতো একটা জিনিস খুলে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গার্ভিস্ শুনলেন—ধন্যবাদ মিঃ গার্ভিস্!

সেই রন্ধ্র-পথে টর্চের আলো ফেলে মিঃ গার্ভিস্ দেখলেন একটা অন্ধকার ঘরে বিনয় আর পণ্ডিতজী...

ভেতর থেকে পণ্ডিতজী বলে উঠলেন, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে, পৃথিবীতে ফিরে যাবার আর শক্তিই থাকত না...

সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে যাবার আগে, পাছে সেই পথ আবার পেছন দিক থেকে বন্ধ হয়ে যায়, সেইজন্যে তিনি সেখানে একটা লোহার রড আড়াআড়ি ভাবে লাগিয়ে, ভেতরে ঢুকে টর্চ ফেলে দেখলেন, ঘরের আর-এক কোণে দু'জন পুলিশ পড়ে রয়েছে...বিনয় আর পণ্ডিতজী এতক্ষণ তা লক্ষ করেননি...তাদের ডাকতে গিয়ে বিনয় দেখল, তারা আর উঠবে না...

তখন তাঁরা দু'জনে সেই মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

পণ্ডিতজী গা-টা একবার ঝাড়া দিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, এবার বেটাদের দেখতে পেলে হয়, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব!

মিঃ গার্ভিস্ মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু দেখা না পেলে তো নয়! সেইটেই এখন হল সমস্যা...এ-সবের কর্মকর্তা যে, সে কোথায়? এ বাড়িতে কি ঐ চাকরটা ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই? তা কখনই হতে পারে না।

তখন মিঃ গার্ভিস্, বিনয় এবং পণ্ডিতজী প্রত্যেকটি ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন এবং যেখানে দরজা বা জানলা দেখেন, সেখানেই আলো ফেলে দেখেন যে, ওপর থেকে পাতলা স্টিলের পর্দা আসবার মতো ফাঁক রয়েছে!

এইভাবে বাড়িটাকে তৈরি করে শয়তান এর ভেতরে পরম নিশ্চিন্তভাবে থাকে! এর যে-কোনো ঘরকে—সে নিজে অদৃশ্য থেকে ইলেকট্রিকের সাহায্যে একটা বন্ধ খাঁচায় পরিণত করতে পারে।

বিনয়ের দুটো চোখ বাঘের মতো জ্বলছিল...

এত বড় একটা শিক্ষিত ক্রিমিন্যালের সন্ধান যে, তার জীবনের প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চারেই সে দেখতে পাবে, তা সে কল্পনাও করেনি। একদিন এই বাড়িতে অধ্যাপক কান্‌হাইয়ালালকে সে এক অন্য দৃষ্টিতে দেখেছে, আজ তাকেই সে জগতের একজন ক্রিমিন্যালরূপে খুঁজতে এসেছে! যতই মনের মধ্যে সে সেইকথা ভাবছিল, ততই তার অন্বেষণের আগ্রহ যেন বেড়ে উঠছিল।

এ-ঘর, সে-ঘর খুঁজতে খুঁজতে প্রায় প্রত্যেক ঘর শেষ হয়ে এলো, কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না!

অবশিষ্ট একখানি ঘর বাকি ছিল। সেই ঘরে ঢুকে তাঁরা দেখলেন যে, সেটা লাইব্রেরি-ঘর।

বই-এর থাক থেকে নির্মমভাবে বইগুলো মাটিতে ফেলতে, হঠাৎ বিনয় লাফিয়ে উঠল...

বই-এর পেছনে দেওয়ালের গায়ে একটা সুইচ!

সেই সুইচ টিপতেই দেওয়ালটা দু-ফাঁক হয়ে গেল এবং তার ভেতর দিয়ে দেখা গেল যে, অধ্যাপক প্রশান্ত মুখে একটা ইজি-চেয়ার বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে দু'জন পুলিশ ও ফুচি শুয়ে আছে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে!

অধ্যাপক নিজে ইজি-চেয়ার থেকে উঠে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, এস বাবা, বিনয়!

তাঁরা তিনজনেই সেই প্রশান্ত-মূর্তি অধ্যাপকের সেই ভয়লেশহীন কণ্ঠস্বর, সেই মিষ্ট সম্ভাষণ শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা—এতদিন যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁকে সামনে দেখতে পেয়েও দরজার ওপারে যেতে ইতস্তত করছিলেন। বিশ্বাস নেই, এ বাড়ির প্রত্যেকটি দরজা-জানলা যেন তাঁদের কাছে এক যাদু-মন্ত্র-চালিত যন্ত্রের অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়ে গিয়েছিল! তাঁরা তিনজনেই হাতে রিভলভার তুলে ডাকলেন, প্রফেসর কান্‌হাইয়ালাল, এই মুহূর্তে উঠে আসুন, নইলে...

তাঁদের কথা যেন তাঁদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে অধ্যাপক তেমনি সহাস্যবদনে বলে উঠলেন—গুলি করবেন....এই তো? কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই...আমি প্রতিমুহূর্তে আপনাদের কাছ থেকে দূরে...অতি দূরে চলে যাচ্ছি এবং আর মিনিট-কুড়ির মধ্যে আপনাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে চলে যাব—আপনাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে...

বিনয় কখন অতর্কিতে খানিকটা ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল...তার মনের মধ্যে তখন দুটো জিনিস খেলা করছিল। একটাতে সে দেখেছিল যে, তার সামনে একজন জঘন্য খুনেলোক রয়েছে, যাকে শাস্তি দিতে পারলে মনে পরম পরিতৃপ্তি হয়...আর-একটাতে সে দেখছিল, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক...অসংখ্য বৈচিত্র্যহীন মানুষের গাদার ওপরে একটা অপূর্ব সুন্দর জটিল-ব্যক্তিত্ব...তার ছাত্র-মন যার সংস্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল!

ঘরের মধ্যে খানিকটা চলে গিয়ে অধ্যাপকের কথা শুনে বিনয় বলে উঠল, আপনি কি বলছেন?

বিনয়ের কণ্ঠস্বরে যেটুকু আবেগ ফুটে উঠছিল, তা মিঃ গার্ভিসের লক্ষের বাইরে যায়নি। তাই তিনি বিনয়কে সতর্ক করে দেবার জন্যে চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, বিনয়!

বিনয় সেই ডাকে যেন একটা আচ্ছন্নভাব থেকে হঠাৎ জেগে উঠল!

অধ্যাপক কানহাইয়ালাল নীরবে তাঁদের এই রঙ্গভঙ্গি দেখছিলেন। স্নেহ-কোমলকণ্ঠে তিনি বিনয়কে ডাকলেন, এস বাবা, বিনয়!

সে-আহ্বানে বিনয়ের ভেতরটা যেন দুলে উঠল!

মিঃ গার্ভিস্ দেখলেন যে, এই অদ্ভুত লোকটির রহস্যচক্রের মধ্যে তাঁরা আবার গিয়ে পড়ছেন। তিনি অধ্যাপককে ডেকে বললেন, আমরা আপনার অভিনয় দেখতে আসিনি...

তারপর বাইরে একজন সিপাইকে ডেকে আদেশ দিলেন, হাত-কড়ি লাগাও!

অধ্যাপক তেমনি মৃদু-হেসে বললেন, মিঃ গার্ভিস্, রাগ করবেন না। আপনাকে এবং আপনাদের লোকদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ নিরাশ করব....আমাকে শাস্তি দিয়ে যে-তৃপ্তি আপনি ভোগ করতেন, তা থেকে আমি আপনাকে বঞ্চিত করেছি! এখন আমার হাতে হাত-কড়ি দেওয়া আর না-দেওয়া, দুই-ই সমান! আমি আমার এই ঘটনায় পঙ্কিল-জীবনের শেষ-যবনিকা নিজের হাতেই ফেলে দিয়েছি। আপনারা না দেখতে পেলেও, আমি তা দেখছি। আমি আত্মহত্যার জন্য বিষ গ্রহণ করেছি এবং তার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ঐ ঘড়িতে যখন সাড়ে-ছ'টা বাজবে, আমিও ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব! বহুদিনের বহু সাধনার ফলে বিষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যেসব বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছিলাম, (একদিন শুধু এই ভারতবর্ষে এই বিষ-বিজ্ঞান চরম-উৎকর্ষ লাভ করে), আমি নিজের হাতে তা নষ্ট করে দিয়ে গেলাম। আমি সেকেন্ড ধরে বলে দিতে পারি যে, কোন বিষ কখন কাজ আরম্ভ করবে, আর কখন তার কাজ শেষ হবে। বোসো, বাবা বিনয়, বোসো...বসুন মিঃ গার্ভিস্...আর পণ্ডিতজী...

দেখতে দেখতে অধ্যাপকের সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল।

অধ্যাপক ইজি-চেয়ার বসে পড়লেন। বললেন, এই কাঁপুনির পর ঠিক দশ মিনিট...বসুন, আমার কাছ থেকে আপনাদের আর কোনো ভয় নেই; এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি নিজেই সব বলে যাব। আজ আপনারা তিনজনে যে বেঁচে আছেন, সে কেবলমাত্র ঐ বিনয়ের জন্যে; বিনয় জানে না...আমি ওকে দেখার পর খোঁজ নিয়ে জেনেছি—ও আমার যৌবনের বন্ধু মিঃ ঘোষের ছেলে! বিলেতে প্রথম-যৌবনে আমরা দু'জনে একসঙ্গে এক অধ্যাপকের কাছে রসায়নশাস্ত্রের এই গূঢ়-রহস্যের প্রথম দীক্ষা নিই...হঠাৎ ওকে দেখে সেইসব কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল নিজের যৌবনের কথা...ওর গায়ে তাই সাহস করে হাত দিতে পারিনি। অতি দুরূহ কষ্ট সহ্য করে হিপনটিজম শিখি, তারপর আমার জীবনে এল এক নিদারুণ ধাক্কা, তার কাহিনি বলবার সময় এখন নেই...এই টেবিলের ওপর এই দশখানি খাতাতে তার কাহিনি আমি লিখে রেখে গিয়েছি। সেইসব ঘটনার ধাক্কায় আমার মনে একমাত্র সত্য তখন জেগে উঠল, টাকা! যে-কোনো উপায়ে অগাধ টাকা যোগাড় করতে হবে...আমার হাতেই ছিল অস্ত্র—রসায়ন, হিপনটিজম এবং অপরাধ-তত্ত্ব...যা ছিল বিজ্ঞান, যা ছিল বিদ্যা, আমার প্রয়োজনে তা হয়ে উঠল, মৃত্যুর অস্ত্র। বাবা বিনয়, তুমিও এই অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কর, তোমাকে এই মৃত্যুমুখে আমি সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, ও-নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি তুমি কর না—শিব না হলে কেউ বিষ নিয়ে খেলতে পারে না....ক্রমশ জিনিসটা নেশার মতো পেয়ে বসল। একটার পর একটা পরীক্ষায় অদ্ভুত সাফল্য লাভ করতে লাগলাম। লোকের বাড়ি গিয়ে তাকেই সম্মোহিত করে তারই হাত দিয়ে সিন্দুক খুলিয়ে টাকাকড়ি-গহনা নিয়ে এসেছি...এমন

বিষ আবিষ্কার করলাম, যার কোনো দৈহিক-প্রক্রিয়া নেই; তার প্রথম পরীক্ষা করলাম, মিঃ দত্তের ওপর! বৈজ্ঞানিকের কৌতূহলের কাছে দু-একটা জীবনের কি মূল্য? তারপর এল, দ্রুত অর্থ-সংগ্রহের নেশা! আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ এনে এই বাড়ির ভেতরটা সমস্ত তৈরি করি এবং কিরকম মারাত্মকভাবে যে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে, তার প্রমাণ তোমরা পেয়েছ। কিন্তু ঘড়িতে আর বেশি সময় নেই...আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে।

আপনাদের সামনে এই যে দুটো তোরঙ্গ দেখছেন, এতে গয়না আর টাকা ভরা আছে। যারা মানুষকে বঞ্চিত করে এইসব মাটির নীচে, সিন্দুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল, আমি তাদের কাছ থেকে তার কতক-অংশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি...আমার জীবনের অন্তিম-বাসনা এই ট্রাস্ট-ডিডে আমি লিখে রেখে গিয়েছি...আপনাদের শুধু এইটুকু জানাই, এই টাকা দিয়ে যেন যে-কটা জেলায় সম্ভব হয়, মেয়েদের জন্যে হাসপাতাল তৈরি করা হয়....কেন যে আমার এই সাধ, আমার এই দশখানা খাতার পাতায়-পাতায় তা লেখা আছে...সময় হয়ে এসেছে, ক্ষমা করবেন আমাকে, গ্রেফতার করার আনন্দ থেকে আপনাদের বঞ্চিত করলাম...বাবা বিনয়...পারো তো ক্ষমা কর!

ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে ছটা বাজল। অধ্যাপক কান্‌হাইয়ালালের মাথা যেন তার প্রতিধ্বনির ধাক্কায় লুটিয়ে পড়ল!

মিঃ গার্ভিস্ মাথার টুপি খুলে ফেললেন।

... .

যেদিন বিনয় আর হরিহর কলকাতায় ফেরবার জন্যে ট্রেনে চড়ল, মিঃ গার্ভিস্ স্বয়ং এলেন তাদের দু'জনকে তুলে দিতে।

গার্ড হুইসিল দিলো।

দু'জনের হাত ধরে মিঃ গার্ভিস্ বললেন, ছুটির দিনে হাওয়া খেতে এসে তোমরা দু'জনে বাঙালি-ছেলের যে নতুন রূপের পরিচয় দিয়ে গেলে, রাঁচি তা কখনও ভুলবে না!

ট্রেন ছেড়ে দিলো—

বিনয়ের মনে হল, রাঁচির অরণ্য-লক্ষ্মী যেন শাখা-বাহু মেলে তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে—বিজয়-অভিযান শেষে বিজয়ীর পুরস্কার...

কালো



বুদ্ধদেব বসু



কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ে তিনি শুধু বললেন, উঃ...



বিজয়কৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন—উপেন, ধরো ওকে, ধরো।

ছায়া কালো কালো



মূর্ত্তিটা এক লাফে নামলো বারান্দা থেকে মাটিতে.....

ছায়া কালো-কালো

এক

১৯৪১-এর ১৯শে মে সকালবেলায় 'কলকাতা হরকরা' পত্রিকায় এমন একটি খবর বেরুল যে, মহাযুদ্ধের খবর ছাপিয়েও সমস্ত শহরকে চঞ্চল করে তুলল।

বিখ্যাত লেখক পরীক্ষিৎ মজুমদারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন, বেমালুম উধাও হয়ে গেছেন! খবরটি চমক লাগল সন্দেহ নেই, কারণ, মজুমদারমশাই বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর বই ঘরে ঘরে, তাঁর গল্প মুখে মুখে। কোনো মাসিকে তাঁর উপন্যাস বেরোতে থাকলে তার কাটতি দ্বিগুণ বেড়ে যায়! ছেলেরা, মেয়েরা, বুড়োরা, সকলেই তাঁর বই পড়তে ভালোবাসে। এই অতি প্রিয় লেখকের আকস্মিক অন্তর্ধানে শুধু কলকাতায় নয়, সমস্ত দেশে যে একটা বড়রকমের চাঞ্চল্য দেখা দেবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা চাঞ্চল্যেরও বেশি, একেবারে হুলস্থূল! এতটা হয়তো হ'ত না, যদি না ঠিক পরের দিনই, অর্থাৎ ২০শে মে পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর তারিখ ধার্য হত। ঐ তারিখে পরীক্ষিৎবাবুর পঞ্চাশ বছর পুরবে। সেই উপলক্ষে তাঁর ভক্তরা মহাসমারোহে তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন! জয়ন্তীর আয়োজন চলেছে এপ্রিল মাস থেকে। চাঁদা উঠেছে অনেক, খরচও হয়েছে ঢের! সারা শহরে প্ল্যাকার্ড পড়েছে, ১০ই মে থেকে প্রতিদিন প্রত্যেক দৈনিকপত্রে নোটিশও বেরোচ্ছে—পরীক্ষিৎবাবুকে উপহার দেবার জন্যে পঞ্চাশটি রুপোর প্রদীপ-বসানো একটি সোনার থালা প্রস্তুত। ২০শে মে বিকেলে টাউন-হলের বিরাট সভায় মেয়র সেটি তাঁর হাতে দেবেন; বক্তৃতা করবেন প্রসিদ্ধ কবি, শিল্পী ও সম্পাদকগণ; তারপর, রাত্রে শুধু তাঁর বিশেষ ভক্তদের নিয়ে একটি প্রীতিভোজ হবে ক্রোড়পতি বীমাব্যবসায়ী লালবিহারী মালাকারের কাশীপুর বাগান-বাড়িতে! আয়োজন সম্পূর্ণ, উনিশ তারিখ কেটে গিয়ে বিশ তারিখ ভোর হলেই হয়, এর মধ্যে কিনা স্বয়ং পরীক্ষিৎবাবুই অন্তর্হিত হলেন!

খবরটি প্রথম বেরোয় 'হরকরা'তেই! ফলে, এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কাগজ ফুরিয়ে গেল, আবার দশ হাজার ছাপতে হল, আর বেলা দশটার মধ্যে অন্যান্য কাগজও এক পয়সার স্পেশাল বার করলে; ঘুম থেকে উঠে যারা খবরটি পায়নি, তারা আপিসে যেতে যেতে জেনে ফেলল।

'হরকরা' পত্রিকাটি অল্পদিনের। তার সম্বল খুব বেশি নয়; 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' আর 'বঙ্গবীর'-এর দুর্দান্ত প্রতিযোগিতায় সে যে টিকে আছে, এইজন্যেই অনেকে পরিচালকদের সাধুবাদ দিয়ে থাকেন। ও সব জবরদস্ত কাগজ এড়িয়ে এত বড় একটা খবর যে 'হরকরা'তেই প্রথমে বেরুল, তার একটু ইতিহাসও আছে।

'হরকরা'র স্বত্বাধিকারী মহিম চাটুয্যে পরীক্ষিৎবাবুর বাল্যবন্ধু। সকলে জানেন না, কিন্তু এই জয়ন্তীর আয়োজনের মূলে মহিমবাবুই আছেন। তিনি স্বভাব-গোপন লোক, নাম ছড়াতে ভালোবাসেন না, নেপথ্যে থেকে যোগাড়-যন্ত্র করেন। নিজের পকেট থেকে বেশ মোটা টাকাই তিনি ফেলেছেন পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর ফন্ডে, আর নৈশ-ভোজনের ভারটা লালবিহারীবাবু যে নিতে রাজি হয়েছেন, সে একান্তই মহিমবাবুর প্ররোচনায়—নয়তো এই বীমাব্যবসায়ী, সহজে কি আর সাহিত্যের এলাকা মাড়ান! মহিম চাটুয্যের সাহিত্যপ্রীতি অসাধারণ আর পরীক্ষিৎবাবুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুতা। ১৮ই তারিখ রাত্রে তিনি তাঁর একজন সব-এডিটরকে পাঠান কথাসাহিত্য-সম্রাটের বাড়িতে, 'হরকরা'র জন্য বিশেষ একটি 'বাণী' চাই—এই অনুরোধ। সেই 'বাণী' হবে ১৯শে তারিখের 'হরকরা'র প্রধান আকর্ষণ, এইরকম তাঁর মতলব ছিল। কিন্তু 'বাণী'র বদলে কী খবরই তাঁকে ছাপতে হল!

পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি যাওয়ার ভার পড়েছিল, চঞ্চলের উপর। চঞ্চল নাগ 'হরকরা'র আপিসে কনিষ্ঠ সব-এডিটর। তাকে ছেলেমানুষই বলা চলে, কারণ, তার সবে গোঁপ উঠেছে, বয়স আঠারোর বেশি না। চঞ্চল গরিবের ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়বার সুবিধে হয়নি, তাই ঢুকে পড়েছিল 'হরকরা'র আপিসে। ডেসপাচার হয়ে ঢুকেছিল, অর্থাৎ তাকে ঠিকানা লিখতে আর টিকিট লাগাতে হত; মাইনে ছিল পনেরো টাকা! কিন্তু সুশ্রী, বুদ্ধিমান ও চটপটে এই ছেলেটি অল্পদিনের মধ্যেই মহিমবাবুর নজরে পড়ে যায়, সব-এডিটরের চেয়ারে বসতে তার বেশিদিন লাগেনি। এখন তার মাইনে, পঁয়ত্রিশ টাকা। এমন মোটা টাকা রোজগার করে চঞ্চল মহাখুশি! নামে সব-এডিটর হলেও তাকে বেশির ভাগই রিপোর্টের কাজ করতে হয়; অর্থাৎ তাকে লিখতে হয় অল্প, ঘুরতে হয় বেশি! কলকাতার কোথাও কিছু হলেই 'হরকরা'র নিজস্ব সংবাদদাতা হয়ে সেখানে সে উপস্থিত। কলকাতার বাইরেও মাঝে মাঝে যেতে হয়; ঢাকা মেল-এর শেষ দুর্ঘটনার সময় মহিমবাবু তাকেই পাঠিয়েছিলেন। এ কাজে শারীরিক কষ্ট আছে, বিপদের আশঙ্কাও যে নেই তা নয়, কিন্তু মজাও আছে নানারকম। মোটের উপর, চঞ্চলের বেশ ভালোই লাগে। অন্তত আপিসে বসে কলম পেষার চাইতে এ ঢের ভালো।

চঞ্চলের চাকরি-জীবন মাত্র দু-বছরের হলেও নানারকম শক্ত কাজ সে ইতিমধ্যেই করেছে। কিন্তু ১৮ই তারিখ রাত্তিরে পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে সে যখন বেরুল,

তার মনে হল, এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ মহিমবাবু আর কখনও তাকে দেননি। এমনকি, তার বুকটাও যেন একটু ঢিপঢিপ করতে লাগল। অথচ, কাজটা তেমন কিছুই না, মহিমবাবু আগেই টেলিফোন করে রেখেছেন, অসুবিধে হবারই কথা নয়। আসলে, এত বড় দিগ্বিজয়ী একজন কোনো লেখকের সামনে সে যে গিয়ে দাঁড়াবে, সে কথা ভাবতে চঞ্চল ঈষৎ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষিৎবাবুকে সে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছে, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছে, কিন্তু তাঁর বাড়ি গিয়ে মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে কথা বলা—কথাটা ভাবতেই যেন দম আটকে আসে!

পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি রিজেন্টস পার্কে। মহিমবাবু বলে দিয়েছিলেন রাত দশটায় যেতে—সে-সময়ে অপরাজেয় কথাশিল্পী খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করেন, লোকজনের ভিড় থাকে না। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোয় নেমে মিনিট-তিনেক হেঁটে চঞ্চল কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় 'বাণীবনে'র গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল। বাইরে থেকে সমস্ত বাড়ি অন্ধকার দেখে তার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল—হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, দেখা হবে না! যাই হোক, এসেছে যখন, খবরটা নেয়াই যাক। বন্ধ-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠল, একজন চাকর এসে বলল—'কী চাই?'

চঞ্চল ঢোঁক গিলে বলল, 'পরীক্ষিৎবাবু আছেন? আমি 'হরকরা'র আপিস থেকে আসছি।'

'আসুন।'

চাকরটি, যাই হোক, বেশ ভদ্র। তাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে পাখা খুলে দিয়ে চলে গেল। চঞ্চল ধরেই নিল যে, এরপরে স্বয়ং পরীক্ষিৎ মজুমদারই ঘরে ঢুকবেন। তার বুকের ভিতর এমন শব্দ হতে লাগল যে, সে নিজের কানেই তা শুনতে পেল!

মিনিট-দশেক পরে ঘরে ঢুকলেন—পরীক্ষিৎবাবু নন, তাঁর ভাই বিজয়কৃষ্ণ! কথাসাহিত্য-সম্রাট বিবাহ করেননি, তিনি ছাড়া এ বাড়িতে থাকেন তাঁর ভাই, আর ভাইয়ের পরিবার। ভাই বয়েসে অনেক ছোটো, কাজকর্ম কিছু করেন না, করবার দরকার নেই। এই ভাইকে পরীক্ষিৎবাবু যে প্রাণতুল্য ভালোবাসতেন, তা সবাই জানে।

বিজয়কৃষ্ণ ঘরে ঢুকে বললেন, 'দাদা তো বাড়ি নেই!'

চঞ্চল কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'আমি 'হরকরা' আপিস থেকে আসছি। মহিমবাবু আমাকে বলেছিলেন...'

'হ্যাঁ, তাঁর টেলিফোন পেয়েছিলুম। দাদা সে সময়েও ছিলেন না; আমি বলেছিলুম, তিনি এলেই বলে রাখব।'

'কোথায় গেছেন তিনি?'

'রোজই সন্ধের আগে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যান, আজও তাই গেছেন। আটটার মধ্যে রোজই ফেরেন—এত দেরি তো কখনো হয় না।'

'তাহলে...'

'আপনি একটু বসুন, এক্ষুনি ফিরবেন নিশ্চয়ই!'

'অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলুম,' চঞ্চল বিনীত সুরে বললে।

'না না, বিরক্ত কিচ্ছু না।'

'আপনি হয়তো শুতে যাচ্ছিলেন?'

বিজয়কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'শুয়ে পড়েও ছিলুম, কিন্তু ঘুমুতে পারছিলুম না! দাদা তো এমন অনিয়ম কখনো করেন না, একটু দুশ্চিন্তাই হচ্ছে। চাকরদের বলে রেখেছিলুম, কেউ এলেই আমাকে ডেকে দিতে। মহিমবাবুর টেলিফোনের কথা মনে ছিল। বসুন, বসুন!'

বেশ বোঝা গেল, উৎকণ্ঠার সময়ে একজন সঙ্গী পেয়ে বিজয়কৃষ্ণ বেশ খুশিই হয়েছেন, চঞ্চলকে ছাড়তে চাচ্ছেন না।

চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'কোথাও কোনো এনগেজমেন্ট ছিল নাকি?'

বিজয়কৃষ্ণ ছোট একটি হাই চেপে বললেন, 'না তো, তেমন কিছুই ছিল না! দাদার সব এনগেজমেন্ট তো আমার মারফতই হয়। এ ক-দিনই বিশেষ করে, তিনি একেবারেই চুপচাপ কাটাচ্ছেন, জয়ন্তীটা হয়ে গেলেই আবু-পাহাড়ে গিয়ে বিশ্রাম করবেন—শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না...ওই তো, এলেন বুঝি!'

গেট পরিয়ে গাড়ি ঢোকবার শব্দ হল। চঞ্চল সন্ত্রস্ত হয়ে হাত-পা সোজা করে বসল, একটু পরেই তো মহালেখকের আবির্ভাব হবে!

বিজয়কৃষ্ণ উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর চঞ্চলের দিকে ফিরে বললেন, 'এ কি! গাড়িটা দেখছি সোজা গ্যারেজের দিকে চলে গেল। ভিতরে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল বলেও মনে হল না।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন—'কাঞ্চা! কাঞ্চা!'

ফুটফুটে ফর্সা চেহারার বছর-কুড়ির একটি নেপালি যুবক ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়াল।

'বাবু কাঁহা?'

হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কাঞ্চা যা বললে, তার মর্ম এই যে, রাত প্রায় আটটার সময়ে প্রিনসেপ ঘাটে বাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। সে আপত্তি করেছিল, বলেছিল, বাবু কেমন করে ফিরবেন তাহলে—কিন্তু বাবু তাকে জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন। পথে গাড়ির একটি টায়ার ফেটে যায়, সেইজন্য ফিরতে তার এত দেরি হল। বাবু কি এখনও ফেরেননি?

বিজয়কৃষ্ণ উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, 'সে কি! এমন অদ্ভুত খেয়াল তো দাদার কখনও হয় না! রাত্রিরে কাঁটায়-কাঁটায় ন-টার সময়ে খাওয়া তাঁর অভ্যেস, এর তো কখনও ব্যতিক্রম হতে দেখিনি! তোকে তিনি কি বললেন, ঠিক করে বল তো?'

'বললেন—তুই চলে যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'একটু পরেই যদি যাবেন, গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কী মানে হতে পারে?'

'হামি তো সে কথাই বললুম। কিন্তু বাবু গল্পে মশগুল, আমার কথায় কানই দেন না!'

'গল্পে মশগুল? তাহলে সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'হাঁ, আরও একটা বাবু ওখানে ছিলেন।'

'কে সে? চিনিস?'

'না, হামি চিনব কেমন করে?'

'বাড়িতে আসতে দেখেছিস কখনও?'

কাঞ্চা বললে যে, সেখানটায় আলো বেশি ছিল না, সে ছিল গাড়িতে বসে, আর বাবু ছিলেন একটু দূরে, ভালো করে দেখতে পায়নি।

'কেমন দেখতে সে লোকটি?'

'লম্বা।'

এই একটিমাত্র বিশেষণে কিছুই বোঝা যায় না। বিজয়কৃষ্ণ একটা অধৈর্যসূচক শব্দ করে বললেন, 'তার মুখ দেখিসনি?'

'মুখ? তা দেখেছি?'

'কেমন দেখতে?'

কিন্তু কাঞ্চা আর কিছুই বলতে পারলে না।

'পরনে ধুতি, না সাহেবদের পোশাক?'

কিন্তু এ প্রশ্নের কাঞ্চা কোনো স্পষ্ট জবাব দিতে পারলে না। বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'তুই একটা উজবুক—দাঁড়া, যাসনে এখান থেকে।'

দুই

মিনিট-পাঁচেক চুপচাপ কাটল, তারপর বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'সাড়ে-দশটা বাজল!'

চঞ্চল এতক্ষণে একটা কথা বললে, 'আমার মনে হয়, ওঁর ফিরতে দেরি হবে। হয়তো, কোথায়ও গেছেন-টেছেন। আমি তাহলে...'

বিজয়কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আপনি এক্ষুনি যাবেন না। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না!'

বিজয়বাবুর এই চিন্তিতভাব দেখে চঞ্চলের একটু হাসিই পেল। যেন এত বড় একটা পুরুষমানুষ কলকাতার শহর থেকে হারিয়ে যাবে! চঞ্চল রাত্তিরে যে-কোনো সময়ে কলকাতার যে-কোনো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—তার মনে কোনো ভয়ের ভাব আসে না। তাই সে বেশ শান্তভাবেই বললে, 'আপনি বরং শুয়ে পড়ুন গিয়ে!'

'শুয়ে পড়ব!' বিজয়কৃষ্ণ উত্তেজিতভাবে বললেন। তারপর, নিজের উত্তেজনা প্রকাশ পাওয়ায় একটু যেন লজ্জিতভাবেই তক্ষুনি আবার বললেন, 'আপনার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?'

'না, আমার রাত-জাগা অভ্যেস আছে। আপনাকে একটু আগে মনে হচ্ছিল যেন আর বসে থাকতে পারছেন না!'

বিজয়বাবু ম্লান একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার সকাল-সকাল শোয়াই অভ্যেস।'

কথাবার্তা বিশেষ এগুলো না, এগারোটা বাজল। তখন বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই দাদার কোনো বিপদ ঘটেছে—এত রাত অবধি কখনও তিনি বাইরে থাকেন না!'

চঞ্চল একটুও বিচলিত বোধ করল না। কী আর বিপদ হতে পারে? গরমের দিনে এগারোটা আসলে এমন কিছু রাতও নয়!

বিজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন! 'নাঃ, আর বসে থাকা যায় না। আমি বেরুচ্ছি দাদার খোঁজে! আপনি চলুন না আমার সঙ্গে?'

চঞ্চল বুঝতে পারল, এত রাত্তিরে গাড়িতেও একা বেরোতে প্রসিদ্ধ দাদার অর্থে ও যত্নে প্রতিপালিত এই মোটাসোটা নধর ভদ্রলোকটির সাহস হচ্ছে না। সে হাসিমুখে বললে, 'বেশ তো, চলুন। তার আগে মহিমবাবুকে একবার ফোন করতে চাই।'

'আসুন, সিঁড়ির নীচেই ফোন রয়েছে। আমি ততক্ষণ জামাটা বদলে আসছি। কাঞ্চা, গাড়ি বের কর।'

ফোনে মহিমবাবুকে পাওয়া গেল। তিনি রাত-জেগে কাজ করেন, তাছাড়া হঠাৎ যদি 'হরকরা'র কোনো দরকার হয়, সেজন্য তাঁর শোবার ঘরেও ফোনের এক্সটেনশন আছে।

'আমি চঞ্চল। পরীক্ষিৎবাবু বাড়ি নেই।'

'সে কী! বাড়ি নেই?'

'সন্ধেবেলা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।'

'এখনও ফেরেননি?' মহিমবাবুর গলা একটু কেঁপে গেল!

'বিজয়বাবু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—গাড়ি নিয়ে খুঁজতে বেরুচ্ছেন, আমাকেও যেতে বলছেন সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যস্ত হবার তো কথাই', মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর রীতিমতো উত্তেজিত শোনাল, 'তুমি যাবে বইকি বিজয়ের সঙ্গে, নিশ্চয়ই যাবে! শোনো—বিজয়কে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে তুমি সোজা আমার এখানে চলে আসবে—যত রাত্তিরই হোক। বাস-টাস না পেলে, ট্যাক্সি নিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জেগে থাকব। ভারি দুশ্চিন্তায় রইলাম, বুঝলে?'

মহিমবাবুর কথা শুনে এতক্ষণে চঞ্চলের ধারণা হল যে, এতে সত্যিই হয়তো দুশ্চিন্তার কিছু আছে! সত্যিই তো, পরীক্ষিৎবাবু হঠাৎ আজকে নিয়ম ভাঙবেন কেন? তাঁর যা বয়স আর খ্যাতি, তাতে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ইচ্ছে থাকলেও তিনি যেতে পারেন না। আর তাঁর কোনো এনগেজমেন্ট নেই, এদিকে শরীর ভালো না, জয়ন্তী সেরেই আবু-পাহাড়ে যাবার কথা। তাই তো?

একগাল পান মুখে পুরে পানের ডিবেটি পকেটে পুরতে-পুরতে তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'চলুন, চলুন, আর এক মিনিটও দেরি না!'

দু-জনে গাড়িতে উঠে বসল। কাঞ্চা জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাব?'

'আগে প্রিনসেপ ঘাট!'

চঞ্চল বললে, 'আমরা তো যাচ্ছি, এর মধ্যে উনি যদি ফিরে আসেন?'

'এলে তো ভালোই!' বিজয়বাবুর কথা শুনে মনে হল, সে আশা তাঁর মনে অতি ক্ষীণ।

খানিকক্ষণ কাটল চুপচাপ। তারপর, বিজয়বাবু হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'উপেন ধরকে দেখেছেন কখনও?'

'কোন উপেন ধর? শ্রী ইনসিওরেন্স কোম্পানির—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই।'

'দেখেছি দু-একবার। তার কথা হঠাৎ আপনার মনে হল কেন?'

'কিছুদিন ধরে দাদাকে সে ভারি বিরক্ত করছে। তার কোম্পানিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে একজন ডিরেক্টর হতে হবে। দাদা নেহাৎ ভালোমানুষ—মুখের উপর কাউকে 'না' বলতে পারেন না—ভেবে দেখি, আচ্ছা কাল এস—এইভাবে দিন কাটছে। কাল সকালে তার আসবার কথা—কাল দাদাকে একেবারে রাজি করিয়ে পরশু, অর্থাৎ জয়ন্তীর দিন সকালে দাদার ছবি দিয়ে সব কাগজে মস্ত বিজ্ঞাপন দেবে, এইরকম তার মতলব! হাতে-পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে; অথচ, এসব ব্যাপারের মধ্যে যাবার ইচ্ছে দাদার একেবারেই নেই, লোকটা এমন নাছোড়বান্দা যে, কী বলব!'

এই ঘটনার সঙ্গে পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি না-ফেরার কী সম্বন্ধ, চঞ্চল তাই ভাবছে, এমন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'উপেন ধর লোকটা বেশ লম্বা।'

কথাটা শুনে চঞ্চল হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই বললে, 'আপনার কি মনে হয়, উপেন ধর আপনার দাদাকে কোনোরকমে—'

'অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয়।'

চঞ্চল মনে-মনে খুব একচোট হেসে নিল, মুখে কিছু বললে না।

প্রিনসেপ ঘাটে এসে কিছুই হদিশ মিলল না। মস্ত-মস্ত জাহাজগুলো আলো নিবিয়ে চুপ, নৌকোগুলোর গায়ে ধাক্কা লেগে জলের ছলছল শব্দ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। পরীক্ষিৎবাবু যেখানে বসে ছিলেন, অন্য লোকটি যেখানে বসে ছিল, সে-সব জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হল—বিজয়কৃষ্ণ একটি টর্চ সঙ্গে আনতে ভোলেননি! বিজয়বাবুর এই বাড়াবাড়িতে চঞ্চলের মনে-মনে একটু রাগই হচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ছোট্ট সাদা চকচকে একটা জিনিস তার চোখে পড়ল। সেটা কুড়িয়ে নিতেই পাশ থেকে বিজয়বাবু বলে উঠলেন—'কী, কী ওটা? দেখি!'

চঞ্চল উল্টিয়ে দেখল, বিশেষ-কিছু নয়, একটা ভিজিটিং কার্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা—

বৃন্দাবন গুপ্ত

চঞ্চল নিঃশব্দে কার্ডটি বিজয়বাবুর হাতে দিলে। সেটার দিকে একবার তাকিয়েই বিজয়বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কাঁপা-গলায় বললেন, 'অ্যাঁ! এ কী! বৃন্দাবন গুপ্ত!'

চঞ্চল শান্তভাবে বললে, 'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? তুমি বলছ কী হে ছোকরা! বৃন্দাবন গুপ্ত কে, জান তো?'

হঠাৎ এই 'তুমি' সম্বোধনে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে চঞ্চল বললে, 'তা জানি।'

'দাদার এত বড় সাহিত্যিক শত্রু বাংলাদেশে আর কেউ নেই, জান তো? দাদা প্রথম যখন লিখতে আরম্ভ করেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত, এই তিরিশ বছর ধরে দাদাকে ও কী অশ্রাব্য গালাগালই না করে আসছে! ক্ষতি করবার চেষ্টাও কম করেনি, কিছু করেওছে! এই জয়ন্তীর ব্যাপার নিয়ে, "দোর্দণ্ডপ্রতাপে" এই কুৎসিত প্রবন্ধগুলো কে লিখেছে? এই বৃন্দাবন। নিজের কাগজ ছিল "শার্দূল"—সবাই বলত "লাঙ্গুল"—সে-সব চুকিয়ে দিয়ে এখন "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র কাঁধে ভর করেছে। ছাপার কালি ছিটিয়ে ওর রাগ কমেনি—এখন দেখলে তো কাণ্ডটা!'

চঞ্চল বললে, 'বোঝা যাচ্ছে না।'

'বোঝা যাচ্ছে না মানে? নিশ্চয়ই ও দাদাকে কিডন্যাপ করেছে—জয়ন্তী ভণ্ডুল করে দেবে! উঃ, কত বড় শয়তান! কিছু অসম্ভব নয় ওর পক্ষে—খুন করেও ফেলতে পারে। উঃ!' বিজয়কৃষ্ণ হতাশভাবে দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘাটের সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন।

চঞ্চল সান্ত্বনার সুরে বললে, 'আহা—আপনি এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন? একটা ভিজিটিং কার্ড থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। হয়তো বৃন্দাবনবাবুও এখানে বেড়াতে এসেছিলেন—তাঁর পকেট থেকে দৈবাৎ ওটা পড়ে গেছে!'

'দেখছ না—কার্ডটা একেবারে নতুন! আজই পড়েছে এখানে।'

'হয়তো আজই এসেছিলেন।'

'তুমি কি বলতে চাও, বৃন্দাবন মিছিমিছি এসেছিল? তুমি কি বলতে চাও, এখানে থাকলেও দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি?'

চঞ্চল কোনো জবাব করলে না। হতে অবশ্য তাও পারে, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য এমনভাবে মিলে যাচ্ছে যে, সন্দেহ হওয়া অন্যায় নয়! একটু পরে সে বললে, 'প্রথমে কিন্তু আপনি উপেন ধরকে সন্দেহ করছিলেন। তাছাড়া, ড্রাইভার যে লোকটাকে দেখেছিল, সে লম্বা! আর বৃন্দাবনবাবু তো ছোটোখাটো ডিসপেপটিক মানুষ!'

'তুমি দেখেছ বৃন্দাবনকে?'

'আমায় যে কাজ করতে হয়, তাতে সকলকেই একটু-আধটু চিনতে হয়!'

'তুমি ওকে চেন?' বিজয়কৃষ্ণ এমনভাবে চঞ্চলের দিকে তাকালেন যে, এ-ব্যাপারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে বলে যেন তিনি তাকেই সন্দেহ করেছেন!

'না, এমন-কিছু চিনি না। তবে চেহারা চিনি।'

'তুমিও যেমন! ও নিজে আসবে নাকি এ-কাজ করতে? ওর ভাড়াটে সব গুন্ডা আছে না? সাহিত্যিক গুন্ডামিই তো ওর পেশা!'

'তাহলে, গুন্ডার পকেটে কি ওঁর কার্ড ছিল? আর ভুল করেও এ-রকম একটা প্রমাণ রেখে যাবে, এমন কাঁচা ছেলেই কি বৃন্দাবন গুপ্ত?'

কিন্তু এ-সব যুক্তির কোনো জবাব না দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ শুধু বলতে লাগলেন, 'উঃ, কী ভয়ানক! কী ভয়ানক! এখন কী করি?'

চঞ্চল বললে, 'আপাতত চলুন গাড়িতে গিয়ে উঠি—তারপর ভেবে-চিন্তে যা-হয় একটা ঠিক করা যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয়কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। দু-জনে রাস্তার দিকে দু-পা এগিয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখলে, তাদের সামনে দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক দৌড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চলের হাত আঁকড়ে ধরে কেমন অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'উপেন ধর! ধর ওকে, ধর।'

বিজয়বাবুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চঞ্চল প্রাণপণে ছুটল, কিন্তু অন্ধকারে কোথায় যে মিলিয়ে গেল লোকটা, তার পাত্তাই নেই!

মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে চঞ্চলের কাছে এসে বিজয়বাবু বললেন, 'কোথায়?'

'কী যেন! লোকটা যেন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল! আপনি ঠিক দেখেছিলেন?'

দু-জনে স্তব্ধ হয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে চঞ্চল বললে, 'উপেনবাবুকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না! এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও আর লাভ নেই।'

একটু দূরে গাছের তলায় আলো নিবিয়ে দিয়ে কালো রঙের গাড়িটা অন্ধকারে প্রায় মিশে ছিল, দু-জনে গিয়ে উঠে বসতেই কাঞ্চা স্টার্ট দিলে। —'কোনদিকে যাব?'

চঞ্চল বললে, 'চল তো, বলছি।' সে স্বপ্নেও ভাবেনি, পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি না-ফেরার মধ্যে এত-কিছু থাকতে পারে। কার্ডটা না-হয় যা-হোক করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এত রাত্রে উপেন ধর মশাই এখানে কী করছিলেন? তাঁর অমন করে পালানোরই-বা অর্থ কী? আর, কোথায়-বা পালালেন?

বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে উপেন ধরের কি কোনো যোগাযোগ আছে? সব মিলিয়ে একটা দুর্বোধ্য রহস্য চঞ্চলের মনের মধ্যে রচিত হতে লাগল, তার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে!

তিন

গাড়ি যখন খিদিরপুর ব্রিজের কাছাকাছি এসেছে, চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'বাড়ি ফিরবেন?'

বিজয়বাবু ক্লান্ত-স্বরে বললেন, 'ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে ঠেকছে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

চঞ্চল বললে, 'সত্যি যদি কোনো গুন্ডামি সন্দেহ করেন, তাহলে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। তার আগে হাসপাতালগুলোতে একবার খবর নেওয়া ভালো—যদি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েই থাকে।'

'বেশ।'

চঞ্চল গাড়ির মুখ ঘোরাতে বললে। কলকাতার সবকটা হাসপাতালে খবর নেওয়া হল। কোনো হদিশ মিলল না। আর যাই হোক, পরীক্ষিৎবাবু গাড়ি-চাপা পড়েননি।

রাত তখন প্রায় দুটো। এরপরে থানায় খবর দেওয়া শুধু বাকি। হঠাৎ চঞ্চলের মনে হল, মহিমবাবু এখনও হয়তো তার জন্য জেগে বসে আছেন। সে তাড়াতাড়ি

বললে, 'আমাকে এখন একবার মহিমবাবুর বাড়ি যেতে হচ্ছে। তিনি পরীক্ষিৎবাবুর খবরের জন্য ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন, যত রাতই হোক, তাঁকে একবার জানিয়ে যাই যেন!'

'বেশ তো, চল, আমিও যাচ্ছি তাঁর কাছে! পুলিশে খবর দেবার আগে তাঁর পরামর্শটাও নেওয়া যাবে!'

মহিমবাবুর বাসা বাগবাজারে। গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই চঞ্চল লক্ষ করল, নীচে মহিমবাবুর আপিস-ঘরে আলো জ্বলছে। যা ভেবেছিল—তিনি অপেক্ষা করছেন। আস্তে টোকা দিতেই দরজা খুলে দিলেন মহিমবাবু স্বয়ং। খোলা গায়ে সাদা পৈতেটি ঝুলছে, চোখে চশমা, দাড়িগোঁফ কামানো সৌম্য প্রৌঢ় মুখ। তাকে দেখেই বললেন, 'এস। বিজয়ও এসেছ? এস, ঘরে এস।'

উপরিওলাকে কেউ সাধারণত দেখতে পারে না, কিন্তু চঞ্চল মহিমবাবুকে ভারি পছন্দ করে। চমৎকার মানুষটি! অসাধারণ পরিশ্রমী, আলাপে মধুর, ভদ্রতায় ত্রুটি নেই। সবই ভালো, কিন্তু—চঞ্চলের ধারণা—বুদ্ধি তাঁর একটু কম, তাই এত গুণ নিয়েও ব্যবসায়ে কৃতী হতে পারেন না। অথচ ব্যবসার দিকে ঝোঁক তাঁর বরাবরই। এম.এ. পাশ করে প্রফেসারিতে ঢোকেন, কিন্তু নন-কো-অপারেশনের হুজুগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের দলে ভেড়েন, তারপর হুজুগ যখন কমে এল, 'চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ক' নাম দিয়ে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। দশ বছর দিব্যি চলবার পর ব্যাঙ্কটি হঠাৎ একদিন ফেল পড়ে; কে একজন জাল শেয়ার বেচে তিন লাখ টাকা সরিয়ে নেয়। তারপর কিছুদিন তাঁর দারুণ দুরবস্থায় কাটে—কিন্তু দমে যাবার পাত্র মহিম চাটুয্যে নন। আবার ঘোরাঘুরি করে টাকাকড়ি যোগাড় করে 'কলকাতা হরকরা' বার করলেন, সে আজ বছরচারেক হল। কাগজটির যে আরও তাড়াতাড়ি এবং আরও বেশি উন্নতি হচ্ছে না, তারও কারণ চঞ্চল ভেবে দেখেছে—আর কিছুই নয়; মহিমবাবুর অতিরিক্ত ভালোমানুষি, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধির অভাব।

তাদের ঘরে বসিয়ে মহিমবাবু প্রথম কথা বললেন, 'দু-জনেরই চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, একটু চা দরকার।'

বিজয়কৃষ্ণ ক্ষীণ আপত্তি করলেন, কিন্তু তার আগেই মহিমবাবু গিয়ে ইলেকট্রিক-কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই ঘরটি বেশ বড়। মাঝখানে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চামড়ায়-মোড়া খুব চওড়া কয়েকটি চেয়ার, দেয়ালে-লাগানো আলমারিগুলো মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা, এক কোণে একটি ছোট টেবিলে ইলেকট্রিক কেৎলি আর চায়ের সরঞ্জাম। অনেক সময়ে তিনি এ ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন, দরকার মতো নিজেই চা তৈরি করে খান, চাকর ডাকেন

না। ঘরটিতে এমন আরাম আর এমন একটি লেখাপড়ার আবহাওয়া যে, চঞ্চলের ভারী ভালো লাগে। সে ভেবে রেখেছে যে, কোনোদিন যদি তার পয়সা হয়, তাহলে ঠিক এরকম একটি ঘরে সে থাকবে।

চমৎকার গরম চা আর কয়েকখানা বিলেতি বিস্কুট তাদের সামনে রেখে মহিমবাবু বললেন, 'খাও।'

চঞ্চল বেশ সাগ্রহেই খেল। তার রাত্তিরের খাওয়া আজ হয়নি, রীতিমতো খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণও শব্দ করে করে সবটুকু চা খেলেন, বিস্কুট ছুঁলেন না। বোঝা গেল, চা খেতে তাঁর অভ্যেস নেই; এই উত্তেজনার সময়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠবার আশায় খেলেন।

চা খাওয়া হয়ে গেলে মহিমবাবুই নিজের হাতে পেয়ালাগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'কী খবর?'

চঞ্চল সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললে।

শুনে মহিমবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

'কিছু তো বুঝতে পারছিনে, তবে গোলমেলে মনে হচ্ছে! কী করবে?'

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'পুলিশে খবর দিতে চাই।'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি? দেখি কার্ডটা!'

বিজয়কৃষ্ণ সযত্নরক্ষিত কার্ডটি বের করে মহিমবাবুর হাতে দিলেন। মহিমবাবু কার্ডটি একটু নেড়ে-চেড়ে কপাল কুঁচকে বললেন, 'উপেন ধরকে ঠিক দেখেছিলে?'

বিজয়কৃষ্ণ বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'ঠিক দেখেছিলাম। আমার কক্ষনো ভুল হয়নি।'

'এখন একবার শেষ আশা। পুলিশে খবর দেবার আগে বাড়িতে একবার ফোন কর, বিজয়।'

কথাটা শুনে হঠাৎ চঞ্চলের মনে হল হয়তো এ-সব কিছুই নয়, হয়তো পরীক্ষিৎবাবু এখন বাড়ির বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমুচ্ছেন।

ফোন ধরল পরীক্ষিৎবাবুর পুরোনো প্রিয় চাকর নিমাই। সে জেগেই বসে ছিল। বাবুকে কী তবে পাওয়া গেল না? কী উপায় হবে আমাদের? টেলিফোনেই সে প্রায় হাউ-মাউ করে কেঁদে ফ্যালে আর কি!

তখন মহিমবাবু বললেন, 'চঞ্চল, তুমি আপিসে চলে যাও। এই খবরটা আজকের মেন নিউজ হবে। পরীক্ষিৎ মজুমদারের অন্তর্ধান! উঃ, কাল সকালে কলকাতার লোক কী একটা শক পাবে!'

চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'এ বিষয়ে কোনো প্যারাগ্রাফ—'

'না—না...এখন কোনো কমেন্ট নয়! শুধু খবরটা খুব বড় করে দিয়ে দাওগে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিও মোড় থেকে।'

চঞ্চল চলে গেলে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'তাহলে পুলিশে—'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি খবর দিয়ে দিচ্ছি'—বলে তিনি নিজেই ফোন করলেন লালবাজারে।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'সাতটার সময়ে ইন্সপেক্টর যাবে তোমাদের বাড়িতে এনকোয়ারি করতে। এখন তুমি এখানেই বিশ্রাম কর। আমি ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব।'

ঘরের এক পাশে একটি পার্টিশন, তার আড়ালে একটি কৌচ, মহিমবাবু দরকার মতো সেখানে বিশ্রাম করেন। বিজয়বাবুকে সেটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু শুয়ে নাও। কিছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই আশ্বাস-বাণী শুনে বিজয়কৃষ্ণের মনটা তখনকার মতো যেন একটু হালকা হয়ে গেল। কুশানে মাথা রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন, এবং ঘুমিয়ে পড়তে এক মিনিটও দেরি হল না। নীল ঢাকনা-দেওয়া টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে মহিমবাবু কী একটা লেখার কাজ করতে লাগলেন।

ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে হঠাৎ তিনটার ঘণ্টা বাজতেই বিজয়কৃষ্ণ একবার চমকে জেগে উঠলেন। ঘুমটা তাঁর তখনও কাঁচা ছিল। আবার চোখ কচলিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, মহিমবাবু তখনও একমনে কি যেন লিখে যাচ্ছেন।

তারপরই বিজয়কৃষ্ণ আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন। তাঁর আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না!

চার

ছ'টার একটু আগে মহিমবাবু বিজয়কৃষ্ণকে ডেকে তুললেন। বিজয়বাবু চোখ মেলে খানিকক্ষণ বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—তাঁর মনে হচ্ছিল, যেন প্রতিদিনের মতো নিজের বাড়িতেই শুয়ে আছেন, এর মধ্যে এ লোকটা এল কোত্থেকে? একটু পরে তাঁর সব কথা মনে পড়ে গেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি উঠে বসলেন।

বাইরে, গাড়ির মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঞ্চা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, অনেক ডাকাডাকি করে তাকে জাগানো হল। বিজয়কৃষ্ণ করুণ স্বরে বললেন, 'আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে, মহিমবাবু।'

বাড়িতে পুলিশ আসবে, এ কথা ভাবতেই বিজয়কৃষ্ণের হাত-পা কালিয়ে আসছিল। অত্যন্ত সুখে ও অতি নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে তাঁর এই হয়েছে যে, সামান্য কোনো হাঙ্গামা হলেও তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! আর এ তো পুলিশ! মহিমবাবু সঙ্গে থাকলে তবু খানিকটা ভরসা পাওয়া যাবে।

মহিমবাবু বললেন, 'তুমি না বললেও আমি যেতুম। একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।'

কিন্তু এবারে বিজয়কৃষ্ণকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তাঁর মাথা ধরেছে, তাঁর গা বমি-বমি করছে, কিন্তু খাবার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। এক রাত্রের একটু অনিয়মেই তাঁর শরীর যেন ভেঙে আসছে! অগত্যা, মহিমবাবু একাই চা খেয়ে নিলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণকে নিয়ে।

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে 'কলকাতা হরকরা'র ফেরিওয়ালা জাঁকিয়ে চেঁচাচ্ছে—'হরকরা—হরকরা—পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধান—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধান—জয়ন্তী ভণ্ডুল!' মহিমবাবু গাড়ি থামিয়ে একখানা 'হরকরা' কিনলেন। কোলের উপর কাগজটা মেলে ধরে বললেন—'কী একটা কাণ্ডই হল!'

বিজয়কৃষ্ণ শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

কাগজে চোখ বুলোতে-বুলোতে মহিমবাবু বলে উঠলেন—'আরে আরে, আর-একটা খবর দেখেছ! কাল বিকেলের মধ্যে পরীক্ষিৎকে কেউ যদি উদ্ধার করতে পারে, তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে!'

'কে দেবে?' স্তিমিতস্বরে জিগ্যেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

'সেটাই তো আরও আশ্চর্য—দেবে লালবিহারী মালাকার। হঠাৎ তাঁর এত উৎসাহ!'

'তা, আপনার কি মনে হয় দাদাকে পাওয়া যাবে?'

'দেখা যাক, পুলিশ কী করতে পারে!'

সারা রাস্তা আর-কোনো কথা হল না।

বাড়িতে চাকররা ছাড়া কেউ নেই, বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছেন। তাঁরা গাড়ি থেকে নামতেই নিমাই ছুটে এল, সে ভেবেছিল, গাড়ি থেকে তার বাবুও বুঝি নামবেন। ছোটবাবুর চেহারা দেখেই সে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলে, তারপর ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল।

মহিমবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর, নিমাই, বোকার মতো কেঁদো না।'

বিজয়বাবু উপরে আর গেলেন না, বাইরের ঘরে বসে দু-জনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাতটার একটু পরে পুলিশ এল—ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত, সঙ্গে

দু-জন কনেস্টবল। কনেস্টবলদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে রণজিৎবাবু ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলেন। বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি, ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, ইউনিফর্ম পরা না থাকলে পুলিশ-ইন্সপেক্টর বলে মনে হয় না, বরং কবি-টবি বলেই মনে হয়! মহিমবাবু তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন রণজিৎবাবু!'

'আরে, মহিমবাবু যে!' রণজিৎবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'কেমন আছেন?'

নানা ব্যাপারে, নানারকমের কাজের উপলক্ষে মহিমবাবুর সঙ্গে বিস্তর লোকের পরিচয়। তাঁর 'চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ক' যখন ফেল পড়ে, তখন যে লোক তিন লাখ টাকা ঠকিয়ে তাঁর সর্বনাশ করে, তাকে ধরবার চেষ্টা পুলিশ কিছু কম করেনি, আজও সে লোকটার নামে ওয়ার‍্যান্ট আছে, কিন্তু আজও সে অজ্ঞাত। রণজিৎ সামন্ত সে সময়ে কেসটা নিয়ে খুব খেটেছিলেন; কিছু যে করতে পারেননি, সেটা তাঁর দোষ নয়। সে কথা রণজিৎবাবুর মনে আছে, মহিমবাবুও ভোলেননি।

মহিমবাবু বললেন, 'বিজয়ভায়া তো এর মধ্যেই একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, আমি তাই এলুম যদি কোনো কাজে লাগি!'

'বেশ করেছেন। ইনি?'

'ইনিই বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, পরীক্ষিতের ছোট ভাই।'

'ও! আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা শোনা যাক।'

বিজয়বাবু মোটামুটি সমস্ত ঘটনার একটা বিবরণ দিলেন। মহিমবাবুর উপস্থিত থাকার খুবই দরকার ছিল, কারণ, তাঁর সাহায্য ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ কোনো কথাই ভালো করে বলতে পারতেন না। তিনি আরম্ভ করেন, মহিমবাবু শেষ করেন, তিনি একটু বলতেই মহিমবাবু বিস্তারিত বর্ণনা দেন—এইভাবে সমস্ত কথা ইন্সপেক্টরের কর্ণগোচর করা হল। ইন্সপেক্টর খাতায় অনেক সব নোট নিলেন, তারপর বললেন, 'চলুন, বাড়িটা একবার দেখে আসি!'

বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো ইন্সপেক্টর চোখ বুলিয়েই সারলেন, দোতলার পরীক্ষিৎবাবুর শোবার ঘরে এসে কিছু দেরি করলেন। দক্ষিণ-পুবে খোলা মস্ত সুন্দর ঘর। খাটে নিভাঁজ বিছানা পাতা, সূক্ষ্ম নেটের মশারি ঝুলছে। কাল সন্ধের পরে নিমাই বিছানা পেতে রেখে গেছে, তারপর এ পর্যন্ত কেউ ঢোকেনি। রণজিৎবাবু বিছানা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলেন, ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার একটু ঘাঁটলেন, কোনোই হদিশ মিলল না। তারপর গেলেন পাশের ঘরে, সেটি পরীক্ষিৎবাবুর লেখাপড়ার ঘর। সাত-আট আলমারি বই, প্রকাণ্ড টেবিল, তার উপর কত কাগজপত্র, চিঠি, প্রুফ তার অন্ত নেই। রণজিৎবাবু হেসে বললেন, 'উনি মানুষটা ভারি অগোছালো তো!'

বিজয়বাবু বললেন, 'উনি ওঁর লেখার টেবিলে কাউকেই হাত দিতে দেন না—নিমাইকেও না।'

'তাঁর অনুমতি না নিয়েই আমাকে টেবিলটায় হাত দিতে হচ্ছে', বলে রণজিৎবাবু কাগজপত্রগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। 'ইস, কত কিছু একসঙ্গে ছড়ানো! দরকারের সময় ঠিক জিনিসটি খুঁজে পান কেমন করে?'

'তাই কি পান নাকি? একদিন একটা হাজার টাকার চেক বাজে কাগজ মনে করে ছিঁড়ে ফেললেন, কি কোনো লেখার পাণ্ডুলিপি ফেলে দিলেন বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। দরকারি চিঠিপত্র প্রায়ই হারিয়ে যায়, তখন যে কী মুশকিল হয়!'

'তবে সুখের কথা এই যে, আমাদের দরকারি কাগজটি আমরা ঠিক পেয়ে গেছি', বলে রণজিৎবাবু একতাড়া প্রুফের তলা থেকে একটি কাগজ টেনে বার করলেন।

বিজয়বাবু আর মহিমবাবু একসঙ্গে ব লে উঠলেন, 'কী? কী ওটা?'

রণজিৎবাবু নিঃশব্দে কাগজটা বিজয়বাবুর হাতে দিলেন। বিজয়বাবু একবার চোখ বুলিয়ে হতাশস্বরে বললেন, 'ও, এই!'

বিজয়বাবুর কাঁধের উপর দিয়ে মহিমবাবুও কাগজটা পড়ে নিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎবাবু মনোগ্রাম-করা পুরু সাদা কাগজে একখানা অসমাপ্ত চিঠি, মহিমবাবুকেই লেখা। চিঠিটা এইরকম—'প্রিয় মহিম, তোমার উৎসাহে রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু যতই ভাবছি, ততই এই জয়ন্তী ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগছে। মন কিছুতেই সায় দিতে চাচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই—অভিনন্দন মালাচন্দনের নাগালের বাইরে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে...'

এইটুকুই। কোনো তারিখ নেই; চিঠি আরম্ভ করে শেষ করেননি, ফেলে দিতেও ভুলে গেছেন!

রণজিৎবাবু জিগ্যেস করলেন, 'এ আপনার দাদার হাতের লেখা তো?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই!'

মহিমবাবু বললেন, 'কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। এরকম চিঠি আমাকে অন্তত দশখানা লিখেছে, আমার বাড়িতে আসেন তো দেখাতে পারি। জয়ন্তীতে ওর একেবারেই মত ছিল না, আমরা জোর করেই এটা করাচ্ছিলাম।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'চিঠিটা খুব হালের লেখা বলেই মনে হয়। কালকের লেখাও হতে পারে। দেখি বলে, বিজয়বাবুর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রণজিৎবাবু আলোর দিকে তুলে ধরে দেখলেন, তারপর ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখলেন।

মহিমবাবু বললেন, 'হলই-বা কালকের লেখা। তাতে কী রহস্যের কোনো সমাধান হয়?'

রণজিৎবাবু বললেন, 'তা হতে পারে বই কি! চিঠিটা যে শেষ করেননি তার মানে কী? লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে করলেন—লিখে লাভ কী, কাজেই করা যাক!'

'তার মানে আপনি বলতে চান, পরীক্ষিৎ নিজে ইচ্ছে করে পালিয়ে গেছে? অভিনন্দন মালাচন্দন এড়াবার জন্যে?'

'তা অসম্ভব কী! কাল রাত ন'টায় প্রিনসেপ ঘাট থেকে জাপানগামী একখানা জাহাজ ছেড়েছে।'

মহিমবাবু হেসে উঠলেন—'মাপ করবেন, আপনার কথা শুনে না হেসে পারলুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি পরীক্ষিতের বন্ধু, ওর স্বভাব আমি ভালোই জানি। এ রকম পাগলের মতো কোনো কাজ ও কখনোই করবে না। আর অমন অসংখ্য চিঠি ও আরম্ভ করে শেষ করে না—তাতে কী হয়েছে? এদিকে প্রিনসেপ ঘাটে গভীর রাত্রে উপেন ধরের ঘোরাঘুরি, বৃন্দাবন গুপ্তের ভিজিটিং কার্ড—এগুলোর মানে কী?'

মহিমবাবুর কথা শুনে রণজিৎবাবু একটু যেন লজ্জিত হলেন।—'আচ্ছা, এনকোয়ারি আরম্ভ করা যাক তো? দেখি, ওই কার্ডটা!'

বিজয়বাবু তাঁর পকেট থেকে কার্ডটা বার করে দিলেন। ইন্সপেক্টর সেটি নিজের পকেটে ভরে বললেন, 'চলুন, নীচে যাওয়া যাক!'

নীচে গিয়ে ইন্সপেক্টর চাকরদের সঙ্গে—বিশেষত, নিমাই আর কাঞ্চার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেন।

'আচ্ছা, বিজয়বাবু, এখন চলি। যা হয়, আপনাদের জানাব। আর হ্যাঁ—মহিমবাবু, আপনার সব-এডিটর চঞ্চল নাগের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'বেশ তো, আমার আপিসে একবার পায়ের ধুলো দেবেন! একটার সময় সে আপিসে আসে।'

'আমি একটার একটু পরেই যাব।'

'আশা করি, সুখবর নিয়েই যাবেন।'

'এক ঘণ্টার মধ্যেই যে, এ রহস্য ভেদ করে ফেলতে পারব, এমন দুশারা করিনে!'

বিজয়বাবু কাতরস্বরে বললেন, 'কালকের মধ্যে তাকে না-পাওয়া গেলে তো জয়ন্তীই ভণ্ডুল হবে। উঃ, এতদিনের এত আয়োজন—সব কি ব্যর্থ হবে?'

ইন্সপেক্টর কপাল কুঁচকে বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

রণজিৎবাবু চলে যাওয়ার পর বিজয়বাবু বললেন, 'কোনো আশাই তো দেখা যাচ্ছে না।'

মহিমবাবু বললেন, 'বলে কিনা, জাপান পালিয়েছে। ঐরকম বুদ্ধি নিয়ে ঢোকে পুলিশের কাজে? ছোঃ!'

'পুলিশই যদি কিছু না-করতে পারে, তবে আর কেউ কি পারবে!'

'তা নিয়ে এমন দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই বিজয়! তুমি স্নান করে কিছু খেয়ে-

টেয়ে নাও। ঘাবড়ে যেও না, মনে সাহস রেখ। আমি এখন চলি, কাজ আছে; আবার আসব'খন বিকেলের দিকে।'

পাঁচ

বেচারা বিজয়বাবু! সাতে নেই, পাঁচে নেই, নিতান্ত ভালোমানুষ, আজ এ কী বিপদেই তিনি পড়েছেন! বেলা ন'টা থেকে 'বাণী-বনে' লোকের পর লোক আসছে। জয়ন্তীর উদ্যোগীরা, পরীক্ষিৎবাবুর সাহিত্যিক ভক্তরা, খবরের কাগজের লোকেরা, কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা—কেউ বাদ নেই! সবাই এসে জানতে চায়, ব্যাপার কী! ব্যাপার কী, তা কি বিজয়বাবুই জানেন! ছোকরার দল আর নড়ে না, তারা প্রাণপণে চেঁচামেচি করছে, আর নিমাইকে ফরমায়েশ করে বার-বার চা খাচ্ছে। দু-একজন এমন কথাও বলছে যে, বিজয়বাবুই দাদাকে সরিয়েছেন, হয়তো আরও কিছু খারাপ কাজ করেছেন; কারণ, কে না জানে, পরীক্ষিৎ মজুমদার তাঁর উইলে এই ভাইকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন! ঘোরতর কলরব করতে করতে তারা বলছে—'শিগগির বার করে দিন ওঁকে, নয়তো আপনাকে আস্ত রাখব না!' নিজের সম্বন্ধে নানারকম বিশেষণ বিজয়বাবুর কানে পৌঁচচ্ছে, যা মোটেই সুশ্রাব্য নয়! ভদ্রলোকের অবস্থা প্রায় কাঁদো-কাঁদো। একে তো এই বিপদ, তার উপর এই অত্যাচার! তিনি বসে-বসে ভাবতে লাগলেন, দাদা অজ্ঞাতবাস করুন আর না-ই করুন, তাঁকে অবিলম্বে কোনো গোপন জায়গায় পালাতে হবে, নয়তো প্রাণেই বাঁচবেন না। এই একা বাড়িতে আজকের দিনটাও যে তিনি কাটাতে পারবেন, এমন মনে হল না!

দুপুরের দিকে নিতান্ত অবসন্ন হয়ে তিনি মহিমবাবুকেই ফোন করলেন। এ-বিপদে মহিমবাবু ছাড়া আর বন্ধু কে? মহিমবাবু বাড়িতে ছিলেন না, 'হরকরা'র আপিসে তাঁকে পাওয়া গেল।

'দাদা, প্রাণ তো বেরিয়ে গেল!'

মহিমবাবু বললেন, 'বুঝেছি। আমার আপিসেও সেই অবস্থা! লোকের পর লোক, ফোনের পর ফোন। কী আর করবে—সইতেই হবে। আমার ফটোগ্রাফারও গিয়েছিল, তোমার ছবি তুলে এনেছে।'

'ছবি! ছবি কেন?'

'তুমি কিছুই বোঝ না, বিজয়! "হরকরা"য় ছাপা হবে ছবি—বিকেলে একটা এডিশন বেরুচ্ছে। সমস্ত দেশ খবরের জন্য হাঁ করে রয়েছে, তা তো বোঝো? এখনও আছে লোক?'

'কয়েকটা ছোকরা এখনও বসে আছে! আমি আর নীচে নামছি না। এ-বাড়িতে আমার আর থাকা পোষাবে না।'

'কী যে বল! এত বড় একজন লোকের ভাই হওয়া কি সোজা কথা! তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে কত লোক আসবে—আর তুমি পালিয়ে যাবে—তা কি হয়?'

'ছোঁড়ারা বলছে কি জানেন? দাদাকে নাকি আমিই...'

'ওঃ, ও-রকম কত কথাই বেরুবে! ওতে কান দিলে কি চলে?'

'তা ওদের যে-রকম মেজাজ দেখছি, এক সময় হয়তো আমাকে মারধোরই করবে! তাহলে?'

মহিমবাবু হেসে বললেন, 'তুমি বড্ড ভীরু, বিজয়, তুমি বড্ড ভীরু!'

'ভীরু বলুন আর যাই বলুন, আমার একটুও ভালো লাগছে না আর!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, রাত্রিরে না হয় চঞ্চলকে পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ, শোন—এত লোক যে এসেছিল, তার মধ্যে উপেন ধরকে দেখেছিলে?'

'কই, না!'

'তবেই তো, দেখেছ? উপেন ধর যদি নির্দোষ হত তাহলে নিশ্চয়ই আসত।'

'তাও তো বটে!'

'উপেন ধর যে আসেনি, তাও তুমি লক্ষ করনি? নাঃ, বিজয়, তোমাকে নিয়ে মুশকিলেই পড়া গেছে...আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি। যখন যা দরকার, জানিও।'

ফোন রেখে দিয়ে মহিমবাবু কলম তুলে নিলেন। 'হরকরা'র একটা বৈকালিক এডিশন বেরোবে, তার জন্যে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছিলেন। আজ দিনটা তিনি বড় ব্যস্ত; সকাল থেকে বহু লোক এসেছে আপিসে, সকলের সঙ্গেই দেখা করেছেন, দু-চারটা করে কথাও বলতে হয়েছে। সকলের মুখেই উদ্বেগের, দুশ্চিন্তার ছায়া। মফস্বল থেকে জয়ন্তীর যে-সব ডেলিগেট এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কিছু উষ্মাও প্রকাশ করে গেছেন। রেলভাড়া খরচ করে এসেছেন, হোটেল-খরচা করে আছেন, আর এখন কিনা নাটকের নায়কই উধাও! এ কী কাণ্ড! দেশের লোক নিয়ে তামাশা করা হচ্ছে নাকি! মহিমবাবু সকলকেই যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়েছেন, পরামর্শ করে স্থির হয়েছে, কাল সকালের মধ্যে কোনো খবর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে জয়ন্তীর তারিখ অনির্দিষ্টভাবে পেছিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী!

মহিমবাবু বলে রেখেছিলেন, চঞ্চল আপিসে এলেই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটার মিনিট-পাঁচেক পরে চঞ্চল তাঁর কামরায় এসে ঢুকল। মহিমবাবু তখন প্রবন্ধ শেষ করে সেদিনকার অন্যান্য কাগজগুলোর উপর চোখ বুলোচ্ছিলেন!

'বোসো, চঞ্চল।'

উপরিওয়ালা হিসেবে মহিমবাবু সত্যি ভালো। তাঁর চাকুরেদের সকলকে বসতে বলেন, এমন কি তিনি যখন কোনো কাজে কারও টেবিলের ধারে যান, কেউ যেন উঠে না দাঁড়ায় এই হল এ আপিসের নিয়ম।

'এটা একটু পড়ে দ্যাখ তো, তাঁর সদ্যলিখিত প্রবন্ধটা এগিয়ে দিলেন চঞ্চলের দিকে।

মিনিট-দশেক পরে মুখের সামনে থেকে সেদিনের 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' নামিয়ে বললেন, 'পড়লে?'

'পড়লুম!'

'কেমন হয়েছে?'

'বেশ ভালো।'

'আমাকে খাতির করে বলছ?'

চঞ্চল লজ্জিত হয়ে বললে, 'না না, সত্যি খুব ভালো লীডর হয়েছে। আপনি তাহলে মনে করেন, বৃন্দাবন গুপ্তের দলেরই এই কাজ? এই যে লিখেছেন—"গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে বিষাক্ত-শত্রুতা, যে দুঃসহ নির্যাতন, সাহিত্য-জগতের উপদ্রবসদৃশ কতিপয় ব্যক্তির কুটিল চক্রান্তপ্রসূত যে লাঞ্ছনা পরীক্ষিৎবাবু ভোগ করিয়া আসিতেছেন, আজ বুঝি তাহারই চরম পরিণতি দেখিতে পাইলাম। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্ধান, যাহা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে মর্ম-বিদারক, তাহা যদি কাহারও মুখে পাশবিক হাস্য ফুটাইয়া থাকে, সে বা তাহারা শুধু পরীক্ষিৎবাবুরই শত্রু নয়, তাহারা সাহিত্যের শত্রু, সমাজের শত্রু, স্বদেশের শত্রু, তাহাদের পশুত্ব প্রকাশিত ও দণ্ডিত করা প্রত্যেক সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরই কর্তব্য।"

নিজের রচনার অংশ শুনে মহিমবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

চঞ্চল বললে, 'একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে না?'

'কড়া? তুমি বলছ কি চঞ্চল! এ তো কিছুই হয়নি। নেহাৎই আইন বাঁচিয়ে লিখতে হয় বলে, নয়তো দেখতে।'

'আপনার কি মনে হয়, বৃন্দাবন গুপ্ত ক্রাইম করতে পারে?'

'শুধু করতে পারে না, অনেক করেছে। তুমি সেদিনের ছেলে—তুমি আর ওর কথা কী জান!'

'তাহলে আপনি কি নিশ্চিত জানেন যে, এটা ওরই কাজ?'

'নিশ্চয় করে কি আর বলা যায়? তবে হ্যাঁ—কিছু যোগাযোগ থাকা খুবই সম্ভব।'

চঞ্চল উত্তেজিতভাবে বললে, 'তবে তো বৃন্দাবনবাবুকেই সকলের আগে অ্যারেস্ট করা দরকার।'

'তা হয়তো পুলিশ করেওছে এতক্ষণে। ব্যস্ত হোয়ো না, বসো। ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত এক্ষুনি আসবেন—তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। ততক্ষণ একটু চা খাওয়া যাক!'

মহিমবাবু প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খান, বাড়ির মতো আপিসেও তাঁর চায়ের সরঞ্জাম সর্বদাই প্রস্তুত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে মহিমবাবু বললেন, 'কাল কখন মেস-এ ফিরলে?'

'কাল আর ফিরলুম কোথায়, আজ সকালে ফিরেছি।'

মহিমবাবু একটু হেসে বললেন, 'বেশ কাজের ছেলে তুমি, চঞ্চল। জীবনে তোমার উন্নতি হবে।'

চঞ্চল লজ্জিত হয়ে চায়ের পেয়ালায় নাক ডুবিয়ে রইল।

'তা, এ ব্যাপারটার তুমি কিছু করতে পার কিনা দ্যাখ না।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'এই পরীক্ষিতের ব্যাপারটা।'

চঞ্চল অবাক হয়ে বললে, 'এর আমি কী করব?'

'আমি ভাবছিলুম কী—ব্যাপারটা পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে তো নিশ্চিত থাকা যায় না।'

'না থেকে উপায়ই বা কী?'

'হ্যাঁ, পুলিশ যা করবার তা তো করছেই। কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি, ওদের উপর আমার ঠিক ভরসা হয় না। আমরা নিজেরা কিছু চেষ্টা করলে দোষ কী? এই ধর, তুমি। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, কোনো কাজেই তুমি পেছ-পা নও। ধর, তুমি যদি এটা নিয়ে উঠে-পড়ে লাগো?'

মহিমবাবুর কথা শুনতে শুনতে চঞ্চলের মনে বিরাট একটা অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনা ফুটে উঠল। এতবড় একটা রহস্যের সমাধান তাকে দিয়ে হবে এ-কথা ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে। অসম্ভব শোনায়, কিন্তু কে জানে—হয়তো তা-ই হবে। খুব বিনীত সুরে সে বললে, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

কিন্তু মহিমবাবু এ-প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই একজন বেয়ারা ঢুকে খবর দিলে যে, লালবাজার থেকে ইন্সপেক্টর-সায়েব এসেছেন।

'তাঁকে আসতে বল।'

রণজিৎবাবু ঘরে ঢুকতেই মহিমবাবু বললেন, 'এই যে—এই আমার বিখ্যাত সব-এডিটর চঞ্চল নাগ। আর ইনি ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'এই! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি।'

'ছেলেমানুষ কিন্তু কাজের মানুষ।'

চঞ্চল মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। ইন্সপেক্টর তাকে কালকের ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, পকেট থেকে নোট বই বের করে তার উত্তরগুলো মিলিয়ে নিলেন।

'ঠিক আছে। তারপর আর কী খবর?'

'খবর তো আপনার কাছে।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আমাদের নিয়মমাফিক খোঁজ-খবর সবই নিয়েছি। পরীক্ষিৎবাবুর ড্রাইভার যা বলেছে তাতে ভুল নেই।'

'কেন, ড্রাইভারকেও আপনারা সন্দেহ করেছিলেন নাকি?'

যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণিত না হয়, সকলকেই সন্দেহ করতে হয়।'

মহিমবাবু একটু ঠাট্টার সুরেই বললেন, 'সন্দেহ যত খুশি লোককে করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজ কিছু এগিয়েছে কি?'

'সেন্ট্রাল এভিনিউর এ. বি. সি. গারাজ বলেছে, কাল রাত প্রায় সাড়ে-আটটায় পরীক্ষিৎবাবুর গাড়ির একটা টায়ার তারা বদলে দিয়েছে। ড্রাইভারের সই করা ভাউচারও দেখাল। গাড়ির ব্রেক-ডাউন হয়েছিল ইডেন গার্ডেনের সামনে, এ. এ. বি-র সাহায্য নিয়ে গাড়িটাকে এ. বি. সি. গারাজে নিয়ে যাওয়া হয়—এ. এ. বি.-র লোক যা বলল তার সঙ্গে ড্রাইভারের কথায় কোনো গরমিল নেই।'

'তাহলে কাঞ্চা সন্দেহমুক্ত হল। তারপর?'

'তারপর ঐ নিমাই—'

মহিমবাবু দু-হাত শূন্যে তুলে বললেন, 'রক্ষে করুন! নিমাইকে সন্দেহ!'

'লোকটার অত বেশি কান্নাকাটি দেখেই আমার কেমন-কেমন লাগছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধেও কোনো এভিডেন্স আছে বলে মনে হয় না।'

'বাঁচালেন, মশাই। নিমাইকে সন্দেহ করলে, আমাকেও করতে পারেন।'

এ-সব ঠাট্টা একটুও গায়ে না মেখে রণজিৎবাবু বলতে লাগলেন, 'তারপর বৃন্দাবন গুপ্তর কথা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কী করলেন?'

'তাকে অ্যারেস্ট করেছি।'

'অ্যারেস্ট করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু করে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। অমন দুর্দান্ত লেখক, কিন্তু চেহারা দেখে দয়া হয়। একে তো ভয়ানক বেঁটে, তার উপর এমন রোগা যে, লোকটা আছে কি নেই অনেক কষ্টে ঠাহর করতে হয়—'

'বলেন কী! আপনিও দেখছি সাহিত্যিক হয়ে উঠলেন।'

'সাহিত্যিকের পাল্লায় পড়ে হয়তো ও-রোগে ধরেছে। কেঁদে-কেটে অস্থির ভদ্রলোক। আমার পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন। "আমি এর কিছুই জানিনে, আমি এর কিছুই জানিনে," কেবল এ কথা বলেন আর ফোঁসফোঁস কাঁদেন।'

'ভারি মজার ব্যাপার তো!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু মজারই হয়েছিল। ভিজিটিং কার্ড মিলিয়ে দেখলুম—এটা ওঁরই কার্ড বটে, জাল নয়।'

'না, না, জাল তো নয়ই।'

'জাল যে নয়ই আমরা তা বলব না, যতক্ষণ প্রমাণ না পাই, তবে আপনার কথা আলাদা। সাহিত্য-জগতের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন আপনি।'

মহিমবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'না না, সে-রকম কিছু নয়। খবরের কাগজের লাইনে থাকলে নানা লোকের নানা বিষয়ে নানা জিনিস জেনে ফেলতেই হয়, সে-জন্য চেষ্টা করতে হয় না।'

'কার্ডের কথায় বৃন্দাবনবাবু একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। "ও নিশ্চয়ই আমার কোনো শত্রুর কাজ, আমি দশ বছরের মধ্যেও প্রিনসেপ ঘাটে যাইনি, কাল আটটার সময় আমি সিনেমায় ছিলুম—এই দেখুন টিকেটের কাউন্টার-ফয়ল।"

'তা উনি নিজে গিয়েছিলেন, তা তো কেউ বলছে না। লোক লাগিয়েছিলেন। এবং সে-লোক সম্ভবত উপেন ধর।'

'বাঃ, আপনি দেখছি সমস্ত জিনিসটাই চমৎকার ভেবে রেখেছেন।'

মহিমবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি ডিটেকটিভ নই, কমন-সেন্স থেকে বলছি। চঞ্চলকে জিগ্যেস করুন না, উপেন ধরকে ওরা দেখেছিল কিনা।'

'হ্যাঁ, সে কথা তো শুনেছি। যাই হোক, বৃন্দাবনবাবুকে তো হাজতে এনে রেখেছি। কষ্টই হচ্ছে ভদ্রলোকের জন্য।'

'আপনারা পুলিশের লোক, আপনাদের বলে দেয়া বাহুল্য যে, অনেক ডেঞ্জেরাস ক্রিমিনাল দেখতে ও-রকম হাবাগোবা গোবেচারা হয়।'

'তা ঠিক, চেহারা দেখে ক্রিমিনাল চিনতে পারলে তো আর কথাই ছিল না। তবে এভিডেন্স হিসেবে একটা ভিজিটিং কার্ড অবশ্য কিছুই নয়। যে-কোনো লোকের কার্ড খুব সহজেই যোগাড় করা যায়, তারপর জায়গা বুঝে ফেলে রাখলেই হল।'

'ঠিক ঐ তারিখে ঐ জায়গায় এত লোক থাকতে, বৃন্দাবন গুপ্তেরই কার্ড কে ওখানে ফেলে রাখতে যাবে? আর তার উদ্দেশ্যই বা কী হতে পারে?

রণজিৎবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে বইকি। সে-জন্যই তো অ্যারেস্ট করা হল। কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যে আরও এভিডেন্স যদি না পাওয়া যায় তবে বোধহয় ছেড়েই দিতে হবে।'

'চেষ্টা করলে এভিডেন্সের অভাব হবে বলে মনে হয় না।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু আসল লোকটিকে ধরা গেল না, মহিমবাবু।'

'কে সে?'

'উপেন ধর। তার হোটেলের ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখলুম, কাল থেকে সেও ফেরার। নানা জায়গায় খোঁজা হল, লোকটার পাত্তাই নেই।'

মহিমবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাহলে উপেনবাবুর উপর খুব গভীরভাবেই সন্দেহ পড়ছে। কিন্তু ও পালাবে কোথায়? ওকে পাকড়াও করতে হবে, রণজিৎবাবু।'

'অনেকগুলো চর তো লাগিয়ে দিয়েছি—আর নানা জায়গার রেলোয়ে পুলিশও খবর পেয়ে গেছে। লুকিয়ে তাকে থাকতে হবে না।'

'না না, উপেন ধরকে চাই-ই। বৃন্দাবন অতি ঘোড়েল লোক, তার কাছ থেকে কিছু বের করা শক্ত হবে, কিন্তু উপেনটা একটা ল্যাগবেগে সং। ওকে দুই ধমক দিলেই সব বেরিয়ে আসবে। আঃ, পালিয়ে গেল লোকটা!'

'উপেন ধরের খোঁজে লালবিহারী মালাকারের ওখানেও গিয়েছিলুম।'

'গিয়েছিলেন? বেশ করেছিলেন। তবে লালবিহারীবাবুর সঙ্গে উপেন ধরের কোনো যোগাযোগ এখন আর নেই। আলাদা কোম্পানি করেছে, তাই নিয়েই ঘোরাঘুরি করেছিল। তা, লালবিহারীবাবু কিছু বললেন?'

'বললেন—তিনি যে পুরস্কার ঘোষণা করছেন, তার টাকাটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, যদি তাতে কোনও কাজ হয়।'

'আহা—এ-কাজ সবাই নিজের গরজেই করবে, এর জন্য কি আর পুরস্কার ঘোষণার দরকার করে! তবে দেশে এত বড়লোক থাকতে, ওঁরই এদিকে মন গেল—লোকটি মহদাশয় বটে।'

'সুন্দর বাড়িটি লালবিহারীবাবুর। পয়সা যেমন আছে, ভোগ করতেও জানে। বাড়ির গৃহপ্রবেশের সময় আপনার কাগজে ছবি দেখেছিলুম, আজ আসল বাড়িটি দেখে চোখ ধন্য হল!'

মহিমবাবু হেসে বললেন, 'ব্যবসা ছাড়া কোনোদিকেই লালবিহারীবাবুর মন ছিল না। এখন যে সাহিত্যে-টাহিত্যে একটু-আধটু উৎসাহ হয়েছে তার কারণ আমিই। পরীক্ষিৎকে দু-একদিন নিয়েও গিয়েছি তাঁর বাড়িতে। এ সব কারণেই এ ব্যাপারে তাঁর এতখানি গরজ দেখছেন।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই দেখছি।'

ছয়

ইন্সপেক্টরবাবুর কথা চঞ্চল যতই শুনছিল ততই হতাশ হচ্ছিল। এর বেশি কি সামন্ত সায়েবের কিছুই বলবার নেই? এ যে নেহাৎ ধরা-বাঁধা মামুলি কথাবার্তা, এর মধ্যে সেই চমক কোথায়, গল্পের ডিটেকটিভদের কার্যকলাপে পদে পদেই যা পাওয়া যায়? সে লক্ষ করল যে, মহিমবাবু যা যা বলেছেন তারই উপর নির্ভর করে ইন্সপেক্টরবাবু কাজ করে যাচ্ছেন, এর বাইরে কিছুই বোধহয় তিনি ভাবতে পারেননি। মনে হয়, মহিমবাবুর পরামর্শ নিতেই যেন এসেছেন, মহিমবাবুর মুখের দিকে কেমন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন, ছাত্রের মতো তাঁর কথা শোনেন।

এ থেকে চঞ্চলের মনে দুটো ধারণা হল। প্রথমত, অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন মহিমবাবু সম্বন্ধে তার মন গর্বে ভরে উঠল; দ্বিতীয়, পুলিশকে ডিঙিয়ে, সমস্ত দেশের লোককে অবাক করে দিয়ে এ রহস্যের সমাধান হয়তো সে-ই করতে পারবে, এমন একটা অসম্ভব দুরাশা প্রবল হয়ে উঠল তার মনে। কী করে কী করবে কিছুই জানে না, শুধু একটা অস্পষ্ট উদ্যমের প্রেরণায় ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনার সময় আর নষ্ট করব না—এখন উঠি।'

মহিমবাবু অমায়িকভাবে বললেন, 'বসুন আর দুটো মিনিট।'

'আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত—আজ আবার বিকেলে আপনার কাগজ বেরোবে।'

'ব্যস্ত আমি সব সময়েই, কিন্তু আপনি তো আজ আমার চেয়েও ব্যস্ত। এত বড় একটা কেস হাতে!'

'চট করে কিছু হবে বলে মনে হয় না—আমার তাড়া নেই!' রণজিৎবাবুর হাতের কাছে সেদিনের "দোর্দণ্ডপ্রতাপ" পড়ে ছিল; সেখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'কী লিখেছে আজকের "দোর্দণ্ডপ্রতাপ"?'

'দ্যাখেননি?'

'না। সকাল থেকে তো ঘুরছিই।'

'দেখুন দেখুন, ভারি মজার। তৃতীয় পৃষ্ঠার পঞ্চম কলম দেখুন।'

'ওঃ আপনার দেখছি মুখস্থ', বলে রণজিৎবাবু নির্দেশমতো পাতা ওল্টালেন।

'যার যা কাজ। তাছাড়া আমার স্মরণশক্তি একটু ভালোই।'

'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের তীব্র সমালোচনা করে লিখেছে যে, পরীক্ষিৎবাবুর মতো শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে এই হৈ-চৈ করতে গিয়েই কাণ্ডটা হল।

তিনি নিশ্চয়ই এটা এড়াবার জন্যেই গৃহত্যাগী হয়েছেন, হয়তো সন্নেসি হয়েছেন, হয়তো বিদেশে পালিয়েছেন। "আমরা যে প্রথম হইতেই এই অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলাম তাহার যৌক্তিকতা কি এখন প্রমাণ হইল না?" শেষে লিখেছে যে, এই জয়ন্তী অবিলম্বে বাতিল করে দেওয়া হোক, পরীক্ষিৎ-ভক্তরা ঘোষণা করুক যে, এ রকম অনুষ্ঠানের কল্পনা তারা আর কখনো মনে স্থান দেবে না, তাহলে মজুমদারমশাই নিজে থেকেই হয়তো ফিরে আসবেন, পুলিশের সাহায্য কি পুরস্কার-ঘোষণা কিছুই দরকার হবে না।

রণজিৎবাবু পড়ে বললেন, 'হুঁ।'

'কেমন বুঝলেন?'

'প্যারাগ্রাফটা বোধহয় আমাদের বৃন্দাবনবাবুর লেখা? বেচারা! এখন হাজতে বসে হাত কামড়াচ্ছে। বড় কষ্ট হচ্ছে ভদ্রলোকের জন্যে, ওঁকে ছেড়েই দিতে হবে।'

মহিমবাবু বললেন, 'আপনার মতো দয়াশীল লোক পুলিশের মধ্যে খুবই কম, এ কথা বলতেই হয়। আচ্ছা প্যারাগ্রাফটা পড়ে আপনার কী মনে হল।'

'লেখাটা বড়ই মোটা রকমের। যেন ওঁরাই পরীক্ষিৎবাবুকে সরিয়েছেন, জয়ন্তী বন্ধ করে দিলেই বার করে দেবেন, এ রকম একটা ভাব আছে বটে!'

'আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আপনার মতো সতর্ক অফিসার না হলে হয়তো শুধু বৃন্দাবনকে নয়, "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র স্বত্বাধিকারীকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলত। ভারি-কাঁচা হয়েছে লেখাটা।'

"তা, আমাদের সতর্কতা মানেই চারিদিকে চোখ-কান খোলা রাখা। আপনাকে তো বলেছি—সকলকেই আমরা সন্দেহ করি, যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণিত না হয়।'

'শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরীক্ষিতের কিছুদিন আগে একটা মামলাও হয়ে যায় তা তো জানেন?'

'শশাঙ্কবাবু কে?'

'শশাঙ্ক বক্সি—"দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র প্রোপ্রাইটর।'

'কি নিয়ে মামলা?'

'ওর একটা গ্রন্থাবলী ওরা পাব্লিশ করেছিল, রয়্যালটি ঠিক মতো দিচ্ছিল না। হাইকোর্টে পরীক্ষিতের জিৎ হয়।'

'এখন ওঁর পাব্লিশর কে বলতে পারেন?'

'নব-সাহিত্য-ভবন নামে একটা নতুন ফার্ম। যদ্দুর জানি, ওর নতুন বই, নতুন এডিশন আর গ্রন্থাবলী ইত্যাদি বই এখন থেকে নব-সাহিত্যই বার করবে। কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে।'

'ফার্মটা কার?'

'একটা লিমিটেড কোম্পানি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জয়রাম শীল।'

'কী নাম বললেন?'

'জয়রাম শীল।'

'তাহলে "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র গাত্রদাহ হবার নানারকম কারণই আছে দেখছি।'

'তা আছে! অবশ্য প্রমাণ না পেলে বলা শক্ত, কিন্তু আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে যে, এ রহস্যের চাবি—মানিকতলা অঞ্চলেই আছে।' (মানিকতলায় "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র আপিস।)

'সেই তো আমাদের মুশকিল মহিমবাবু, প্রমাণ না পেলে কিছুই করবার উপায় নেই। আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে এগোতে হয়।'

'আপনারা তো আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন, এদিকে নানারকম আজগুবি গুজবে শহরে তো কান পাতা যায় না। এ পর্যন্ত কটা থিওরি হয়েছে, জানেন?'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আমি যদ্দূর জানি, সাতটার বেশি নয়। যথা ঃ এক নম্বর—শান্তিপ্রিয় পরীক্ষিৎবাবু জয়ন্তীর ভয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন—'

মহিমবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'এ থিওরি তো আপনার মগজেই প্রথম গজায়। জাপানি-জাহাজের কথা মনে আছে?'

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে রণজিৎবাবু বললেন, 'দুই নম্বর—পরীক্ষিৎবাবুর হঠাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে; তিনি যে কে, সে কথাটাই মনে করতে পারছেন না, হয়তো এতক্ষণে খিদিরপুর ডকে কি ঝরিয়ার কয়লা-খনিতে কুলিগিরিতে ভর্তি হয়েছেন!'

'বাঃ, চমৎকার থিওরি তো! তারপর?'

'তিন নম্বর—তিনি পাগল হয়ে গেছেন!'

'তা তো বুঝলাম—কিন্তু কোথায় গেছেন সেটাই তো প্রশ্ন।'

'চার নম্বর—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কিংবা তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

'একেবরে গুম খুন! মৃতদেহ-সুদ্ধু হাওয়া হয়ে গেল!'

'পাঁচ নম্বর—টাকা আদায় করবার ফিকিরে গুন্ডার দল তাঁকে সরিয়েছে। ছয় নম্বর—তাঁর সাহিত্যিক-শত্রুরাই এটা ঘটিয়েছে, জয়ন্তী-কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করবার জন্য।'

'এই শেষেরটাই সম্ভব বলে আমার মনে হয়!'

'এটা তো বলতে গেলে, আপনারই থিওরি। এ পর্যন্ত সন্দেহের জোরটাও এদিকেই পড়েছে। যাই হোক, আরও একটা আছে, সেটা আপনি শুনেছেন কিনা জানি না। সাত নম্বর—এটা বিজয়কৃষ্ণবাবুরই কারসাজি, কারণ দাদার অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি-টম্পত্তি সব তাঁরই।'

কথাটা শুনে মহিমবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।—'এরকম একটা থিওরি হয়েছে নাকি? তালে আট নম্বর থিওরিটা আমি বলছি শুনুন, পরীক্ষিৎবাবুকে—মহিম চাটুয্যেই সরিয়েছে!'

রণজিৎবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'হাসির কথা নয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অল্পদিন আগেই পরীক্ষিৎবাবু উইল করেছেন, তাতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাইকেই করে গেছেন। মানুষের কখন কী মনে হয় তা তো বলা যায় না।'

মহিমবাবু একটা বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এল। তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'টাইপ।' তারপর রণজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি সত্যি সত্যি মনে হয় যে বিজয়—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে পারল না। গুড়ুম করে একটা শব্দ হল, বারুদের গন্ধে ঘর গেল ভরে, আর মহিমবাবুর কামরার কাঠের পার্টিশনের একটা অংশ হঠাৎ চুরমার হয়ে ভেঙে গেল।

সমস্ত আপিসে হুলস্থূল, ছুটে এল বেয়ারা দারোয়ান কেরানি যে যেখানে ছিল; রণজিৎবাবু রাস্তায় দুজন কনেস্টবল দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলেন, তারাও এল। কিন্তু মহিমবাবুর হল কী! তাঁর জন্যে অবশ্য বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, চঞ্চল তাঁকে টেনে বার করলে টেবিলের তলা থেকে। কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ে তিনি শুধু বললেন, 'উঃ!'

সাত

রণজিৎবাবু বললেন, 'খুব বেঁচে গিয়েছেন, চঞ্চলবাবু। আর একটু হলেই আপনার মাথার খুলিটা গিয়েছিল!'

চঞ্চল বললে, 'মাথাটা যে আস্ত আছে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।' হাসবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু বুকের ভেতর তার ধড়াস-ধড়াস করছে, মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

মহিমবাবু অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, 'একটু জল।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'বরং এক পেয়ালা চা খান, মহিমবাবু, সুস্থ বোধ করবেন।'

দু-তিন ঢোঁক জল খেয়ে মহিমবাবু বললেন, 'উঃ, কী ভয়ানক! কী ভয়ানক! আপনাকে সুদ্ধু ফেলতে চায়! মস্ত একটা ক্রিমিনাল গ্যাঙ পিছনে লেগেছে, কী উপায় হবে, রণজিৎবাবু?'

মহিমবাবু চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

রণজিৎবাবু একটু হেসে বললেন, 'আপনার টেবিলের তলায় ঢোকাটা কিন্তু ভারি চমৎকার হয়েছিল! আচ্ছা, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি ব্যাপারটার একটু তদন্ত করে আসি।'

ইন্সপেক্টরের মুখে এ রকম হালকা কথা শুনে চঞ্চলের শরীরটা যেন জ্বলে গেল। সে না বলে পারলে না, 'একটু আগে, আপনার মুখের চেহারাও ঠিক বীরের মতো দেখা যাচ্ছিল না, ইন্সপেক্টরবাবু?'

রণজিৎবাবু নির্লজ্জের মতো বললেন, 'ওরে বাবা, বন্দুকের গুলির সামনে বীরত্ব! চাচা, আপন বাঁচা।'

এ কথা বলেই তিনি কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন, চঞ্চল অত্যন্ত বিরক্ত মনে গুম হয়ে বসে রইল। মহিমবাবুও চোখ বুজে চুপ।

দিন-দুপুরে কলেজ স্কোয়ারের উপরে এমন একটা কাণ্ড—রাস্তায় প্রকাণ্ড ভিড় জমে গেছে, তাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, তেতলার ঘরে বসেও। মহিমবাবু যেখানে বসেন তার ঠিক পিছনেই একটা মস্ত খোলা জানলা, জানলার উল্টোদিকে আর একটা তেতলা বাড়ি, মাঝখানে সরু গলি। সেই উল্টোদিকের বাড়ির একটা জানলা আর এ জানলা একেবারে মুখোমুখি। সে বাড়ি থেকেই কেউ যে এ কাণ্ড করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

গুলির আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে রণজিৎবাবুর কনেস্টবলরা একটা কাজ করেছিল—প্রাণপণে তাদের হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের রাস্তা থেকে পুলিশ এসেছিল ছুটে, এখন 'হরকরা' আপিসের সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য। পিছনের গলিটিও পুলিশে ভর্তি, দেখতে দেখতে সার্জেন্ট এল চার-পাঁচজন, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে দু-জন দারোগা এল, কিন্তু গুলি যে ছুঁড়ল তার একেবারেই কোনো পাত্তা মিলল না।

প্রায় আধঘণ্টা পর রণজিৎবাবু ফিরে এলেন। মহিমবাবুর টেবিলের উপর বন্দুকের গুলিটি রেখে বললেন, 'এটি পাওয়া গেছে আপনার টাইপিস্টের টেবিলের তলায়। এ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না!'

চঞ্চল বেশ একটু ঝাঁঝাল সুরেই বললে, 'সে রকম আশাও আমরা করিনি।'

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'উল্টোদিকের বাড়িটা দু-মাস ধরে খালি পড়ে আছে। সদর দরজা তালা বন্ধ।'

'তাতে তো ডাকাতের আরও সুবিধে।'

'আমরা তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম, কোনো হদিশ মিলল

না। এই জানলার মুখোমুখি ঘরটার দরজা অবশ্য খোলা ছিল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, গলির দিকের জানলাটা ছিল বন্ধ।'

'তা পালাবার আগে জানলা বন্ধ করতে কতক্ষণ!'

'জানলার কাচে কি দেয়ালে কোথাও আঙুলের ছাপ নেই, ঘরে অনেকদিনের ধুলো জমে আছে, পায়ের কোনো ছাপ নেই।'

'ইন্সপেক্টরবাবু, যারা এত পারে তারা পায়ের আঙুলের ছাপ লুকোতেও জানে।'

'তাও বটে, তাও বটে', বলে রণজিৎবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, "আচ্ছা চঞ্চলবাবু, আপনার মনে আছে, আমরা যখন এখানে বসে ছিলাম, ওই জানলাটা খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?'

চঞ্চল একটু ভেবে বললে, 'কী যেন, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

মহিমবাবু বললেন, 'বন্ধ থাকলেই বা কী! একটুখানি ঘুলঘুলি ফাঁক করে নিয়েও রিভলভার ছোঁড়া যায়।'

রণজিৎবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'সে কথা ঠিক। তারপর একতলায় দোতলায় আপনার প্রেস ও আপিসও খোঁজা হল—যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে—'

মহিমবাবু একটু হেসে বললেন, 'তার চাইতে সটান আমার কাছে এসে ধরা দিতেও তো পারত।'

'পালাবার পথ না পেলে, ধরা তো দিতই। পালাল কেমন করে তাই ভাবছি।'

চঞ্চল বললে, 'আপনার পদ্ধতিতে ভাবাটা বড্ড বেশি হচ্ছে, কাজ সে তুলনায় কম।'

'তাই তো, ভারি জব্দ হয়ে গেলাম লোকটার কাছে। দিনে-দুপুরে এতগুলো পুলিশের নাকের তলা দিয়ে বেমালুম সরে পড়ল! আশ্চর্য!'

চঞ্চল বললে, 'এটা বোঝা যাচ্ছে যে, পরীক্ষিৎবাবুকে যারা সরিয়েছে, মহিমবাবুর উপরেও তাদের রাগ কম নয়।'

মহিমবাবু ফ্যাকাশে একটু হেসে বললেন, 'হবেই বা না কেন! এ ব্যাপারটা নিয়ে "হরকরা" যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে, তেমন তো আর কেউ লাগেনি। পাব্লিক ওপিনিয়ন ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলে ব্যাপারটার একটা হদিশ হবেই।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি একটু সাবধানেই থাকবেন, মহিমবাবু। লোক ওরা সুবিধের নয়।'

'আমার আর সাবধান আর অসাবধান! কাজ করে যাব—তারপরে যা হবার হবে।....দেখুন, আমার মনে হয় ঐ উপেন ধর লোকটাকে ধরতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'চেষ্টা তো করছি, কিন্তু...'

রণজিৎবাবুর কথা শেষ হল না; উসকোখুসকো চুল, চোখ ঘোলাটে বিজয়বাবু ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকলেন। একখানা খামে-ভরা চিঠি মহিমবাবুর সামনে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

মহিমবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী, বিজয়? কী খবর?'

'খবর...এই চিঠি। এই যে, রণজিৎবাবুও আছেন দেখছি। ভালোই হল।'

বিজয়বাবুর মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে, চোখে পড়েছে কালি, মুখে পান নেই, তাঁর এমন রুক্ষ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি কেউ কখনও দ্যাখেনি।

মহিমবাবু বললেন, 'একটা ডাব আনিয়ে দিই, বিজয়? না একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক? বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'না—না আমার কিচ্ছু লাগবে না। চিঠিটা দেখুন।'

খামটা খোলাই ছিল, মহিমবাবু ভিতর থেকে চিঠিটা বের করলেন। খুলে চোখের সামনে ধরেই বলে উঠলেন, 'এ কী! এ যে দেখছি পরীক্ষিতের—'

সত্যিই তাই, পরীক্ষিৎবাবু লিখছেন ঃ

'বিজয়,

আমি এখন বন্দী। আছি ডায়মন্ডহার্বরে, নদীর ধারে একটি বাংলোয়। বাড়িটা যেমন মস্ত, তেমনি পুরোনো। এর বেশি লিখতে পারব না। মহিমকে খবর দিও।

তোমার দাদা

চিঠিটা হাতে হাতে অনেকবার ঘোরাঘুরি করল। পুরোনো ময়লা দুমড়োনো এক টুকরো কাগজে পেনসিলের অস্পষ্ট লেখা। এরকমই আর একটা কাগজ জোড়া লাগিয়ে কোনোরকমে খাম তৈরি হয়েছে। বেয়ারিং চিঠি। ডাকঘরের ছাপ, ডায়মন্ডহার্বরের বটে।

কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বললে না। তারপর মহিমবাবু বললেন, 'চিঠিটা যে জাল নয়, তার কী প্রমাণ?'

'হাতের লেখা দাদারই বটে', বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

'মনে তো হচ্ছে তা-ই, তবে...'

বিজয়বাবু অধীরভাবে বললেন, 'তবে আবার কী? কত কষ্টে একটু কাগজ-পেনসিল জোগাড় করে দাদা লিখেছেন। হাতের লেখা একটু আঁকাবাঁকা তো হবেই। মহিমবাবু, ইন্সপেক্টরবাবু, আপনারা....আপনারা দাদাকে উদ্ধার করুন,' বলতে বলতে বিজয়বাবুর গলা প্রায় ধরে এল।

'আহা, বিজয়, ও-রকম কর না, একটু শান্ত হও।'

চিঠিটা রণজিৎবাবুর হাতে ধরা ছিল, তিনি সেটা পকেটে ভরে বললেন, 'আচ্ছা, আমি এখন উঠি।'

বিজয়বাবু কাতরস্বরে বললেন, 'তাহলে...'

'আপনি ভাববেন না, যা ব্যবস্থা করবার সবই করা হবে।'

'এক্ষুনি বাড়িটাকে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করিয়ে ফেলুন। কে জানে, দেরি হলে ওরা যদি আবার সরিয়ে ফ্যালে।'

'হ্যাঁ, সেইরকমই কিছু একটা করতে হবে।...মহিমবাবু, আজ মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাবেন না?'

মহিমবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি যাচ্ছেন নাকি?'

'ভাবছি তো ধন্য মোহনবাগান! এত হেরে এত নাম জগতের আর কোনো টিম করেছে বলতে পারেন?'

চঞ্চল বলে উঠল, 'আপনি দেখছি খেলা নিয়ে মেতে উঠলেন। এদিকে পরীক্ষিৎবাবু—'

'আর কয়েক ঘণ্টা সমুদ্রের হাওয়া খেলে পরীক্ষিৎবাবুর ক্ষতি হবে না। ব্যাপারটা তো বলতে গেলে চুকেই গেছে। আজ কালীঘাটের সঙ্গে খেলা। মোহনবাগান ক' গোলে হারবে, তাই ভাবছি।'

চঞ্চল আরও তীব্রস্বরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মহিমবাবু তার আগেই বললেন, 'চঞ্চল, তুমি নীচের ঘরে গিয়ে বিকেলের এডিশনে এই চিঠিটার খবর দিয়ে এস। ডবল কলম নিউজ। চিঠিটার নকল আমি তক্ষুনি রেখেছিলাম—এই নাও। আর এই গুলি-ছোঁড়ার ব্যাপারটাও দিতে হবে। শুনেছ তো, বিজয়, এদিককার কাণ্ড?'

'আপনার আপিসে ঢোকবার আগেই শুনেছি। আমাকে আর কিছু বলবেন না, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। উঃ!' বিজয়বাবু টেবিলের উপর দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

চঞ্চল তার টেবিলে গিয়ে লিখতে বসল, রণজিৎবাবু বিদায় নিলেন। বিজয়বাবু মাথা তুলে বললেন, 'ঐ ইন্সপেক্টরকে দিয়ে কোনো কাজ হবে বলে তো মনে হয় না। তিনি চললেন ফুটবল খেলা দেখতে!'

মহিমবাবু বিজয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুমি ভেব না, বিজয়, এ ব্যাপারটার কূল-কিনারা না করে আমি ছাড়ছিনে। আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে। তুমি বসবে?'

বিজয়কৃষ্ণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে বললেন, 'আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

'বাড়িতে ভালো না-লাগলে বরং আমার সঙ্গেই চল।'

'তাই চলুন।'

আট

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহিমবাবু আপিসে ফিরে এলেন, বিজয়বাবুকে অনেকটা শান্ত করে রেখে এলেন তাঁর বাড়িতেই। নিজের বাড়ির বিরাট বোবা শূন্যতা থেকে পালাতে পেরে বিজয়বাবু যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

আপিসে এসেই মহিমবাবু ডেকে পাঠালেন চঞ্চলকে।

'নিউজ লিখে দিয়েছ?'

'দিয়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাগজ বেরিয়ে যাবে। হকাররা এখন থেকেই আসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। খুব ডিমান্ড হয়েছে।'

'হ্যাঁ, শহরের সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে তো। শোনো চঞ্চল, তোমাকে এখন ডায়মন্ডহার্বরে পাঠাতে চাই।'

চঞ্চল চুপ করে রইল।

'পারবে তো?'

'পারব না কেন?'

'ভয় পাবে না?'

চঞ্চল দৃঢ়স্বরে বলল, 'না। কী করতে হবে বলুন।'

'এক্ষুনি চলে যাও শেয়ালদা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ডায়মন্ডহার্বর। বাড়িটা খুঁজে বের করতে আশা করি তোমার কষ্ট হবে না। যতক্ষণ দিনের আলো থাকবে, কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করবে—নজর রাখবে কে ঢুকছে আর কে বেরুচ্ছে। সন্ধের পরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তোমার আসল কাজ শুরু। কৃষ্ণপক্ষের রাত আছে, সুবিধেই হবে।'

'সুবিধে পেলে, বাড়িটার ভিতরেই যাব।'

'তা যদি যেতে পার তবে তো ভালোই। কিন্তু খুব সাবধান। ওরা লোক ভালো নয়, রিভলভার-টিভলভারও আছে। যদি শুধু এইটেই জেনে আসতে পার যে, পরীক্ষিৎ সত্যি ওখানে আছে, তাহলেই অনেকখানি হল। দুঃসাহস করো না, বুঝে-সুঝে চল। যদি জানতে পাও যে, পরীক্ষিৎ ওখানে আছে, তাহলেই তোমার কাজ শেষ হল। আর কিছু করবার চেষ্টা কোরো না। তারপর ডাক-বাংলোয় গিয়ে ঘুমিয়ে কি কলকাতায় ফিরে এস, যদি ট্রেন পাও। আর একটা ফোন কোরো আমার বাড়ির নম্বরে। আমাকে না পেলেও বিজয়কে পাবে।'

'আপনি কি আজ রাত্রে বাড়ি থাকবেন না?'

'আমার আজ রাত্রে অনেক কাজ, চঞ্চল, কখন কোথায় থাকি, ঠিক নেই। এ হাঙ্গামা চুকে গেলে যা একচোট ঘুমিয়ে নেব!'

'রাত্তিরে এত কম ঘুমিয়ে আপনি কী করে পারেন! আশ্চর্য!'

'সবই অভ্যেস! তাহলে আর দেরি কোরো না। এই নাও' বলে মহিমবাবু পকেট থেকে ব্যাগ বের করে দুটো দশটাকার নোট চঞ্চলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'এত টাকা দিয়ে কী হবে?'

'রাখ সঙ্গে, যদি লাগে। আমার মনে হয়, পুলিশের লোকও আজ রাত্রেই যাবে ওখানে। দেখ, তারা যেন আবার তোমাকে শত্রুপক্ষের বলে সন্দেহ না করে! যতটা পার তাদের সাহায্য কোরো।'

'আপনার কি মনে হয়...'

'এখন আর মনে হওয়া না হওয়ার সময় নেই! পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি আছে। তুমি বেরিয়ে পড়।'

শেয়ালদা সাউথ স্টেশনে টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে চঞ্চল দেখল, গাড়ি ছাড়তে তখনও মিনিটপাঁচেক বাকি! ভিড় কম এমন একটা গাড়ি খুঁজে বের করে সে উঠে বসল। কী এক অদ্ভুত উদ্দেশ্য নিয়ে সে চলেছে। কে জানে হয়তো কোনো বিপদেই পড়বে, কে জানে হয়তো, চিঠিটাই জাল, একদম ঠকে ফিরে আসবে। তার বুকের ভিতরটা ঈষৎ দুর্-দুর্ করতে লাগল—না জানি কী হয়!

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রায় প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে এসেছে, পাশের কামরা থেকে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠল। চঞ্চল মুখ বাড়িয়ে দেখল, একটা লোক চলতি ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। এখনও লম্বা দুটো ঠ্যাং বাইরে ঝুলে আছে, কিন্তু একটু পরেই ভিতরের লোকেরা তাকে টেনে তুলল, গাড়ি ছুটল বেগে। চঞ্চল লোকটার মুখ দেখতে পেল না, দেখতে পেলে খুশি হত। কেমন একটা সন্দেহ তার মনে খচ্ খচ্ করতে লাগল, লোকটা তারই পিছু নেয়নি তো? প্রত্যেক স্টেশনে সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, পাশের কামরা থেকে কে কে নামল। কখনও মনে হয়, সে-লোকটা নেমে গেল, কখনও মনে হয়, উল্টোটা। কখনও আবার মনে হয়, বাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করছে, ও-সব কিছুই নয়। এই রকম মনের অবস্থায় সন্ধের একটু আগে সে ডায়মন্ডহার্বর এসে পৌঁছল। গাড়ি স্টেশনে আসতেই সে লাফ দিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে, পাশের কামরা থেকে বিশেষ-কেউ নামে কি না সেটা লক্ষ করে দেখবে এইরকম তার মতলব। কিন্তু মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম ভিড়ে ভরে উঠল, তার ভিতরে কাউকে আলাদা করে লক্ষ করা সম্ভব হল না।

ডায়মন্ডহার্বরে সে আগেও এসেছে, পথঘাট মোটামুটি জানে। স্টেশনে এক পেয়ালা

চা খেয়ে নিল, তারপর বেরিয়ে এসে নদীর দিকের রাস্তা ধরল। একটু হাঁটে আর এদিক-ওদিক তাকায়—কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা। ছোটো মফস্বল শহরের রাস্তায় বেশি লোক নেই, এর মধ্যে কেউ যে লুকিয়ে কারও পিছু নেবে সেটা সম্ভব নয়। চঞ্চলের সন্দেহ রইল না যে, এটা তার ভুল মাত্র।

নদীর ধার ধরে ঘোরাঘুরি করতে-করতে শহরের খানিকটা বাইরে মস্ত পুরোনো একটা বাড়ির কাছে সে এসে দাঁড়াল। দেখে সন্দেহ রইল না যে, এই সেই বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ি, কম্পাউন্ডে অনেক বড়-বড় গাছ ছায়া রচনা করেছে, দোতলার সব জানলা বন্ধ, একতলাটা রাস্তা থেকে ভালো করে দেখা যায় না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না এখানে কোনো মানুষ আছে বা কোনোকালে থেকেছে। হয়তো কোম্পানির আমলে কোনো শৌখিন সাহেব নদীর ধারে বাড়িটি করেছিল, এখন কালের কবলে পড়ে এই দশা হয়েছে।

চঞ্চল বাড়িটির চারদিক ঘুরে একবার দেখল, তারপর নদীর ধারে ঘাসের উপর বসে ভাবতে লাগল, এখন কী করা।

জায়গাটি এমনিতেই নির্জন, তার উপর সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গেই দূর থেকে শেয়াল ডেকে উঠল, নদীর জলের ছলছল শব্দ যেন বেড়ে উঠল, হাওয়া হু-হু করে ফিরতে লাগল। দেখতে দেখতে আকাশ ভরে তারা ফুটল আর কালো অন্ধকারে জোনাকি উঠল জ্বলে।

তখন চঞ্চল আস্তে আস্তে উঠে বাড়িটার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ফটক হাঁ করে খুলে আছে, ঢুকতে বাধা নেই। চঞ্চল ঢুকল, ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়াল। মনে হল বাড়িটার ভিতর থেকে মানুষের গলার চাপা আওয়াজ যেন আসছে। কোথায় কোন ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠেই যেন নিভে গেল! না কি এসব তার মনের ভুল? চোখের ভুল? না, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। চঞ্চলের গলা যেন বুজে আসতে চাইল, কিন্তু জোর করে সমস্ত ভয়ের ভাব মন থেকে তাড়িয়ে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল, উঠল এসে একতলার বারান্দায়।

এখন কোনদিকে যাবে?

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। চঞ্চলের পকেটে ছোটো একটা টর্চ আছে বটে, কিন্তু সেটা তার জ্বালতে সাহস হল না। সবচেয়ে ভালো হবে তার পক্ষে কোনোখানে লুকিয়ে থাকা। নিজে গোপন থেকে এখানকার সব ব্যাপার দেখে নেবার চেষ্টাই তাকে করতে হবে। বেশি ভাববার সময় নেই, হাতের কাছে একটা দরজা ছিল খোলা, ধাঁ করে ঢুকে পড়ল। বহুদিনের পুরনো অব্যবহৃত ঘরে একটা ভ্যাপসা গন্ধে তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখে যখন অন্ধকার সয়ে গেল, দেখতে পেল, কয়েকটা

ভাঙা চেয়ার-টেয়ারও আছে ঘরে। পা টিপে-টিপে গিয়ে বসল তারই একটায়, চেয়ারটা ক্যাঁ-কোঁ করে উঠল। মাথার উপর দিয়ে চামচিকে গেল উড়ে, মেঝেয় আরশোলা-ইঁদুরের দুদ্দাড় ছুটোছুটি। তারই মধ্যে বসে চঞ্চল অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় আর কাটে না। বাড়িটার নানা অংশ থেকে নানারকম শব্দ আসতে লাগল, তবে হয়তো সে-সব এমনি-এমনিই হচ্ছে। পুরোনো পোড়ো বাড়িতে কত রকম শব্দ হয় তার কি অন্ত আছে! কিন্তু মানুষ যে এখানে আছে, সে-সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই গেল না। পরীক্ষিৎবাবু কোন ঘরে? সে উঠবে নাকি? দেখবে নাকি সমস্ত বাড়ি খুঁজে? মহিমবাবুর উপদেশ মনে পড়ল—দুঃসাহস কোরো না। এদিকে রণজিৎবাবুই-বা কী করছেন? তিনি তাঁর দলবল নিয়ে তো এখন চলে এলেই পারেন। না কি তিনি আসবেনই না?

নয়

কতক্ষণ এ ভাবে কাটল কে জানে, হঠাৎ চঞ্চল লক্ষ করল, বারান্দায় অন্ধকারে একটা মূর্তি ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; লম্বা একটা ছায়া যেন স্তব্ধ হয়ে তাকেই লক্ষ করছে। মুহূর্তের জন্য চঞ্চলের গা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, কিন্তু এখন ভয় পেলে চলবে না, এখনই মাথা ঠান্ডা রাখবার সময়। চঞ্চল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ছায়ামূর্তি তবু সরল না, নড়ল না। চঞ্চল একটু একটু করে এগোতে লাগল, তারপর যেই দরজার কাছে এসেছে, মূর্তিটা এক লাফে নামল বারান্দা থেকে মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলও দৌড় দিল, পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালাতেই যা দেখল, মনে মনে তা দেখতেই হয়তো আশা করেছিল, তবু সত্যি সত্যি যখন তাই দেখল তার সমস্ত শরীরে যেন চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

সেই অন্ধকারে টর্চের আলো বিঁধল কাকে? ফুটে উঠল উপেন ধরের দীর্ঘ মূর্তি, তার মুখে হিংস্র কুটিল হাসি।

অবাক হবার সময় চঞ্চল বেশি পেল না, এক লাফে সেও নামল মাটিতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার উপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি নামল, টর্চ খসে পড়ে গেল মাটিতে, ভোঁ করে উঠল মাথা। সেটা হয়তো সামলে উঠতে পারত, কিন্তু তার পরেই পরপর কয়েকটা বজ্রমুষ্টির আঘাত তাকে যেন একেবারে গুঁড়ো করে দিল। শেষটায় বুকের উপর এমন এক কিল খেল যে, দম বন্ধ হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উপেন ধর দিল দৌড়।

পালাচ্ছে, লোকটা পালাচ্ছে। হাঁটুর উপর বুক চেপে চঞ্চল মিনিটখানেক বসে রইল, কিন্তু তক্ষুনি আবার টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল। উঃ, লোকটা জোয়ান বটে! জু-জুৎসুর প্যাঁচ চঞ্চলের জানা ছিল, গায়ে জোরও তার মন্দ নেই, কিন্তু কিছু করতে পারলে না, শুধু পড়ে পড়ে মার খেল। কিন্তু পালাতে সে দেবে না ওকে, কিছুতেই না। কষ্টে নিঃশ্বাস পড়ছিল, তবু দৌড় দিলে উপেন ধর যেদিকে গেছে সেটা আন্দাজ করে। ঐ রাস্তায় একটা মোটর দাঁড়িয়ে না? উপেন ধর লাফিয়ে উঠল গাড়িতে, এঞ্জিন গাঁ-গাঁ করে উঠল। চঞ্চল ছুটল প্রাণপণে, গাড়ি যেই চলতে শুরু করেছে, উঠল ফুটবোর্ডে, তারপর মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল পিছনের সিটে। হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটল।

গাড়ি চালাচ্ছে উপেন ধরই। কোথায় যাচ্ছে চঞ্চল জানে না। হয়তো এই ছোটো বিপদ থেকে আরও বড় বিপদের দিকে সে যাচ্ছে। এখন সে বুঝতে পারল, উপেন ধরই শেয়ালদা থেকে তার পিছু নিয়েছিল, তার আগেই এ বাড়িতে এসে ছিল লুকিয়ে। কিন্তু এই গাড়িটা এল কোত্থেকে? আর, পরীক্ষিৎবাবুই বা কোথায়? যদি তিনি এখানে নাই থাকবেন, তাহলে উপেন ধরের কী দরকার ছিল তার পিছু নিয়ে এখানে আসবার? আর তিনি যদি এখানেই, তাহলে তো উপেন ধরের এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথা নয়। যাই হোক, চঞ্চল মনে মনে ভাবলে, সে যে গাড়িটায় চড়ে বসতে পেরেছে, এটাই মস্ত লাভের কথা, কারণ, এ-রহস্যের সমাধান যে উপেন ধরের সূত্রেই হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কোথায় যাচ্ছে উপেন ধর? কে জানে! গাড়ি এমনভাবে ছুটেছে যেন একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে থামবে।

খানিক পরে গাড়ির বেগ একটু কমিয়ে উপেন ধর পিছনে তাকিয়ে বললে, 'ভালো চাও তো নেমে যাও গাড়ি থেকে।'

চঞ্চল জবাব দিল, 'পার তো জোর করে নামিয়ে দাও।'

'সেটা ইচ্ছে করলেই পারি তা জান?'

চঞ্চল বললে, 'দ্যাখো না চেষ্টা করে।'

আশ্চর্যের বিষয়, উপেন ধর অনেকবার শাসালে বটে, কিন্তু তাকে জোর করে নামিয়ে দেবার চেষ্টা একবারও করল না। ইচ্ছে করলেই সে যে তা পারে, তার কিলঘুষির সঙ্গে পরিচিত হবার পর চঞ্চলের তাতে সন্দেহ নেই। উপেন ধর একটু পরপরই পিছনের দিকে তাকাচ্ছিল, আর বিড়বিড় করে নিজের মনে কী বলছিল—চঞ্চল ভাবছিল যে, সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে আর তার উদ্দেশেই গালাগালি দিচ্ছে—কিন্তু খানিক পরে কেমন সন্দেহ হওয়ায় সেও পিছনের দিকে তাকাল, দেখল, আর-একটি গাড়ি তাদের পিছন-পিছন আসছে।

ডায়মন্ডহার্বরের রাস্তায় বেশি রাত্রেও গাড়ি চলাচল কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু খানিকক্ষণ লক্ষ করবার পর চঞ্চলের সন্দেহমাত্র রইল না যে, অন্য গাড়িটা ঠিক তাদেরই পিছু নিয়েছে। নিঃশব্দে, মাঝখানকার দূরত্ব সমানে রেখে গাড়িটা আসছে; উপেন ধর স্পিড বাড়ালে সেটারও বাড়ে, কমালে সেটারও কমে। বার বার পিছনে তাকিয়ে উপেন ধর ঐ গাড়িটাকেই তাহলে দেখছে, তাকে নয়?

ঐ গাড়িতে কে? সে যাই হোক, উপেন ধর যে তাকে পছন্দ করে না, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সে চলেছে কোথায়? একটা অ্যাকসিডেন্ট না করে! দেখতে দেখতে কলকাতা এসে পড়ল, সার্কুলার রোড ধরে গাড়ি সোজা চলেছে উত্তরে। অন্য গাড়িখানা ঠিক পিছন-পিছন আসছে। চঞ্চল এতক্ষণে বুঝতে পারল যে, উপেন ধর যে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে না, তার কারণ ঐ পিছনের গাড়িই। তাকে জোর করে নামাতে হলে গাড়ি থামাতে হবে, আর গাড়ি থামালেই পিছনের ওরা এসে পড়বে ঘাড়ে। মজা মন্দ নয়। হয়তো কোনো নতুন দারুণ বিপদের দিকে চলেছে, কিন্তু ভয়ের ভাবের চেয়েও চঞ্চলের যেন ভালোই লাগছিল বেশি!

শেয়ালদা পার হয়ে সার্কুলার রোড যেই বেশ চওড়া হয়ে এল, উপেন ধর এমন স্পিড দিলে যে, চঞ্চলের মাথা ভোঁ করে উঠল। বাপরে, দু-দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে শরীরটা শূন্যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাবে। চঞ্চল গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল, কিন্তু একটু পরেই উপেন ধর বিকট সুরে চিৎকার করে উঠতেই তাকিয়ে দেখল, একটা ল্যাম্পপোস্ট তীরের বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর উপায় নেই! এক্ষুনি চুরমার। চঞ্চলের শুধু এ-কথা ভাববার সময় হল যে, মরবার পক্ষে তার বয়েসটা বড়ই কম, সেই মুহূর্তেই উপেন ধর প্রাণপণে ব্রেক কষলে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা খেল, মস্ত একটা ঝাঁকুনি, তারপরেই চুপ।

একটু পরেই পিছনের গাড়িখানা তাদের পাশে এসে দাঁড়াল, ভিতর থেকে কে একজন বলল, 'কিছু ভাববেন না উপেনবাবু, আমাদের গাড়িতে আসুন, অনেক জায়গা রয়েছে।'

চঞ্চল গলার আওয়াজ চিনতে পারল—এ তো রণজিৎ সামন্ত।

রণজিৎবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'চলে আসুন, আর দেরি করে লাভ কী। গাড়িটা থাক, আমার একজন লোক এখানে রেখে যাচ্ছি। এস, চঞ্চল, তুমিও এস।'

চঞ্চল গাড়ি থেকে আগে নেমে পড়ল। 'আপনি! আপনি ডায়মন্ডহার্বরে ছিলেন?'

'সে-সব পরে হবে। উপেনবাবু, আর দেরি করে লাভ নেই। আজ রাত্তিরে একটু ঘুমাতে দেবেন, না দেবেন না?'

উপেন ধর নামল গাড়ি থেকে, তার মুখ একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর উপায় নেই, ধরা দিতেই হল পুলিশের হতে।

রণজিৎবাবুর সঙ্গে তিনজন ধুতি-পরা কনেস্টবল ছিল, তাদের একজন রইল উপেন ধরের গাড়ির পাহারায়। ইন্সপেক্টর নিজেও ধুতি পরা, চেহারা দেখে মনে হতে পারে, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে চলেছেন।

গাড়িটা বেশ বড়, সবারই জায়গা হয়ে গেল।

চঞ্চল রণজিৎবাবুকে জিগ্যেস করল, 'কোথায় চলেছেন?'

'চল, দেখবে।'

'পরীক্ষিৎবাবুর খোঁজ পেয়েছেন?'

'তুমি কি দেখলে ওখানে?'

'কিছুই না। ঐ উপেন ধর—'

'হ্যাঁ, তিনি তো সঙ্গেই চলেছেন। উপেনবাবু, আপনার তো দেখছি অনেক গুণ। গাড়িও চালান চমৎকার। দয়া করে বলে দিন, পরীক্ষিৎবাবু কোথায় আছেন—আপনার কিছু ভয় নেই।'

কিন্তু উপেন ধর একটিও কথা বললে না, সমস্ত রাস্তা চুপ করে রইল।

রাস্তা আর খুব বেশিও ছিল না। লালবিহারী মালাকারের কাশীপুরের প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে গাড়ি যখন ঢুকল, তখন রাত ঠিক দেড়টা। চঞ্চল বাড়িটা চিনতে পারলে, আগে সে একবার এসেছিল মহিমবাবুর কাজেই। গাড়ি থামতেই একতলার একটা দরজা খুলে গেল, ভিতরে দেখা গেল আলো।

রণজিৎবাবু সকলের আগে গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আসুন উপেনবাবু। নিজেই আসবেন, না হাত ধরতে হবে?'

উপেনবাবু নিঃশব্দে নামলেন, তার পিছনে চঞ্চল ও কনেস্টবল দুজনও নামল।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি আগে যান, উপেনবাবু।'

লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা মস্ত হল। সেই হলঘরে উপেন ধরের পিছন-পিছন সবাই ঢুকল। সেই ঘরে আছেন মহিমবাবু—আর পরীক্ষিৎ মজুমদার।

দশ

মহিমবাবু বললেন, 'আসুন ইন্সপেক্টরবাবু, আসুন। কিন্তু আপনার আগেই আমরা পরীক্ষিতের খোঁজ পেয়েছি, তা তো দেখছেন। কী করে পেলুম, তা যদি জানতে চান—'

'কী করে পেলেন তা জানি', বলেই ইন্সপেক্টরবাবু আবার পাহারাওয়ালাদের কী ইঙ্গিত করলেন, তারা হঠাৎ দুজনে মহিমবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল, পরের মুহূর্তে একজন খপ করে তাঁর হাত দুটো ধরে ফেললে আর একজন পরিয়ে দিলে হাত-কড়া।

চঞ্চল চিৎকার করে উঠল, 'এ কী! এ কী কাণ্ড!' পরীক্ষিৎবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, আর উপেন ধর মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল।

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'কে হে তুমি, তোমার তো বড্ড সাহস! খোলো, ওর হাত-কড়া খোলো। জান, ও আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু!'

'কী রকম বন্ধু এখুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। ঐ টেবিলের উপর কাগজখানা কী?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার?'

'তা দরকার একটু আছে বৈকি। আপনার নতুন উইলটা কী রকম হল?'

'এ সব বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি প্রস্তুত নই। তুমি এখানে এসেছ কেন—তোমাকে তো কেউ ডাকেনি?'

'কেন এসেছি? এইজন্যে—' রণজিৎবাবু এগিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে টেবিলের উপর থেকে কাগজখানা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে ভরলেন। পরীক্ষিৎবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, রণজিৎবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার সব কথা আগে শুনে নিন, তারপর যা হয় বলবেন। মহিমবাবু, আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হল, কিন্তু আপনি যেরকম ডেঞ্জেরাস ক্রিমিনাল, ঐ হাত-কড়াটা না হলেও চলছে না। মাপ করবেন। তাই বলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন না এখানে!'

পরীক্ষিৎবাবুর মুখে অপার বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। তিনি শুধু বললেন, 'তুমি কি পাগল হলে?'

রণজিৎবাবু একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'তাহলে সবটাই শুনুন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, চাটার্জি ব্যাঙ্ক যখন ফেল পড়ল? আপনার কত টাকা ছিল সেখানে?'

'ছিল কিছু। সে-কথা এখানে কেন?'

'কে একজন লোক জাল শেয়ার বেচে সরে পড়ল, ধরা গেল না। তাতেই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল, তাই তো? লোকটিকে এখন ধরা গেছে।'

'কে সে?'

'সে আপনার সামনেই বসে আছে। তার আসল নাম, মহিম চাটুয্যে, কিন্তু শেয়ারগুলো বেচেছিল, হলধর হালদার নামে; অর্থাৎ আপনাদের পাঁচজনের টাকা মেরে দিয়ে—'

পরীক্ষিৎবাবু ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মিথ্যে, মিথ্যে কথা! এর প্রমাণ?'

'প্রমাণ আমি যথাসময়ে কোর্টে দাখিল করব। তারপর হল কী—নানা ব্যাঙ্কে নানা বেনামিতে লাখ কয়েক টাকা রেখে তিনি খুব গরিবের মতো কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বের করলেন "কলকাতা হরকরা," এ পত্রিকার জন্য লালবিহারী মালাকারের কাছ থেকে মোটা টাকা বাগানো হল, আপনারা পাঁচজনও বাদ গেলেন না। কিছুদিন পরে নব-সাহিত্য-ভবনের সূত্রপাত হল, আপনার সব বই এখন থেকে ওরাই বার করবে, এইরকম কনট্রাক্ট হয়েছে, না?'

'তা তো হয়েছে। কিন্তু—'

'নব-সাহিত্য-ভবনের ম্যানেজিং-ডিরেক্টর জয়রাম শীলকে আপনি চেনেন? তাকে দেখেছেন কখনও?'

'তাকে দেখবার দরকার হয়নি। মহিমই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'তাকে দেখবেনও না কখনও, কারণ, মহিম চাটুয্যে আর জয়রাম শীল একই ব্যক্তি। নব-সাহিত্য-ভবন বেনামিতে মহিমবাবুরই কোম্পানি।'

'বল কী হে!'

'ঠিকই বলি। "দোর্দণ্ডপ্রতাপ"কে খাটো করে "কলকাতা হরকরা" যাতে জাঁকিয়ে উঠতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আগাগোড়া উনি নানারকম প্যাঁচ খেলে যাচ্ছেন। অসম্ভব চালাক লোক আপনার এই বন্ধুটি! আপনি কি লালবিহারীবাবু কেউ কিছু বুঝতে পারেননি!'

এখানে চঞ্চল বলে উঠল, 'কিন্তু পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধানের রহস্য'—

কথাটা শুনে পরীক্ষিৎবাবু চমকে উঠলেন!—'আমার অন্তর্ধান! তার মানে?'

'বাঃ এই একটা প্যাঁচেই "হরকরা"র কাটতি তিনগুণ বেড়ে গেল। আপনি তো এই কাশীপুরের বাগানবাড়িতে বসে আছেন—এদিকে খবরের কাগজে কী হুলুস্থূল—কলকাতায় কী হৈ-চৈ—পুলিশ, গুলি ছোঁড়া—ডায়মন্ডহার্বরে একটা পড়োবাড়িতে ধস্তাধস্তি—কত কিছুই তো হয়ে গেল! আপনি কি করে জানবেন—আপনাকে তো খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হয়নি, কি কারো সঙ্গে দেখা করতেও দেয়া হয়নি!'

'খবরের কাগজ আমি ইচ্ছে করেই পড়িনি। কাগজ খুলেই বড়-বড় অক্ষরে পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর খবর—এ আর ভালো লাগে না। বিরাট একটা হৈ-চৈ তো হবেই, তার আগে একটা দিন নিরিবিলি এই বাগানবাড়িতে কাটাব, এইরকম ইচ্ছে ছিল। তা, এ নিয়েও বুঝি হুলুস্থূল?'

'হুলুস্থুল বাড়িয়েছেন আপনার বন্ধুই—আর এই বাগানবাড়িতে এসে একটা দিন কাটাবার ইচ্ছেটা, মহিমবাবুই আপনার মনে জাগান—কেমন, ঠিক কিনা?'

'তা, মহিমই বলেছিল বটে—'

'এ কথাও বলেছিলেন যে, বিজয়বাবুকে যেন আগে জানানো না হয়, পাছে তাঁর আপত্তিতে এমন চমৎকার প্ল্যানটা ভণ্ডুল হয়ে যায়!'

'কিন্তু বিজয় কি খবর পায়নি? মহিম, তুমি জানাওনি বিজয়কে যে, আমি এখানে আছি?'

মহিম চাটুয্যে চুপ।

রণজিৎবাবু বলতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা এইরকম। মহিমবাবুর টাকার তৃষ্ণা অসীম! নানা অসৎ উপায়ে প্রায় সাত লাখ টাকা তিনি করেছেন, কিন্তু লোভ তাঁর বেড়েই চলেছে। এত বেশি লোভ করতে গিয়ে শেষ সামলাতে পারলেন না। কিন্তু মহিমবাবু, এ-কথা বলবই যে, আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক। যেমন আপনার কল্পনাশক্তি, তেমনি আপনার দুঃসাহস। এ-ব্যাপারটাও প্রায় গুছিয়ে এনেছিলেন, উপেন ধর মশাইও তাঁর পার্ট প্লে করেছেন চমৎকার, কিন্তু পরীক্ষিৎবাবুর ঘরে তাঁর টেবিলের উপর আরও একখানা অর্ধ-সমাপ্ত চিঠি পড়ে ছিল, সেটি আপনি সরাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাতেই আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভারি সহজ হয়ে গেল। আজ সকালে যে-চিঠিটা পরীক্ষিৎবাবুর টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আপনাদের সকলকে দেখালুম, তার তলাতেই আর-একখানা চিঠি ছিল, সেখানা চট করে আমি পকেটে ভরে ফেলেছিলুম, আর-কেউ লক্ষ করেনি।'

মহিমবাবুর মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তস্বর বেরুল।

রণজিৎবাবু পকেট থেকে একগাদা কাগজ বার করলেন। তার ভিতর থেকে একটি বেছে নিয়ে পড়লেন—"মহিম, আমি প্রিনসেপ ঘাটে থাকব, তুমি সেখানেই এস।" চিঠি শেষ করা হয়নি, টেবিলের উপরেই পড়ে ছিল। এ চিঠি পরে কি আপনি আবার লিখে পাঠিয়েছেন?'

রণজিৎবাবু কাগজখানা পরীক্ষিৎবাবুর সামনে টেবিলের উপর মেলে ধরলেন।

পরীক্ষিৎবাবু কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঐ আমার এক বদভ্যাস, একবারে একটা চিঠি প্রায়ই শেষ করতে পারিনে—এক লাইন লিখে উঠে যাই! হ্যাঁ, পরে এই চিঠিই আবার লিখে পাঠিয়েছিলুম বইকি, তাতে হয়েছে কি?'

'এ হাতের লেখা তবে আপনারই?'

'হ্যাঁ, আমার বইকি!'

'আচ্ছা, দেখুন তো, এ হাতের লেখা আপনার কিনা?' বলে রণজিৎবাবু আর-একখানা কাগজ ঔপন্যাসিকের সামনে মেলে ধরলেন।

'আরে, এ কী আশ্চর্য! এ তো হুবহু আমার হাতের লেখা, কিন্তু এ চিঠি তো আমি কখনও লিখিনি! কেনই-বা লিখব? আমি তো কখনও ডায়মন্ডহার্বরে বন্দী হইনি! এ কী কাণ্ড? এ যে দেখছি, দস্তুরমতো নভেলিয়ানা।' পরীক্ষিৎবাবু বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য! আপনার হাতের লেখার সঙ্গে এতই মিল যে, আমাদের হ্যান্ডরাইটিং-এক্সপার্ট-এরও প্রথমটায় ধাঁধা লেগেছিল। উপেন ধর মশাই নিপুণ শিল্পী বটে!'

পরীক্ষিৎবাবু উপেন ধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপেন, তোমার এই কাজ?'

উপেনবাবু হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার কোনো দোষ নেই—'

রণজিৎবাবু বললেন, 'ছি ছি, আপনি এত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন কেন? থামুন, থামুন! আরে, আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলই হল দেখছি। আপনার মতো একজন করিৎকর্মা লোকের কি এ-সব কান্নাকাটি মানায়? বাস্তবিক', পরীক্ষিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে সামন্তমশাই বলতে লাগলেন, 'এই উপেন ধরের মতো চৌকস লোক বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় না। রিভলভার ছুঁড়তেও ইনি ওস্তাদ। ছোট্ট কামরায় তিনজন লোক বসে আছে, একজনের কান ঘেঁষে, আর একজনের নাকের তলা দিয়ে, তৃতীয় ব্যক্তির ঠিক চুলের উপর দিয়ে গিয়ে গুলিটি কাঠের পার্টিশন ফুঁড়ে একঘর লোক পার হয়ে টাইপিস্টের টেবিলের তলায় গিয়ে পড়ল—ভাবতে পারেন?'

চঞ্চল এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল, এইবার বলে উঠল, 'ঐ গুলিটা তাহলে উপেন ধরই ছুঁড়েছিল? কেন? এর উদ্দেশ্য কী?'

ইন্সপেক্টরবাবু সে কথার জবাব না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সবই ঠিকঠাক মতো হয়েছিল, কিন্তু আপনাদের একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল মহিমবাবু, গুলিটা গরম ছিল না! এই ত্রুটি ছাড়া আপনাদের অভিনয় চমৎকার হয়েছিল—প্রশংসা করতে হয়। বিশেষ করে, আপনার পার্ট! ওঃ, আপনার টেবিলের তলায় ঢোকাটি কী চমৎকারই হয়েছিল—ভুলতে পারছি না। রিয়্যালি ম্যাগনিফিসেন্ট!'

বলে রণজিৎবাবু হাসতে লাগলেন।

চঞ্চল বললে, 'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, কেন ছোঁড়া হয়েছিল? কার উদ্দেশ্যে?'

রণজিৎবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, 'এইখানেই তো মজা। গুলিটা আসলে ছোঁড়াই হয়নি, ওটা আগে-থেকেই পড়ে ছিল টাইপিস্টের টেবিলের তলায়। পিছন থেকে উপেনবাবু একটা ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন মাত্র!'

'পিছন থেকে! কোত্থেকে?'

'মহিমবাবুর কামরার পিছনেই তাঁর বাথরুম, সেখান থেকে।'

'তারপর তিনি পালালেন কেমন করে?'

'পালাবার দরকার হয়নি, বাথরুমেই বসে ছিলেন। তুমি হয়তো লক্ষ করোনি চঞ্চল, বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল, আর দরজায় একটা নোটিশ লাগানো ছিল—'Not to be used.'

চঞ্চল বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! তাই তো! বাথরুমটা খুঁজে দেখবার কথা তো কারও মনে হয়নি!'

'আমার হয়েছিল, কিন্তু দরকার বোধ করিনি। ব্যাপারটা কী, আমি তার আগেই বুঝে ফেলেছিলাম। মহিমবাবু একটা ঘণ্টা টিপলেন, বেয়ারার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, "টাইপ"। তারপরেই তো এই কাণ্ড! ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে আসলে উপেন ধরকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল।'

'কিন্তু এর দরকার কী ছিল, তাই তো আমি বুঝতে পারছি না!'

'দরকার ছিল এইটে প্রমাণ করা যে, পরীক্ষিৎবাবুর শত্রুরা শুধু তাঁকে সরিয়েই তৃপ্ত হয়নি, তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু মহিম চাটুয্যেকেও খুন করবার চেষ্টায় আছে।'

এখানে পরীক্ষিৎবাবু বলে উঠলেন, 'তোমার কথাবার্তা শুনতে-শুনতে আমার মাথা ঘুরছে; কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে প্রথম থেকে বুঝিয়ে বলো, নয়তো একটু পরেই মনে হবে যে, পাগল হয়ে গেছি।'

সামন্তমশাই বললেন, 'বেশ, প্রথম থেকেই বলি। মহিমবাবুর এটা হল দেখা-বিস্তির খেলা। প্রথম থেকেই দু-হাতের খেলা খেলে যাচ্ছেন—সকলের সামনে এগিয়ে আছেন বরাবর, যাতে তাঁর উপর কোনোরকম সন্দেহ পড়বার কথাই না ওঠে। আর তাঁর সহকর্মী হিসাবে নিলেন বেচারা উপেন ধরকে। উপেনবাবুকে সত্যি খুব দোষ দেওয়া যায় না।—তিনি মহিমবাবুর হাতের পুতুলমাত্র—তাঁর অবস্থা ভালো নয়, মোটা টাকার লোভে রাজি হয়েছিলেন।'

হঠাৎ উপেন ধর আবার খানিকটা ফোঁস্ ফোঁস্ করে কেঁদে উঠলেন।

ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'মহিমবাবুর মতলব ছিল, এই ব্যাপারে একঢিলে অনেকগুলো পাখি মারা। প্রথমত, "দোর্দণ্ডপ্রতাপ" আর বৃন্দাবন গুপ্তকে জব্দ করা—এঁরা পরীক্ষিৎবাবুর পক্ষপাতী নন, তাঁদের উপর সন্দেহ ফেললে লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে। বেচারা বৃন্দাবন গুপ্তকে তো রীতিমতো হাজতবাসই করিয়ে নিলেন। আহা—এতক্ষণে বোধহয় আধখানা হয়ে গেছে বেচারা। লালবাজারে গিয়ে প্রথমে ওঁকে ছেড়ে দিয়ে তারপর অন্য কাজ।"

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'সে কী! বৃন্দাবন গুপ্ত হাজতে!'

'হ্যাঁ, আপনার অন্তর্ধানের সঙ্গে বৃন্দাবন গুপ্তের যে কোনোরকম সংশ্রব আছেই,

মহিমবাবু প্রথম থেকেই খুব জোর দিয়ে তো বলতে লাগলেন। আমি ভদ্রলোককে ধরেই আনলুম—পাছে মহিমবাবু বুঝতে পারেন যে, আসল ব্যাপারটা কি, যা আমি আঁচ করেছি। এর মধ্যে উপেন ধরকে এমন কৌশলে মহিমবাবু জড়িয়েছিলেন যে, আমারও প্রথমটায় খটকা লেগেছিল। উপেন ধরের উপর খানিকটা সন্দেহ তিনি এইজন্যেই ফেলেছিলেন, যাতে পুলিশের গোলমাল লাগে।

'এদিকে লালবিহারীবাবুকে পটিয়ে মহিমবাবু শ্রী ইনসিওরেন্স কোম্পানি ফাঁদবার চেষ্টায় আছেন—অবশ্য নিজের নামে নয়, মাঝখানে উপেন ধর আছেন শিখণ্ডী। পরীক্ষিৎবাবুকে দিয়ে অনেকগুলো শেয়ার কিনিয়ে, তাঁকে ডিরেক্টর করে, জয়ন্তীর দিনে সব কাগজে তাঁর ছবি দিয়ে বড়-বড় বিজ্ঞাপন বেরুতো—বেশ ভালোই হত; কিন্তু এর মধ্যে আর-একটু প্যাঁচ না-কষে মহিমবাবু তৃপ্ত হতে পারলেন না। তাই তিনি ভাবলেন—পরীক্ষিৎ একদিন গিয়ে মালাকার-মশাইয়ের কাশীপুরের বাগানে থাকুক, এদিকে আমি "হরকরা"য় তুমুল কাণ্ড করি যে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অন্তর্হিত। "হরকরা"র হু-হু করে কাটতি হবে, তারপর ঠিক জয়ন্তীর দিন ভোরবেলা ঔপন্যাসিকটিকে বের করে আনব—এবং তাঁকে উদ্ধারও করবে, পুলিশ নয়, অন্য কেউ নয়, "হরকরা"ই। মোটের উপর এ-ব্যাপারে "হরকরা"র প্রতিপত্তি এত বেড়ে যাবে যে, "দোর্দণ্ডপ্রতাপ" কে নীচে ঠেলে সে ধাঁ করে উপরে উঠে যেতে পারবে। আর পরীক্ষিৎ-উদ্ধার ব্যাপারের নায়ক তিনি স্থির করলেন এই চঞ্চলকে, যে তাঁর আপিসের মধ্যে সবচেয়ে ছেলেমানুষ, যে কিছুই বুঝবে না, যাকে ইচ্ছেমতো চালানো যাবে।

'এরপর নাটকটি বেশ যত্নে সাজানো হল। পরীক্ষিৎবাবু এমনিই ক্লান্ত ও লোকের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ছিলেন—তাঁকে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে বিশ্রাম করতে সহজেই রাজি করানো গেল। মহিমবাবুর প্ল্যানে রাজি হয়ে পরীক্ষিৎবাবু তাঁকে চিঠিও লিখলেন। স্থির হল, আগে কাউকে কিছু বলা হবে না, পরে বলা হবে শুধু বিজয়বাবুকে, তাও খুব চুপে-চুপে। আঠারো তারিখ সন্ধের পরে গঙ্গার ধারে মহিমবাবুর সঙ্গে পরীক্ষিৎবাবুর দেখা হল। পরীক্ষিৎবাবু গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন—তাঁর ড্রাইভার যে লম্বা লোকটিকে দেখেছিল, সে মহিম চাটুয্যে ছাড়া আর কেউ নয়।'

'অ্যাঁ।' চঞ্চলের গলা দিয়ে একটা বিস্মিত আওয়াজ বেরুল।

'সেখানে আলো কম ছিল, ড্রাইভার দূর থেকে ভালো দেখতে পায়নি, লক্ষও করেনি। লম্বা লোকটি কে হতে পারে, তা নিয়ে কত গবেষণা; এ কথা অবশ্য কারুরই মনে হয়নি যে, মহিমবাবুও লম্বা। হবার কথাও নয়। এদিকে লম্বা লোকটিকে যাতে

উপেন ধর বলেই সন্দেহ হয়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। উপেন ধরকে ঐ প্রিনসেপ ঘাটে রেখে পরীক্ষিৎবাবুকে নিয়ে মহিমবাবু চলে এলেন কাশীপুরে। আপনারা কি ট্যাক্সিতে এসেছিলেন, না মহিমবাবুর গাড়িতে?'

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'ট্যাক্সিতে। কিন্তু উপেনকে তো ওখানে আমি দেখিনি!'

'আপনার তো দেখবার দরকার নেই, যাদের দরকার, তারা দেখেছিল। রাত্রে বিজয়বাবু যখন চঞ্চলকে নিয়ে প্রিনসেপ ঘাটে গেলেন, উপেনবাবু তার আগেই বৃন্দাবন গুপ্তের একটি ভিজিটিং কার্ড ওখানে ফেলে রেখেছিলেন—যে-কোনো লোকের একখানা কার্ড জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। তারপর ইচ্ছে করে ওদের সামনে দিয়ে হুস করে ছুটে পালিয়ে গেলেন—এ আর কিছুই নয়, ব্যাপারটাকে আরও জটিল, আরও গোলমেলে করে তোলা। ময়দানের ভিতরে অন্ধকারে তিনি যেন একেবারে মিলিয়ে গেলেন—না, চঞ্চল?'

'তা-ই তো মনে হয়েছিল!'

'ময়দানের মধ্যে একটু দূরেই একটি গাড়ি অন্ধকারে মিলিয়ে ছিল—লালবিহারীবাবুর একটি ছোটো অস্টিন, মহিমবাবু কয়েকদিনের জন্য ধার এনেছিলেন। এ-গাড়ি কোন কাজে লাগবে, লালবিহারীবাবুর অবশ্য তা স্বপ্নেরও অগোচর। সেই গাড়ি নিয়ে একেবারে ছুট মহিমবাবুর বাড়িতে। তারপর থেকে উপেন ধরকেও আর পাওয়া যায় না—কী করেই বা যাবে, তিনি যে মহিমবাবুর বাড়িতেই দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর ঘুমুচ্ছেন। তোমরা যখন মহিমবাবুর বাড়ি গেলে চঞ্চল, উপেন ধর তখন তোমাদের পাশে ছোটো ঘরটিতেই আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন।'

চঞ্চল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বলেন কী!'

'এই তো ব্যাপার। বিজয়কৃষ্ণকে কিছুই বলা হল না, গরম-গরম "হরকরা" বেরুল আশ্চর্য খবর নিয়ে, পুলিশকে টেলিফোন করলেন মহিমবাবুই, তারপর পুলিশের মহা বন্ধু ও উপদেষ্টা হয়ে বসলেন। "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র প্রোপাইটর শশাঙ্ক বক্সিকেও এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। সকালবেলাই উপেন ধরের জাল চিঠি ডাকে দেওয়া হল, তারপর দুপুরবেলা মহিমবাবু তাকে লুকিয়ে আপিসে এনে বাথরুমে বন্ধ করে রাখলেন। আমি যেই বললুম, "আমরা সকলকে সন্দেহ করি, যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণ না হয়" তার একটু পরেই ঘণ্টা বাজাল আর গুলির আওয়াজ হল। এতে এটা প্রমাণ হল যে, আর যাই হোক, মহিম চাটুয্যেকে সন্দেহ করবার সাহস পুলিশেরও নেই; তাছাড়া, "হরকরা"র বিজ্ঞাপনের দিক থেকেও মস্ত লাভ, জাঁকালো স্পেশাল বেরুল বিকেলে। মহিম চাটুয্যেকে হত্যা করবার চেষ্টা—উঃ, কী সাংঘাতিক! তোলপাড় পড়ে গেল শহরে।

'তারপরে ডায়মন্ডহার্বরের খবর নিয়ে ঐ চিঠি। ওর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পুলিশকে নিয়ে একটু রগড় করা! তোমাকে নিয়েও চঞ্চল! উপেন ধরকে পাঠানো হল, কারণ, তাকে অনুসরণ করে আমরা ঠিক জায়গায় এসে হাজির হব—আর তখন মহিমবাবু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবেন—পরীক্ষিৎ-উদ্ধারকার্য তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে গেছে, আমাদের মিছিমিছি খাটালেন বলে দুঃখিত। কী করে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হল, সে-বিষয়ে ছোটো একটি গল্পও ভেবে রেখেছিলেন—আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে বলতেন, আর আমরা তাঁর ক্ষমতায় স্তম্ভিত হয়ে কুর্নিশ করে বিদায় নিতুম। কিন্তু সেটুকু সময় তাঁকে আর দেওয়া হল না।

'তুমি বোধ হয় জান না চঞ্চল, তোমার পিছন পিছন একই ট্রেনে উপেন ধরকে পাঠানো হয় ডায়মন্ডহার্বর, আবার তার পিছনে আমার একজন চর ছিল! ডায়মন্ডহার্বর স্টেশনে সেই গাড়িটি অপেক্ষা করছিল, তুমি স্টেশন থেকে বেরোবার আগেই উপেনবাবু সেই গাড়ি নিয়ে উধাও হলেন—ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে। সন্ধের কিছু পরে উপেনবাবু সেখানে এলেন গাড়ি নিয়ে, গাড়িটা কিছু দূরে রেখে ঢুকলেন বাড়িতে। তুমি তখন ভিতরের ঘরে বসে কাঁপছ, আর আমি পিছনদিকের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে! উপেনবাবুর ঘুঁষিগুলো যখন তোমার উপর পড়ছিল, আমার কষ্ট হচ্ছিল তোমার জন্যে, হাসিও পাচ্ছিল, কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করিনি, কারণ, তাহলে নাটকটা মাঝখানেই নষ্ট হয়ে যায়। ঘুঁষোঘুঁষির উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কালকের "হরকরা"য় খুব ফলাও করে ছাপা। উপেন ধরই অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে পুলিশের হাতে, বানিয়ে যা-খুশি একটা গল্প বলবে, তারপর, প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতেই হবে—মহিমবাবুর প্ল্যান ছিল এইরকম। এদিকে তোমাকেও একজন ছোটো-খাটো হিরো সাজিয়ে "হরকরা"য় কোন-না লম্বা-চওড়া লেখা বেরোবে! তুমি ভেব না চঞ্চল, যে, তুমি উপেন ধরের গাড়িতে লাফিয়ে উঠতে পেরে খুব একটা বীরত্ব করেছিলে, তোমাকে না নিয়ে উপেন ধর যেতোই না। তারপর পিছন-পিছন আমি আসব, তাও উপেন ধর জানে। সহজে ধরা দিলে ভালো দেখায় না, সেইজন্যে এত দূর এসে ইচ্ছে করে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে গাড়িটাকে আস্তে ঠুকে দিলে।...উপেনবাবু, আপনি যেমন চমৎকার অভিনেতা, তেমনি চমৎকার গাড়ি-চালিয়ে। মহিমবাবুর প্ল্যান ছিল, উপেন ধরকে ধরতে পারার জন্য আমাকে প্রচুর কন্‌গ্র্যাচুলেট করবেন, আমাকে বলবেন, তাকে এখুনি হাতকড়া পরিয়ে লালবাজার নিয়ে যেতে; কিন্তু ব্যাপারটা হল একটু অন্যরকম।....আচ্ছা, মহিমবাবু, আপনাকে তাহলে এখন কষ্ট করে একটু গা তুলতে হচ্ছে। উপেনবাবু, আপনিও আসুন, আপনার কিছু ভয় নেই, সত্য কথা সব খুলে বলবেন, এই আর কি!'

উপেন ধরের গলা দিয়ে বিকৃত একটা শব্দ বেরুল, তার মানে বোঝা গেল না।

সব শুনে পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাথাটা ঝিমঝিম করছে!'

'বোঝবার আর কী আছে, বলুন? হ্যাঁ, একটা কথা। এত রাত্তির অবধি জেগে ছিলেন?'

পরীক্ষিৎবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'একটু জরুরি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।'

'উইলের বিষয় তো? মহিমবাবু আপনার কানে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অনেক বিষ ঢালছিলেন, সেটা বুঝতেই পারছিলুম। আপনি না থাকলেই বিজয়বাবু খুশি হন, আপনার টাকার ওপরেই ওঁর নজর....এই তো? নূতন উইলের ড্রাফ্‌টটা পকেটেই রয়েছে, ওতে মহিমবাবুর ছেলের নামে কত দিচ্ছিলেন?...আপনার অনুমতি পেলে ওটা ছিঁড়ে ফেলি।'

পরীক্ষিৎবাবু উত্তরের অপেক্ষা না করেই রণজিৎবাবু পকেট থেকে সেই কাগজটা বের করে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন। একটা হাই তুলে বললেন, 'ওঃ, এখন একটু না-ঘুমুলে আর পারব না! মহিমবাবু চলুন, আপনাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিই—কিছু ভাববেন না, আপনার বন্ধু উপেন ধরও সঙ্গে থাকবেন। উঃ, আপনার মতো টাকার লোভ সাধারণত দেখা যায় না। লালবিহারীবাবুকে দিয়ে একটা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন, সেটাও "হরকরা"র নাম করে আত্মসাৎ করতেন। যাই হোক, আপাতত কয়েক বছরের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত হলেন—আপনার সমস্ত খরচ গভর্মেন্টই বহন করবে।'

এরপর পরীক্ষিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে রণজিৎবাবু বললেন, 'আচ্ছা, এখন তাহলে বিদায় নিচ্ছি আমরা, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা পুলিশের লোক, নানারকম অপ্রিয় কাজ করতে হয়, আপনার মূল্যবান সময়ও অনেকখানি নষ্ট করে গেলুম, তবে এটুকু ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমার আজকের দিনের খাটুনি একেবারে ব্যর্থ হয়নি—আপনার জীবনের উপর হতে মস্ত কালো একটা ছায়া আমি সরিয়ে নিতে পারলুম।"

* * * *

পুলিশে ঘেরাও হয়ে গাড়িতে ওঠবার আগে মহিম চাটুয্যে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চললুম চঞ্চল। ফিরতে কিছু দিন দেরি হবে। যদি পার, "হরকরা" চালিয়ে নিও।'

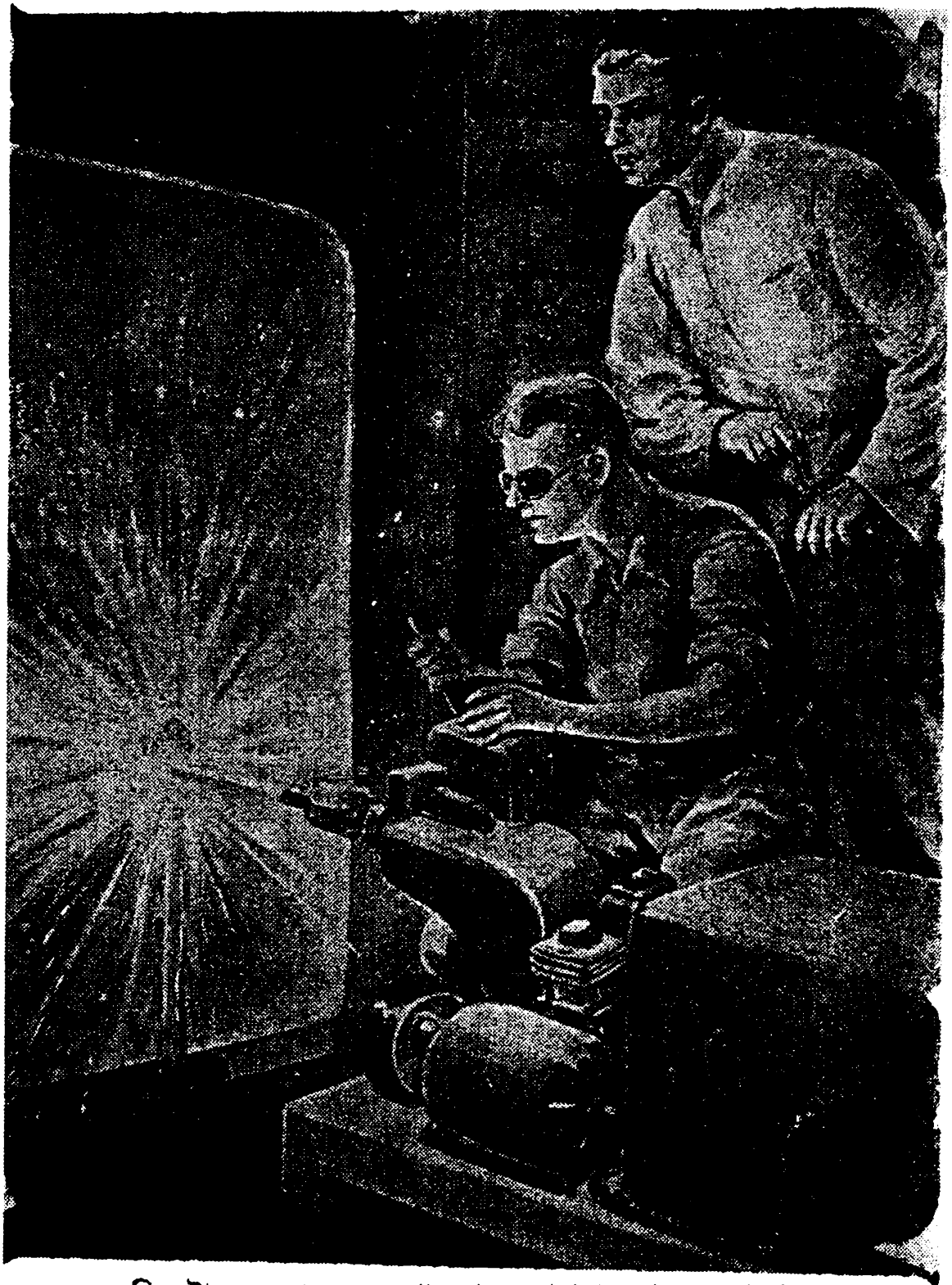
হারানো বই



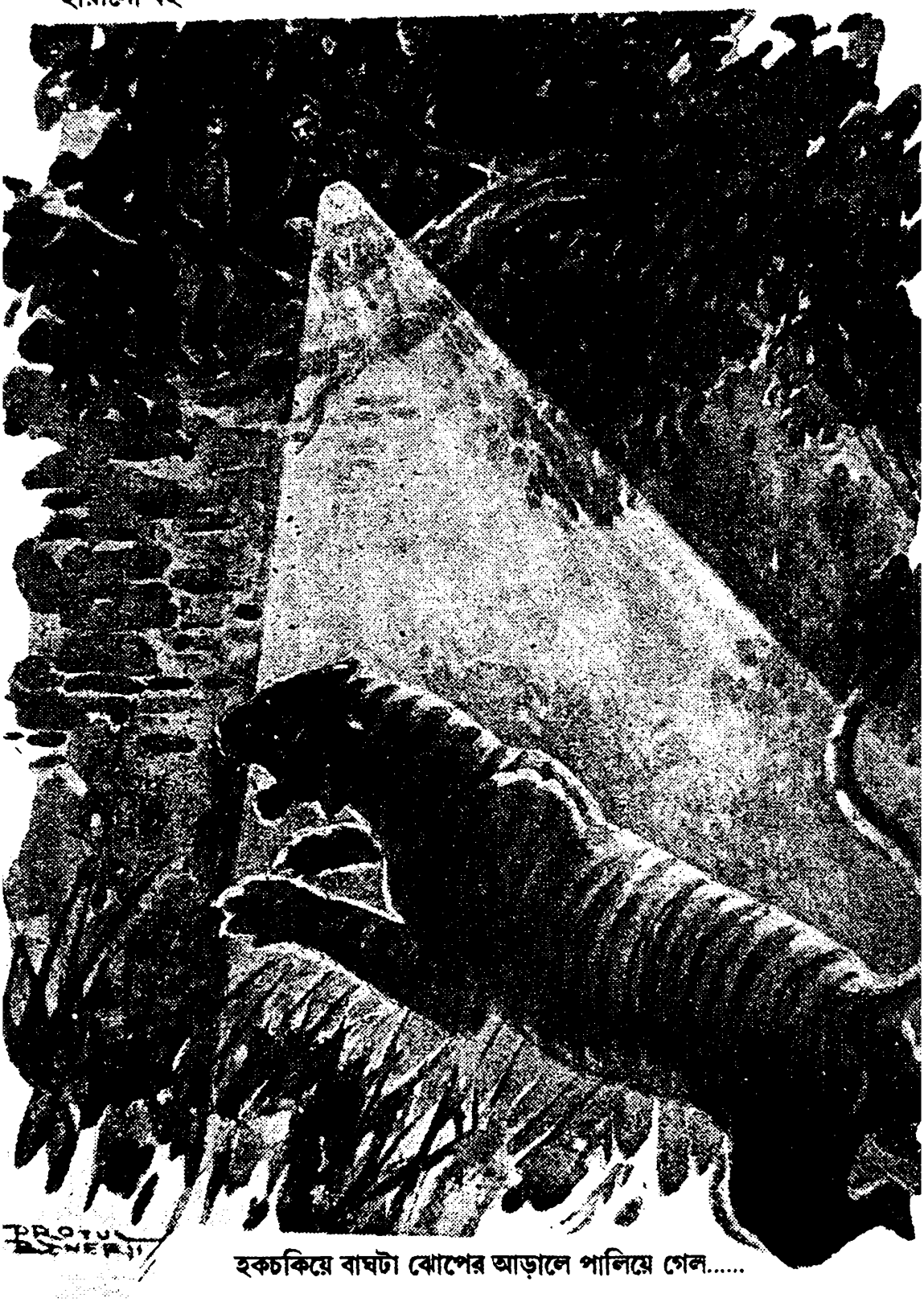
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত



ওকি হচ্ছে ঠাকুর্দ্দা, সব যে একেবারে তছনছ করে ফেললেন।



সিন্ধুকটা তেতে লাল হয়ে সেখান থেকে লোহা গলে পড়তে লাগলো।



হকচকিয়ে বাঘটা ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল.....

হারানো বই

এক

বুড়ো-ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু কথাটা দারুণ সত্যি। এ বাড়িখানা আমি আর আমার কয়েকজন সাঙাৎ একদিন মাথায় করে তুলেছি।"

সবাই জানে বুড়োর মাথায় একটু ছিট আছে। নিজের অতীত-জীবন সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কথা বলবার বাই অনেক বুড়োর থাকে, এ ভদ্রলোকের সে-বাই যেন বেশি মাত্রায়। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি কেমন করে বিপুল সম্পদ তৈরি করেছেন সে-ইতিহাসের অনেক অদ্ভুত কথা তিনি সবাইকে শুনিয়েছেন। সে কাহিনির অনেক কথাই এত অদ্ভুত যে তাঁর শ্রোতারা সেগুলি নিতান্ত রচা-কথা বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন চিরদিন। কিন্তু এ কথাটা একেবারে চরম! অতবড় তিনতলা বাড়িখানা মাথায় করে তুলেছেন, এমন অদ্ভুত কথা বিংশ-শতাব্দীতেও লোকে বলতে পারে, না শুনলে তারা তা বিশ্বাস করত না।

কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল।

হাসিতে উড়ে যাবার ছেলে সে বুড়ো নয়। তাই তিনিও হেসেই বললেন, "অবাক হচ্ছেন আপনারা, কেমন?"

একজন মধ্যবয়স্ক শ্রোতা বললেন, "না, অবাক হচ্ছি না, কেবল সর্বান্তঃকরণে অবিশ্বাস করছি।"

"কেননা, অতবড় বাড়ি হাজার দু-হাজার লোকেও মাথায় করে তুলতে পারে না, তাই না?"

"তাই যদি জানেন, তবে এমন আজগুবি গল্প তৈরি করে বলতে গেলেন কেন?"

"কেননা কথাটা আজগুবি তো নয়ই, নেহাৎ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেখতে চান? ঐ দেখুন।"

ভদ্রলোক আঙুল দেখালেন যেদিকে সেখানে একখানা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। সবাই সেদিকে তাকাল, দেখবার মতো কিছুই দেখতে পেল না কেউ।

একজন বললে, "একখানা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কই, কেউ তো ওকে মাথায় করে আনছে না।"

"আনছে না? ওই ভারার গায়ে সিঁড়ির দিকে চেয়ে দেখুন তো।"

"হ্যাঁ, সিঁড়ি দিয়ে দুটো লোক ইট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

বুড়ো-ভদ্রলোক বললেন, "অমনি করে এরা মাথায় যে ইট বয়ে এনেছে তাই একটার পর একটা সাজিয়ে নিয়ে একতলা গাঁথা হয়েছে। ওদের মাথায়-বওয়া ইট দিয়েই এখন দোতলা গাঁথা হয়েছে; তাই দিয়েই হয়তো তেতলা, চারতলা হয়েছে। এরাই মাথায় করে গোটা-বাড়িটাই তুলছে। বুঝলেন?"

এতক্ষণে কথাটা বুঝে একজন শ্রোতা বললেন, "ও, আপনি বলতে চান যে এই বাড়ি তৈরি হবার সময় আপনি অমনি মাথায় করে ইট বয়ে তুলেছিলেন?"

"হ্যাঁ—আমি আর মাত্র আর তিনজন লোক। আর সেই ইট-বওয়া থেকেই আমার সম্পদের সূত্রপাত।"

হেসে একজন শ্রোতা বললেন, "আপনি বলছেন যখন সেকথা শুনতেই হবে। কিন্তু ইট-বইবার মজুরি করে লোকে বড়লোক হতে পারে সেকথা বিশ্বাস আমরা করব না। ঐ মজুরেরা যা মজুরি পায় তাতে তাদের পেটের অন্ন টায়-টোয় জুটতে পারে, তা থেকে বড়লোক হওয়ার কল্পনা একটা রূপকথা।"

"রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত। কিন্তু তাই হয়েছে আমার বেলায়।

"সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখে কলকাতায় এসেছিলাম রোজগারের চেষ্টায়। আর কিছু না পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় একদিন এই ইট-বইবার মজুরি নিলাম।

"ভিত খোঁড়া থেকে তেতলা বাড়ি তৈরি হওয়া দেখলাম, এর সব ইট চুন সুরকি বালি সিমেন্ট মাথায় বয়ে নিয়ে গেলাম। দেখে দেখে শিখে ফেললাম কেমন করে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করে। যখন তেতলার গাঁথনি হয় তখন আমি নিজে গাঁথতে লেগে গেলাম শখ করে।

"রাজমিস্ত্রি আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে আমাকে কাজ শেখালে। তারপর সে যে বাড়ি গাঁথলে, তাতে আমি তার সঙ্গে গাঁথনির কাজ করলাম। কাজটা শেষ হবার আগেই সে মিস্ত্রি গেল মরে, তখন আমিই বাকি কাজ চালিয়ে দিলাম।

"যে ইঞ্জিনিয়ার সে বাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি আমার কাজে খুব খুশি হয়ে আরও কাজ দিলেন আমাকে।

"কয়েক বছর বাদে কয়েক লাখ টাকার একটা কন্ট্রাক্ট পেলেন সে ইঞ্জিনিয়ার, একটা বড় কারখানা তৈরি করতে। আমি তাঁর হাতে-পায়ে ধরে লাখচারেক টাকার কাজের সব-কন্ট্রাক্ট নিলাম, কপাল ঠুকে। তাতে হাঙ্গাম কিছু ছিল না। কিছু টাকা

আগাম দিলে মিলওয়ালারা, তারপর যেমন যেমন কাজ হতে লাগল, তেমনি তারা টাকা দিতে লাগল। ইট সুরকি চুন কাঠের মহাজনেরা ধারে মাল দিত, যেমন যেমন কাজ হত, তাদের টাকা চটপট শোধ করে দিতাম।

"এতে প্রায় লাখখানেক টাকা লাভ হল আমার। তা ছাড়া মহাজনদের কাছে আমার ভারী 'ক্রেডিট' হয়ে গেল।

"সেই শুরু। তারপর সেই লাখ টাকা ঘুরে-ফিরে অনেক লাখ হল, অনেক লাখ গেল। তারপর যোগ-বিয়োগ করে যা রইল তাই আমার আজকের সম্পদ।"

এইবারে সব শ্রোতারা অবাক হয়ে বুড়ো-ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষের আজকের অবসৃত অনাড়ম্বর-জীবনের আড়ালে যে অপূর্ব রোমাঞ্চকর কাহিনি লুকানো আছে তার কথা স্মরণ করে তারা অবাক হয়ে গেল।

ভদ্রলোক পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "দেখবে তোমরা? আমার সেই মধুর জীবনের স্মৃতিচিহ্ন আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি আজও। এই বাড়ির কাজ শেষ হলে এর প্ল্যানগুলো আমি চেয়ে নিয়েছিলাম। সেগুলো এখনও আছে।"

বলে ভদ্রলোক তাঁর একটা স্টিলের আলমারি খুলে খুঁজতে লাগলেন।

আলমারির আদ্যোপান্ত খুঁজলেন তিনি। তারপর একটি একটি করে তার ভিতর থেকে দামি দামি সব জিনিসগুলো টেনে বের করে যা-তা করে মেজের উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পাগলের মতো সব তোলপাড় করে ফেললেন।

তারপর আর এক আলমারি, তারপর আর এক আলমারি খুলে সব ওলট-পালট করে ফেললেন। উন্মাদের মতো তিনি সব জিনিস হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন শুধু, "অ্যাঁ! কোথা গেল!"

তাঁর নাতি এসে বললে, "ওকি হচ্ছে ঠাকুর্দা, সব যে একেবারে তছনছ করে ফেললেন! আপনাকে নিয়ে আর পারি না!" বলে সে জিনিসপত্র গুছোতে লাগল।

বুড়ো বললেন, "সেই বইখানা পাচ্ছি না মহী—কোথা গেল দেখ তো?"

মহীতোষ বললে, "আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি খুঁজে দেখছি।"

খোঁজ অনেক হল, কিন্তু সে বইখানা পাওয়া গেল না।

দুই

সর্বতোষবাবুর বৈঠকখানায় সে-সময় যারা বসেছিল তারা সবাই কেউ রীতিমতো বুড়ো, কেউ আধবয়সী—কেবল সৃষ্টিধর ছিল ছোকরা। সে সম্প্রতি সর্বতোষবাবুর এক ছোট-নাতির প্রাইভেট-টিউটর হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো পরীক্ষা খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে সে যখন ফলিত-পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি ডিগ্রি নিয়ে বের হল তখন সে প্রথমে ভেবেছিল যে, সে এত বড় বৈজ্ঞানিক, বিশেষ ফলিত-পদার্থবিদ্যা-বিশারদ, লক্ষ্মী তো তার হাতধরা। তারপর আরম্ভ হল চাকরির চেষ্টা। সে চেষ্টা করতে গিয়ে সে ক্রমে দেখতে পেল যে লক্ষ্মী কোন ছার, তাঁর কালপেঁচার একটা ঝরে-পড়া পালক পর্যন্ত তার মুষ্টির ভিতরে আসতে নারাজ।

বড়-ছোট নানারকম কারখানার মালিকদের কাছে ঘুরে সে তার বিদ্যার পরিচয় ফলাও করে দিতে লাগল। কেউ তাকে দোর-গোড়া থেকে হাঁকিয়ে দিলেন, কেউ বললেন, "হুঁ", কেউ সহৃদয়ভাবে বললেন, "আহা! এত শিখেছ তুমি, কিন্তু কি করবে? দিন-কাল বড় খারাপ!"

একজনের কাছে গিয়েছিল সে, তিনি একটা মস্ত কারখানার মালিক। তাঁকে সৃষ্টিধরের বাবা তাঁর অসময়ে মস্ত উপকার করেছিলেন। সেই ভরসায় সে তার বাপের পরিচয় দিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিল।

তিনি বললেন, "বটে, তুমি ধরণীবাবুর ছেলে! তা কি চাও তুমি?"

"আজ্ঞে, আপনার কারখানায় একটা চাকরি—"

হেসে বাবু বললেন, "কারখানায় চাকরি! কারখানায় কি আমি চাকরির অন্নছত্র খুলে বসে আছি বাপু? রোজ চার-বেলা শয় শয় লোক আসছে চাকরি দাও বলে। চাকরি অত সহজ নয় হে!"

"কিন্তু আমি applied physics-এ এম. এস-সি পাশ করেছি।"

এবার তীব্র হাস্যনিনাদ করে বাবুটি বললেন, "তাতে তুমি ভাবছ তুমি একটা মস্ত দিগ্‌গজ হয়েছ? এসব কারখানার কাজে ঐ তোমার এম. এস-সি ডিগ্রির মূল্য কানাকড়িও নয়! ম্যাট্রিক পাশ করে যে আসে তার চেয়ে তোমার এম. এস-সির দাম এক পয়সাও বেশি নয়। বরং ম্যাট্রিক পাশ যারা তারা দশ টাকায় ঢুকতে পারলে খুশি হয়ে যায়, আর তোমরা তোমাদের ঐ ডিগ্রির গরমে দশ টাকার নাম শুনলে তিড়িং করে জ্বলে উঠবে! আমার পরামর্শ শোনো। এতগুলো পাশ যখন করেছ একটা মাস্টারির চেষ্টা দেখ, তাতে হয়তো করে খেতে পারবে। কারখানার কাজ তোমার পোষাবে না।"

সৃষ্টিধর বলল, "বেশ, আপনি দশ টাকার কাজই দিন আমায়, না হয় নাই দিলেন কিছু, আমায় কিছুদিন কাজ করতে দিন শুধু। কাজ দেখাতে পারি, আপনার কারখানার উন্নতি করতে পারি, ভালো মাইনে দেবেন, নয়তো দেবেন না!"

হো হো করে হেসে উঠে বাবু বললেন, "বাপু হে, ঐ তো তোমাদের দোষ।

এম. এস-সি পাশ করেছ অমনি ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছ। হাতের কাজ জান না সিকি পয়সার—ভাবছ আমার কারখানার উন্নতি করবে! বাপু হে, নিজের ওজন অত বেশি করে ভেব না! তাতে জীবনে অনেক দুঃখ পাবে। তুমি যার যোগ্য তার চেয়ে বেশি আশা কর না।"

নাছোড়বান্দা সৃষ্টিধর এতেও যখন বললে, যে-কাজ হোক তাই সে করতে রাজি, তখন বাবুটি বললেন, "তাই তো, এখন তো কোনও কাজ নেই, বাজার যে মন্দা, যে লোক আছে তাই ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। এখন তো কিছুই সম্ভব নয়।"

সৃষ্টিধর মনে মনে গর্জে বলতে লাগল, "কাজই যদি নেই তবে না হক ঐসব লম্বা লম্বা উপদেশ ও অপমান বিতরণ করবার কিই বা প্রয়োজন ছিল? বাবা যে তোমার অসময়ে উপকার করেছিলেন সেটা এমন কিছু অপরাধ নয় যার জন্যে তাঁর ছেলেকে বাগে পেয়ে অপমান করতে হবে।"

এমনি দু-দশটা অপমান বা প্রত্যাখ্যান রোজ হজম করতে করতে সে একদিন সন্ধান পেয়ে এল সর্বতোষবাবুর বাড়ি, আর সেখানে এসে সে দশ টাকা বেতনে তাঁর নাতির গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির ব্যর্থ সন্ধান চলতে লাগল।

সামান্য আরম্ভ থেকে সর্বতোষবাবুর এই প্রচুর অভ্যুদয়ের কাহিনি সৃষ্টিধরের মরা-মনে অপূর্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করল। মাথায় করে ইট বয়ে আরম্ভ করে সর্বতোষবাবু অনেক ইটের বাড়ির মালিক হয়েছেন, এ যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবে সেই বা তা না পারবে কেন? সেও যদি তার সব অভিমান বিসর্জন করে, অমনি বা ওর চেয়েও ছোট কাজ নিয়ে আরম্ভ করে তবে কে জানে যে একদিন সেও সর্বতোষবাবুর মতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে না।

সর্বতোষবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পার্কে বেঞ্চে বসে সৃষ্টিধর এই মনোজ্ঞ কল্পনা নিয়ে ভাঙা-গড়া করছিল। একটা লোক এসে পাশে বসল তা সে বিশেষ খেয়াল করল না। লোকটা কখন যে উঠে চলে গেল তাও সে টের পেলে না। সে একমনে তার ভবিষ্যতের রঙিন-স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল।

শেষে সে যখন উঠতে যাবে তখন তার হাতে ঠেকল একখানা মোটা লম্বা-চওড়া খাতা। বেশ যত্ন করে বাঁধানো সে খাতাখানা—তাতে সোনার জলে নাম লেখা আছে S. B.

পাশে যে লোকটি বসেছিল নিশ্চয় খাতাখানা সেই ফেলে গেছে—কিন্তু কোথায় সে? একবার চারদিকে নিরর্থকভাবে চেয়ে দেখে সৃষ্টিধর খাতাখানা খুলে দেখল। মালিকের পুরোনাম বা কোনও ঠিকানা তাতে নেই! কিন্তু খাতার প্রথম পাতা খুলতেই তা থেকে এক টুকরো ছোট কাগজ পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সৃষ্টিধর দেখলে তাতে লেখা আছে ঃ

"বইখানা যত্ন করে রেখে দেবেন। দয়া করে এর কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। আমার জীবন-মরণ এর উপর নির্ভর করছে।"

চমকে উঠল সৃষ্টিধর—এ কি হেঁয়ালি?

যা হোক, অনেক ভেবে-চিন্তে তখন বইখানা লুকিয়ে রাখাই স্থির করে সেখানা আলোয়ান দিয়ে ঢেকে হাতে করে সৃষ্টিধর গেল তার মেসে।

নিজের ঘরের দোর বন্ধ করে সে কৌতূহলী হয়ে বইখানা খুলে দেখলে।

খুব পুরোনো সে বই—তার পাতায় পাতায় রাজ্যের আঁক কষা আছে। আর লেখা যা আছে তা সাটে। তার একটারও অর্থবোধ হয় না। মাঝে মাঝে দু-একটা নকশা আছে।

বইখানা উল্টেপাল্টে দেখে সৃষ্টিধর কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না কিসের এ বই, আর এমন কতকগুলো আঁকের খাতার উপর কোনও মানুষের জীবন-মরণ কি করে নির্ভর করছে!

সে স্থির করলে ওটা স্রেফ ধাপ্পা, না হয় কোনও পাগলের খেয়াল। যাইহোক, তবু সে খাতাখানা যত্ন করে তার তোরঙ্গের ভিতর লুকিয়ে রেখে দিলে।

তিন

ডিটেকটিভ পুলিশের আফিসে গোবিন্দবাবু ও ইনস্পেক্টার নির্মল ঘোষ বসে সেদিনকার ফাইলগুলো দেখছিলেন। গোবিন্দবাবু উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অনেকদিন থেকে ডিটেকটিভ-ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে আসছেন। নির্মল ঘোষ মুচিপাড়া থানায় থাকতে একটা সঙ্গীন খুনি-মোকদ্দমায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে কিছুদিন হল প্রমোশন পেয়ে ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টার হয়ে গোবিন্দবাবুর অধীনে কাজ করছে।

এক একটা কেসের ফাইল দেখে গোবিন্দবাবু তার সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে ফাইলটা নির্মলকে দেখতে দিচ্ছিলেন, আর নির্মল তা নিবিষ্টভাবে পড়ছিল।

সবগুলি ফাইল দেখা হয়ে গেলে গোবিন্দবাবু বললেন, "লক্ষ্মীকান্ত মিত্রের মামলার কতদূর কি হল?"

নির্মল বললে, "যতদূর বুঝতে পারছি তাঁর কোনও কর্মচারীর সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনও সংস্রব নেই।"

গোবিন্দবাবু একটা মোটা চুরুটে আগুন ধরিয়ে বললেন, "কেন বল দিকিনি?"

নির্মল একে একে তার সব বক্তব্য বলে গেল। গোবিন্দবাবু তার কথায় মাঝে মাঝে খুব সংক্ষিপ্ত টিপ্পনি করতে লাগলেন আর খুব মনোযোগ দিয়ে সব কথা

শুনলেন। শেষে বললেন, "তুমি যা বলছ তার ভিতর পদার্থ আছে। আচ্ছা, তোমার লাইনেই তুমি অনুসন্ধান করে যাও।"

"খুব জরুরি" ছাপ দেওয়া দুটো ফাইল নিয়ে একটা উর্দিপরা চাপরাশি এল। পিয়ন-বই সই করে নিয়ে নির্মল ফাইল-দুটো খুলে দেখলে। অনেকক্ষণ নিবিষ্টমনে পড়ে সে একটা ফাইল গোবিন্দবাবুকে দিয়ে বললে, "এই দেখুন এ কেসটা।"

গোবিন্দবাবু পড়লেন। পুলিশ থেকে ডিটেকটিভ-ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছে "সেফ-ডিপজিট" ব্যাঙ্কের একটা অদ্ভুত চুরির কথা।

গোবিন্দবাবুর পড়া হবার পর নির্মল বললে, "আমি এখুনি একবার এই ব্যাঙ্কটা ভালো করে দেখে আসতে চাই।"

গোবিন্দবাবু বললেন, "না, তুমি লক্ষ্মীকান্তবাবুর কেসের অনুসন্ধান করতে বের হও, আমি একবার ব্যাঙ্কে যাই।"

নির্মল বললে, "কিন্তু দেখুন, লক্ষ্মীকান্তবাবুর কেসের সঙ্গে এ-চুরির বোধহয় নিকট সম্পর্ক আছে।"

গোবিন্দবাবু হেসে বললেন, "অদ্ভুত কথা বলবার তোমার একটা বাতিক আছে নির্মল। তবু কি কারণে মনে করছ যে এ-দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে তাই শুনি।"

"এখন পর্যন্ত খুব বিশেষ কারণ আছে বলতে পারি না। কিন্তু এক বিষয়ে এ-দুটোর ভিতর সম্পূর্ণ মিল দেখতে পাচ্ছি। দু-জায়গায়ই দেখতে পাচ্ছি যে একটা তালা ভাঙা বা খোলা নেই, সেফগুলো যেমন তেমনি আছে, অথচ তার ভিতর মাল নেই। দু-জায়গায়ই দেখছি ফটকের সামনে পাহারা সমান রয়েছে, পাহারাওয়ালারা কেউ কিছু দেখতে পেলে না, অথচ ভিতরে চোর গিয়ে মাল নিয়ে পালিয়ে গেল। তাই মনে হচ্ছে যে এ-দুটোর ভিতর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।"

"কোনও কিছু অসম্ভব নয় বলেই যে সেটা সম্ভব হবে এমন কোনও কথা নেই। তবু—"

"কিন্তু আমি একবার ব্যাঙ্কটা দেখে এলে হয়তো এর চেয়ে জোরাল যুক্তি ও হেতু পেতেও পারি। তাই বলছিলাম।"

গোবিন্দবাবু বললেন, "আচ্ছা, চল, দুজনেই যাই।"

এমন সময় সর্বতোষবাবুর নাতি মহীতোষ এসে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। মহীতোষের সঙ্গে গোবিন্দবাবুর যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আগে থেকেই ছিল।

মহীতোষ এলে গোবিন্দবাবু বললেন, "কি খবর মহী?"

"আর দাদা, বিষম বিপদে পড়েছি, ঠাকুর্দা তো পাগল হবার মতো হয়েছেন।"

ব্যস্ত হয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, "সে কি? কি হয়েছে, Senile decay?"

"তা হলে তো ছিল ভালো। তাঁর জ্ঞান আছে টনটনে, তাই এত অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"তাঁর একখানা খাতা চুরি হয়ে গেছে।"

"খাতা চুরি? তাতে কি ছিল?"

"ছিল মাথা আর মুণ্ডু। তিনি প্রথম থেকে শুরু করে যত বাড়ি তৈরি করেছেন তার কতকগুলো প্ল্যান আর অনেক মাপ-জোপের হিসাব তাতে লেখা আছে। কোনও দরকারই নেই সে খাতার। কিন্তু তার চেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর কিছুই নেই। লোকজনের কাছে তাঁর সেকালের কীর্তির কথা গল্প করতে করতে সদাসর্বদাই সেই খাতা বের করে দেখান তাঁর সেইসব কীর্তি। সেটা হারিয়ে তাই তিনি বড় মনমরা হয়ে গেছেন। তাই তোমার কাছে এলাম দাদা, যদি খাতাখানা উদ্ধার করতে পার।"

গোবিন্দবাবু হেসে বললেন, "তোমার কাছে ও খাতার দাম যতই হোক ভাই, আমাদের কাছে ওটা তুচ্ছ ব্যাপার। ওতে হাত দিয়ে যদি আমরা সময় খরচ করি, উপরওয়ালার কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তুমি বরং থানায় গিয়ে একটা এজাহার করগে। তারা হয়তো এর কিনারা করতে পারবে। এ এমন শক্ত কিছু হওয়া সম্ভব নয়।"

"কিন্তু টাকা যা দরকার হয় আমরা দিতে রাজি আছি। দশ হাজার হোক বিশ হাজার হোক দেব, তাতেও কি তোমাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না?"

"সেকথা থানায় জানিয়ে দিও, বরং পুলিশ কমিশনারকে গিয়ে বল। তাতে যদি তিনি আমাদের এ কেসের ভার দেন, তবে অবিশ্যি করব আমরা যা করতে হয়।"

বলে তিনি উঠে চাদর কাঁধে ফেললেন। ডিটেকটিভ-পুলিশের কর্মচারীরা উর্দি পরেন না, সাধারণ বেশেই চলাফেরা করেন, তাই ধুতি-চাদর পরেই গোবিন্দবাবু বের হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মহীতোষ বাড়ি গেল।

থানা থেকে ইনস্পেক্টার যতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দবাবু ও নির্মল গেলেন সেই সেফ-ডিপজিট ব্যাঙ্কে।

অনেকক্ষণ তন্ন তন্ন করে জায়গাটা দেখলেন তাঁরা। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারী ও চাকর-বাকরদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন।

যে ঘর থেকে চুরি হয়েছে সেই ঘরে গিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধান করলেন। ঘরটা মাটির তলায়। তিনটে বড় বড় লোহার ফটক পেরিয়ে তাঁরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন তার সবদিকই বন্ধ, বিন্দুমাত্র ছিদ্র নেই কোনও দিকে।

একটা যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে হাওয়ার চলাচল হয়। এই ঘরের অনেকগুলো প্রকাণ্ড সেফের একটার ভিতর ছিল শুধু সোনার বার আর একটায় ছিল হীরা-জহরতের জিনিস। সেই দুটি সেফের সব জিনিস খোয়া গেছে।

সেফ-দুটোর আষ্টেপৃষ্ঠে নির্মল magnifying glass দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর মই এনে ছাদের সঙ্গে দেয়ালের যোগগুলো দেখা হল। সেখানে কোনও ফাঁক নেই। আবার ফিরে এসে সেফ-দুটো খুলে ফেলে তার ভিতরটা আদ্যোপান্ত দেখা হল।

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এ চুরি ধরা পড়েছে পরশুদিন। তার ক-দিন আগে এ সেফ খোলা হয়েছিল?"

খাজাঞ্চি বললে, "দুদিন আগে।"

"কে খুলেছিল?"

"আমি নিজে, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সঙ্গে ছিলেন।"

"তখন জিনিস সব ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন সব verify করবার জন্যেই আমরা এসেছিলাম, সব ঠিক পেয়েছিলাম।"

"তারপর আপনারা তালা বন্ধ করে চাবি নিয়ে গিয়েছিলেন?"

ম্যানেজার ও খাজাঞ্চি দুজনেই বললেন, "হ্যাঁ।"

"একসঙ্গেই গিয়েছিলেন আপনারা?"

"হ্যাঁ। দুজনে বেরিয়ে তালা-টালা বন্ধ করে তারপর একগোছা চাবি ম্যানেজার ও একগোছা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম।"

এই পরীক্ষার মাঝখানে নির্মল গোবিন্দবাবুকে কানে-কানে বললে, "দেয়ালটা ভেঙে ওধারে দেখতে হবে।"

গোবিন্দবাবু তার সঙ্গে নিরালায় গিয়ে বললেন, "কেন বল তো? তুমি কি মনে করছ?"

"দেখুন, ঐ তিন মণ সোনা বয়ে নিয়ে কোনও লোক সদর-গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলে ধরা না পড়ে যায় না। সেদিক দিয়ে চোর যায়নি। কাজেই দেয়াল ভেদ করা ছাড়া আর কোনও পথেই মাল বের হতে পারে না। তা ছাড়া, এ মাল তো চাবি খুলে বের করা হয়নি!"

"তবে কেমন করে?"

নির্মল এতক্ষণ সেফের ভিতরের রং পরীক্ষা করে খানিকটা ঘষে ফেলেছিল। সেই জায়গাটা গোবিন্দবাবুকে দেখিয়ে বললে, "দেখছেন না, welding-এর দাগ রয়েছে?"

পরীক্ষা করে গোবিন্দবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর রাজমিস্ত্রি ডাকা হল।

নির্মল জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের কাছে এ বাড়ির প্ল্যান আছে?"

ম্যানেজার বললেন, "না, শুনেছি, প্ল্যান সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

"কেন?"

"শুনেছি, এ বাড়ির নিরাপত্তার জন্য অনেকরকম জটিল উপায় করা হয়েছে, সেগুলো যাতে কেউ না জানে সেইজন্য।"

"কিন্তু কর্পোরেশনে প্ল্যান আছে নিশ্চয়ই।"

"আজ্ঞে না। আমাদের একটা দরকারে একবার কর্পোরেশনে অনুসন্ধান করেছিলাম, সেখানে জানতে পারলাম যে, প্ল্যান অনেক পুরোনো কাগজের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

"এ বাড়ির কন্ট্রাক্টর ছিল কে?"

ম্যানেজার বললেন, "সে আমি জানি না, তবে হয়তো পুরনো হিসাবের বই থেকে তার নাম বের হতে পারে।"

একজন কর্মচারীকে সেই পুরোনো হিসাবের বই আনতে বলা হল।

তারপর নির্মল ও গোবিন্দবাবু কিছুক্ষণ পরামর্শ করলেন। তারপর নির্মল ও ম্যানেজার ছাড়া আর সবাই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে দরজাগুলি সব বন্ধ করে দিলেন। নির্মল একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সিন্দুকগুলোতে ঠং ঠং করে জোরে ঘা লাগাতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে খুব চেঁচাতে লাগল। ম্যানেজার হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভাবলে, লোকটা পাগল হল নাকি? মিনিট-পাঁচেক পরে দরজা খুলে সবাই প্রবেশ করলে।

গোবিন্দবাবু বললেন, "না, বাইরে থেকে কোনও শব্দ শোনা যায়নি।"

তারপর রাজমিস্ত্রি ডেকে কতক-কতক দেয়াল ভেঙে দেখা গেল, দেয়ালের বাইরে আর-একটা পুরু দেয়াল আছে। দুটোর ভিতর প্রায় চার ফুট ব্যবধান। এই দুই প্রাচীরের ব্যবধানের উপর ইট-সুরকি-ভাঙা দেখা গেল, আর একটা জায়গায় দেখা গেল, দেয়াল খানিকটা ভেঙে তারপর সে-ফাঁকটা যেন আলগা ইট বসিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে।

একটু দেখেই তাদের বেরিয়ে আসতে হল, কেননা, ভিতরের হাওয়ায় তাদের দম বন্ধ হবার মতো হয়েছিল।

তখনকার মতো ঘরটায় তালা বন্ধ করে সিল করে বাইরে এসে গোবিন্দবাবু বললেন, "এর ভিতর ভালো করে পরীক্ষা করতে হলে গ্যাস-মাস্ক দরকার।"

নির্মল উল্লসিতভাবে বললে, "ঠিক বলেছেন স্যর, এই সমস্যাটাই এতক্ষণ সমাধান করে উঠতে পারিনি। এখন বোধ হচ্ছে সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি এবং মনে হচ্ছে যে, আমি যে অনুমান করেছিলাম তাই ঠিক। লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ির চুরি আর এখানকার চুরি একই লোকের কাজ।"

আফিসে ফিরে এসে নির্মল তার সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে বললে।

লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ির স্ট্রং-রুম ও এই ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুম প্রায় একই ধাঁচের। দুই-জায়গায়ই চুরি হয়ে গেছে বেমালুমভাবে। চোর ধীরে-সুস্থে কাজ করে গেছে, তার কোনও চিহ্ন পিছনে রেখে যায়নি, আর চুরি ধরা পড়বার আগেই তার মাল সরাবার যথেষ্ট সময় যাতে পায় সে ব্যবস্থা করেছে।

স্ট্রং-রুমের বাইরে দুই দেয়ালের যে ফাঁক, তার ভিতরে কোনওরকমে প্রবেশ করে চোর সেফের পিছনের দেয়ালটা ভেঙেছে। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে সেফের পৃষ্ঠভাগ কেটে ভিতরে গিয়ে সিন্দুকের মাল সরিয়েছে, আর সেই কাটাটা পরে ওয়েল্ডিং করে জুড়ে দিয়েছে বেমালুমভাবে।

তারপর সে-চোর ওই দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী গলি দিয়ে বের হয়ে মাল বের করে নিয়ে গেছে। গ্যাস-মাস্ক না পরে এ গলির শেষ পর্যন্ত না যেতে পারায় নির্মল ধরতে পারলে না যে, বাইরের কোন দেয়াল ভেদ করে চোর ওই ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করতে পেরেছিল। সে বাড়ির চারিদিককার বাইরের দেয়াল পরীক্ষা করে দেয়াল কোনওখানে ভাঙার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

নির্মল বললে, "দুটো সমস্যা আমার এ থিওরির বিপক্ষে ছিল। প্রথম কথা, ঘরের ভিতর সারারাত বসে এত কাণ্ড হলে তার শব্দ বাইরে শোনা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলাম, ঘরটি এমনভাবে তৈরি যে, এর ভিতরকার কোনও শব্দই বাইরে শোনা যায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, ঐ বন্ধ-গলির ভিতর এতক্ষণ কাজ করতে গেলে চোরের দম বন্ধ হয়ে যাবার কথা। তার সমাধান আপনি করে দিলেন। চোরটা গ্যাস-মাস্ক পরে এসেছিল।"

গোবিন্দবাবু তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "এসব না হয় বোঝা গেল। কিন্তু চোরটা কে? তাকে ধরবার উপায় কি?"

নির্মল সাহসের সঙ্গে বললে, "সে উপায় হবেই। এমন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-চোর জগতে খুব বেশি নেই। তাছাড়া, তিন মণ সোনা সে বেচা-কেনা করেছে নিশ্চয়ই। আর, বাড়ির প্ল্যানের নকলটা এদের কাছে না থাকলেও সেই চোরের কাছে নিশ্চয় আছে।"

চার

নির্মল বললে, "একবার সর্বতোষবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার।"

ব্যাঙ্ক থেকে অনুসন্ধান করে ব্যাঙ্কের প্রথম বৎসরের হিসাবের বই পাঠিয়ে দিয়েছিল। নির্মল বসে বসে সেই বই দেখছিল।

গোবিন্দবাবু বললেন, "কেন?"

"একবার তাঁর হারানো খাতার সন্ধান করতে হবে।"

গোবিন্দবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, "মানে?"

নির্মল খাতাখানার একটা জায়গা গোবিন্দবাবুকে দেখালে।

গোবিন্দবাবু বললেন, "ও। সর্বতোষের নামে বিল্ডিং-অ্যাকাউন্টে কয়েকটা মোটা মোটা খরচ দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম। তা হলে সর্বতোষ বাড়ির কন্ট্রাক্টর ছিলেন ভাবছ?"

"সম্ভব।" বলে নির্মল বেরিয়ে পড়ল।

সর্বতোষের বাড়ি গিয়ে নির্মল বলল, "গোবিন্দবাবু পাঠিয়ে দিলেন আমায় আপনার হারানো খাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।"

সর্বতোষ বিষণ্ণ হয়ে বসে ছিলেন, এ কথায় এতটা উল্লসিত হয়ে উঠলেন, যেন তাঁর সে খাতা পাওয়াই হয়ে গেছে।

উগ্র-আনন্দের সঙ্গে তিনি বললেন, "তাহলে আপনার নিয়েছেন কেসটা? তবে আর আমার চিন্তা নেই। গোবিন্দবাবু যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন এর একটা কিনারা হবেই।"

তারপর নির্মল তাঁকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে, খাতার মধ্যে কি কি জিনিস আছে।

বৃদ্ধ একটি একটি করে সব জিনিসের পরিচয় দিলেন। তার ভিতর লক্ষ্মীকান্তবাবুর ও ব্যাঙ্কের বাড়ির নকশাও ছিল শুনে নির্মল খুশি হয়ে গেল।

"ক'দিন হল চুরি গেছে খাতাখানা?"

"ক'দিন আর হবে? হাঁ হে মহীতোষ!—এই তো সেদিন ভূপেনবাবুদের দেখালাম।"

মহীতোষ বললে, "সে প্রায় এক মাস আগে!"

"এক মাস, তা হবে", বললেন সর্বতোষ।

তারপর নির্মল একটি একটি করে বাড়ির সব ক'টি লোককে কষে জেরা করলে। বাড়িতে এক মাসের ভিতর কে কে এসেছে তার লম্বা ফিরিস্তি নিলে, যতদূর তাদের মনে পড়ল তার বিস্তৃত পরিচয় লিখে নিলে।

তারপর সে সেই সব নোট নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগল।

গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে গোবিন্দবাবু বললেন, "এ ফিরিস্তিতে তো হবে না! তুমি সন্ধান নিয়েছ শুধু এক মাসের মধ্যে যে ক'জন লোক সর্বতোষের কাছে এসেছিল তাদের। কিন্তু যে খাতা চুরি করেছে সে যে লোক জানিয়ে বাড়িতে এসেছিল এমন নাও হতে পারে! এক মাসের অনেক আগে হয়তো হাজার হাজার লোকের কাছে সর্বতোষ গল্প করেছেন, তাদের খাতা দেখিয়েছেন। তাদের সবার নাম নিতে হবে। তাহলে দাঁড়াবে গিয়ে খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ বের করবার মতো।"

নির্মল ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক।

পরের দিন আবার সে সর্বতোষবাবুর বাড়ি গেল। আরও অনেকগুলো নাম নিলে।

তিন দিন দিন-রাত নির্মল ভাবলে। আর বার-বার সে গিয়ে ব্যাঙ্কে, লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ি ও সর্বতোষের বাড়িতে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগল। গ্যাস-মাস্ক পরে সে সেই অন্ধকার গলির পরিক্রমা করে এল। এক জায়গায় সে দেখতে পেলে নূতন গাঁথনি হয়েছে। অথচ বাইরের দেয়ালে ঠিক সেই জায়গায় নূতন পলস্তার কোনও চিহ্নই নেই।

একটা খেয়াল হল তার একদিন। আই. বি. আফিসে গিয়ে সে কতকগুলো নামের একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে বললে, "দেখুন তো এর ভিতর আপনাদের নজরবন্দী কেউ আছে কি...স্বদেশি ডাকাত হবার মতো কেউ?"

আই. বি. ইনস্পেক্টার তাঁর গোপন-নথিপত্র দেখে তিনটে নামে দাগ দিয়ে বললেন, "এদের নাম পেয়েছি আমরা, কিন্তু ধরবার-ছোঁবার মতো কিছুই পাইনি।"

"এদের বাড়ি সার্চ করেছেন কোনোদিন?"

"করিনি, তবে করব শিগগির দুটো বাড়ি।"

নির্মল বলল, "তখন আমাকে সঙ্গে নেবেন। আমাকেও সার্চ করতে হবে।"

"আপনার দরকার থাকে তো আপনিই ওয়ারেন্ট নিয়ে সার্চ করুন না!"

"না, এই মামলা নিয়ে খানাতল্লাশি মোটে হচ্ছে এ-কথাটা এখনও জানাজানি করতে চাই না। যদি ভেস্তে যায় তবে হয়তো আসল আসামি সাবধান হয়ে যাবে।"

আই. বি. ইনস্পেক্টার হেসে বললেন, "আচ্ছা, তবে আজ রাত্রে তয়ের থাকবেন।"

পাঁচ

রাত তখন বারোটা।

দরজায় বিপুল ধাক্কা শুনে সৃষ্টিধরের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে দোর খুলতেই সে দেখতে পেল—পুলিশ!

দেখেই সে আঁৎকে উঠল।

থানার দারোগা ওয়ারেন্ট বের করে তাকে দেখালেন, বললেন, তাঁরা খানাতল্লাশি করতে এসেছেন।

যথারীতি সাক্ষীসংগ্রহ এবং অনুসন্ধানকারী কর্মচারীদের কাপড়-চোপড় পরীক্ষার পর, থানার দারোগা তাঁর সঙ্গী আই. বি. কর্মচারীদের বললেন খানাতল্লাশি আরম্ভ করতে। দুজন আই. বি. কর্মচারী ও নির্মল সমস্ত ঘরটা ওলট-পালট করে দেখতে লাগল।

মুখ চুন করে সৃষ্টিধর বিমূঢ়ের মতো তাদের কার্য-কলাপ দেখতে লাগল।

বেশি কিছু মালপত্র ছিল না সৃষ্টিধরের ঘরে। তার কাগজপত্র আর বইগুলোই সবাই উল্টে-পাল্টে বিশেষ করে দেখলে।

সে-সব দেখা শেষ হলে তার খাটের তলা থেকে একরাশ পুরনো ধূলি-ধূসর খবরের কাগজ, জর্নাল প্রভৃতি টেনে বের করল আর বের করল ছোট একটা কাঠের বাক্স আর সৃষ্টিধরের তোরঙ্গ।

কাগজগুলো নিঃশেষে পরীক্ষা করে কাঠের বাক্স খুলে দেখা গেল সেটা একটা Instrument Set. ছুতোরের কাজে যে-সব যন্ত্রপাতির দরকার, তার প্রায় সবই তার ভিতরে আছে।

তা ছাড়া, একটা বড় গ্যাসের ব্লো-পাইপ, খানিকটা রাঙতা, আরও দু-চারটে লোহার কাজের যন্ত্রপাতি।

নির্মল খুব নিবিষ্টভাবে সেগুলো পরীক্ষা করে বললে, "এসব দিয়ে আপনি কি করেন?"

"মাঝে মাঝে টুকি-টাকি জিনিস মেরামত করি, এছাড়া এখন আর ও দিয়ে কিছু হয় না।"

"আচ্ছা, এ ব্লো-পাইপ দিয়ে welding করা যায়?"

"করা যেতে পারে। এ দিয়ে একটু adapt করলে হয়তো Oxy-acetyline welding পর্যন্ত করা যায়। তবে চেষ্টা করে দেখিনি।"

"আপনি Oxy-acetyline welding করেছেন কখনও?"

"কলেজে করেছি।"

"এত শিখেছেন আপনি, তা এখন করছেন কি?"

"প্রাইভেট-টিউশন—আর কি করব?"

"কেন? কোনও workshop-এ কাজ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সৃষ্টিধর বলল, "চেষ্টা করেছি অনেক। পাইনি।"

তারপর তোরঙ্গ খোলা হল। তার ভিতর ছিল কাপড়-চোপড়। খাকি হাফ-প্যান্ট ও শার্ট, আর একটা নীল রঙের overall দেখা গেল। তারপর সবার তলায় পাওয়া গেল—একখানা খুব ভালো বাঁধানো খাতা।

খপ্ করে খাতাখানা তুলে নিয়ে নির্মল তার আষ্টেপৃষ্ঠে পরীক্ষা করলে। উল্লাসে তার অন্তর নেচে উঠল। S. B. নাম ছাপানো সর্বতোষবাবুর খাতা এখানা। খাতার ভাঁজে-ভাঁজে আছে ভাঁজ-করা কাপড়ে মাউন্ট-করা কয়েকখানা প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্ট।

হেসে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "এ-খাতা আপনার কি কাজে লাগে জানতে পারি কি?"

"কোনও কাজে লাগে না।"

"তবে এত যত্ন করে এটা লুকিয়ে রেখেছেন কি জন্যে?"

সৃষ্টিধর নির্মলের কাছে অকপটে প্রকাশ করলে—কেমন করে সে এ-খাতাখানা পেয়েছিল। বললে, "খাতার ভিতর একখানা স্লিপ লেখা ছিল, তাতে কেবল লিখেছিল—খাতাখানা যত্ন করে রাখতে, কেননা, এর উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে নির্মল বলল, "কই, সে স্লিপখানা দেখি?"

শুকনো মুখে সৃষ্টিধর বললে, "স্লিপখানা রাখিনি, ফেলে দিয়েছি।"

হো-হো করে হেসে নির্মল বললে, "Too thin! খাতাখানা চুরি গেছে বলে সর্বতোষবাবু ডায়ারি করেছেন। আপনি তাঁর নাতির প্রাইভেট-টিউটার—অথচ কোনও এক অজানা লোক আপনাকে এটা দিয়ে গেছে এইটে দাঁড় করাতে চান। শুধু কথায় তার প্রমাণ হবে না।"

সজল-নয়নে সৃষ্টিধর বললে, "মুখের কথা ছাড়া কোনো প্রমাণই আমার নেই।"

অনুসন্ধান শেষ হলে আই. বি.-র ইনস্পেক্টার বললেন, "আমার seize করবার কোনও জিনিস নেই এখানে।"

নির্মল সেই খাতাখানা ও ইনস্ট্রুমেন্ট-সেট সুদ্ধ সৃষ্টিধরকে ধরে নিয়ে গেল থানায়।

সৃষ্টিধর মাথায় হাত দিয়ে হাজত-ঘরে বসে ভাবতে লাগল তার দুরদৃষ্টের কথা।

ছয়

পরের দিন নির্মল সৃষ্টিধরকে নিয়ে প্রথমে গেল সর্বতোষবাবুর বাড়ি।

খাতাখানা পেয়ে সর্বতোষ শিশুর মতো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। খপ্ করে নির্মলের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "এই যে

পেয়েছেন! কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না।—এর জন্য আমি আপনাকে কি পুরস্কার দিল আপনি খুশি হবেন বলুন।"

বলে খাতাখানা আলমারিতে তুলে রাখতে গেলেন।

হেসে নির্মল বললে, "ও-খাতা তো এখন আপনি পাবেন না সর্বতোষবাবু, কেস হয়ে গেলে তবে পাবেন।"

"কেস? কিসের কেস?"

"চোরের বিচার হবে তো?"

"চোর ধরেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, এই যে ইনি।"

চমকে উঠলেন সর্বতোষ। খানিকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। তারপর বললেন, "অসম্ভব! সৃষ্টিধর এ-খাতা চুরি করতে পারে না। ওর মতো ভালো ছেলে নেই। তাছাড়া, এ-খাতা দিয়ে ও করবেই বা কী?"

নির্মল বললে, "সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আর উনিও এ দিয়ে ওঁর কি কি প্রয়োজন তা বলতে পারেননি। কিন্তু খাতাখানা ওঁর তোরঙ্গের ভিতরেই পাওয়া গেছে, আর উনি ওটা পাবার বিষয়ে যে গল্প বলেছেন সেটা একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সর্বতোষ বললেন, "না না, দেখুন, ও যদি নিয়েও থাকে, কোনও কুমতলবে নেয়নি। হঠাৎ কি ভেবে এমনি একটা কৌতূহলপূর্ণ জিনিস বলে নিয়েছিল। কি বল সৃষ্টিধর? চুরি করবার মতলব ছিল তোমার? কখনও নয়। সৃষ্টিধর সে ছেলেই নয়। যা হোক, দেখুন, আমার খাতা আমি পেয়েছি, এখন আমার অনুরোধ—আপনারা ওকে ছেড়ে দিন।"

বৃদ্ধের সহৃদয়-ব্যাকুলতায় সৃষ্টিধর এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে, তার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

নির্মল বললে, "দেখুন, হাকিম না ছাড়লে আমাদের ছাড়বার উপায় নেই। আপনি যেখানে এজাহার দিয়েছেন সেখানে আমাকে চালান করতেই হবে। আপনি বরং হাকিমের কাছে গিয়ে ওঁকে ছেড়ে দিতে বলবেন।"

খাতাখানা পেয়ে একমুহূর্ত আগে সর্বতোষের যে উল্লাস হয়েছিল তা একেবারে মুছে গিয়ে তিনি বিষম মুষড়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি সৃষ্টিধরের দুখানা হাত চেপে ধরে বললেন, "আহা বেচারা, তোমার এত বড় অনিষ্ট আমি করলাম! আমায় মাপ কর সৃষ্টিধর! আমার কেন এ-দুর্মতি হয়েছিল যে, পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিলাম! ছাই খাতা, তার জন্য ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার মতো ছেলের এ দুর্দশা করলাম আমি! আমায় মাপ কর বাবা!"

তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখ বাবা, চেষ্টা করে দেখ তবু যদি ছাড়তে পার ওকে। তার জন্য আমাকে যা করতে বল তাই আমি করব, টাকা খরচ করতে হয় করব। আর, নাই ছাড় যদি, দেখ বাবা, বেচারাকে কোনও কষ্ট দিও না।"

ঝরঝর করে বৃদ্ধের দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর আবার তিনি সৃষ্টিধরকে বললেন, "আহা, এতদিন ধরে ভাবছি, চেষ্টা করে তোমার একটা ভালো কাজ করে দেব। আজ যাব কাল যাব করে তার চেষ্টায় গেলামই না, আর করলাম কিনা এই!—যা হোক, যাও তুমি, ওঁরা যদি নাই ছাড়েন, দেখব তোমায় ছাড়াতে পারি কি না!"

মহীতোষকে ডেকে তিনি বললেন, "মহী, তুই এক্ষুনি যা, যোগেনবাবু উকিলের কাছে। বলবি যেমন করেই হোক, যত টাকাই লাগুক, সৃষ্টিধরকে খালাস করতে হবে।—এখন যাতে জামিনে খালাস হয় তার চেষ্টা করবি।"

নির্মল বললে, "দেখুন, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। এঁকে আমরা কোনও কষ্ট দেব না, আর এঁর উপর কোনও অত্যাচার-অবিচার হবে না, সে-বিষয়ে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এখন আপনি শান্ত হয়ে আমার কয়েকটা কথার জবাব দিন দয়া করে। একবার দেখুন তো, বইখানা যেমন তেমনি আছে, না কিছু অদল-বদল হয়েছে?"

সর্বতোষ বললেন, "না, এই তো সব যেমন ছিল, তেমনিই আছে দেখছি।"

"আচ্ছা, এর ভিতর লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ির নকশা আছে?"

"আছে বইকি!" বলে সর্বতোষ সেটা বের করতে গিয়ে, উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, "কই, দেখছি না তো!"

নির্মল আর দু-একটা বাড়ির নাম করলে যার কথা সর্বতোষ আগে বলেছিলেন। সেগুলির নকশা পাওয়া গেল। তারপর বলল, "সেফ-ডিপজিট ব্যাঙ্ক?"

সে নকশাখানাও পাওয়া গেল না।

সৃষ্টিধরকে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "এ দুখানা নকশা গেল কোথায়?"

সৃষ্টিধর বলল, "আমি কিছু জানি না। আমি খাতাখানা যেমনি পেয়েছি তেমনি আছে—শুধু সেই স্লিপখানা নেই।"

নির্মল অনেকক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে সৃষ্টিধরের দিকে চেয়ে রইল।

সর্বতোষ এতক্ষণ খাতার পাতাগুলো ক্রমাগত ওল্টাচ্ছিলেন, এখন তিনি বললেন, "দেখুন, এর ভিতর কতক লেখা দেখছি যা আগে ছিল না।" বলে তিনি শেষের একটা সাদা পাতার কয়েকটা হাত-নকশা ও অঙ্ক দেখালেন, তার মাঝে দু-চারটে কথা লেখা আছে।

নির্মল নিবিষ্টভাবে এই লেখাগুলোর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এ লেখা কতক পেনসিলে, কতক কালিতে, কিন্তু সব লেখাই বেশ তাজা, খাতার অন্য লেখাগুলোর মতো পুরোনো নয়। কথাটা নোট করে নিয়ে নির্মল বললে, "সৃষ্টিধরবাবু কাকে পড়ান? তাকে ডাকুন তো একবার!"

সর্বতোষের দুটি নাতির তলব হল।

নির্মল তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাদের পড়বার ঘরে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে কয়েকখানা খাতা নিয়ে বেরিয়ে এল।

সাত

সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে নির্মল বললে, "আমায় আর-দুটো জায়গায় যেতে হবে, আপনি একটু কষ্ট করে আসবেন কি?"

শুষ্ক হাসি হেসে সৃষ্টিধর বললে, "আমি আপনার আসামি, যেখানে নিয়ে যাবেন যাব। ওকথা বলে ঠাট্টা করে লাভ কি?"

নির্মল বললে, "মোটেই ঠাট্টা করিনি। আপনাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে আমি ইচ্ছা করি না। বিশেষ সর্বতোষবাবু যখন এমন করে বলেছেন তখন আমি বিশেষ করেই চেষ্টা করব যাতে আপনি কোনও কষ্ট না পান, আর যদি সম্ভব হয় তো মুক্তি পান। পুলিশের লোক বলেই আমাকে অতটা অবিশ্বাস করবেন না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সৃষ্টিধর বললে, "সে আপনার দয়া।"

কিছুদূর গিয়ে নির্মল বললে, "ওঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেল, সর্বতোষবাবুকে জিগ্যেস করে আসিনি। আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, লক্ষ্মীকান্ত মিত্রের বাড়িটা কোথায়?"

সৃষ্টিধর একটু হেসে বললে, "এতদিন অলক্ষ্মীর বিস্তর খবর রেখেছি, লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীকান্তের খবর নেবার সুযোগ হয়নি।"

"কি বলেন, লক্ষ্মীকান্ত মিত্রকে চেনেন না?"

"নাম শুনেছি তাঁর, চোখে দেখিনি।"

"তিনি তো আপনাদের মেসের কাছাকাছিই কোথায় থাকেন।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার মেসের পাশের বাড়ি যাঁর তাঁরই নাম জানি না, অন্যের জানব কোত্থেকে?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে নির্মল বললে, "তা হলে জানেন না আপনি তাঁর বাড়ি?"

"না।"

"তবে একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে," বলে নির্মল গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল। তারপর একটা দোকানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা কয়ে আবার এসে গাড়িতে বসল।

তারপর সে গেল লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাড়ি।

গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল বললে, "যান, ভিতরে ড্রয়িং-রুমে বসুন গে।"

সৃষ্টিধর মার্বেল-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে খোলা দরজার ভিতর ঢুকে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, তারপর একটা বেয়ারাকে দেখে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলে, "ড্রয়িং-রুম কোন দিকে?"

তখন নির্মল এসে বললে, "থাক আর ড্রয়িং-রুমে গিয়ে কাজ নেই। চলুন, আমার কাজ দেখবেন চলুন।" বলে সে সৃষ্টিধরকে বাড়ির নানা ঘর ঘুরিয়ে শেষে স্ট্রং-রুমে নিয়ে গেল। স্ট্রং-রুম খোলা হলে তার ভিতর ঢুকে সৃষ্টিধর বললে, "ইস, কী অন্ধকার!"

নির্মল বললে, "বাতির সুইচটা টিপে দিন।"

সৃষ্টিধর দরজার দু'পাশে হাতড়াতে লাগল সুইচের সন্ধানে। তখন নির্মল নিজে ঘরের অপর দেওয়ালে যেখানে সুইচবোর্ড ছিল সেখানে গিয়ে বাতি জ্বেলে দিলে।

যে-সিন্দুক থেকে গয়না চুরি হয়েছে তার কাছে দাঁড়িয়ে নির্মল বললে, "এরকম সিন্দুক দেখেছেন তো আপনি? অন্য লোকের পক্ষে খোলা একেবারে অসম্ভব। কি বলেন?"

"আমি কি বলব বলুন, আমি এমন সিন্দুক তো কোনওদিন দেখিনি!"

তারপর নির্মল সেই সিন্দুকের জটিল-কলকব্জার পরিচয় দিয়ে বললে, "অথচ এই সিন্দুকের ভিতর থেকে প্রায় লাখ টাকার জিনিস চুরি হয়ে গেছে, তালা-চাবি না খুলে, সিন্দুক না ভেঙে। আপনি তো বৈজ্ঞানিক, applied physics-এ এম. এস-সি.; আপনি বলতে পারেন কেমন করে এটা সম্ভব হতে পারে?"

অনেক দেখে-শুনে সৃষ্টিধর বললে, "কোনও কথাই আমার মনে হচ্ছে না। অবশ্য এমন যন্ত্র আছে যা দিয়ে এ ইস্পাতও কেটে নামানো যেতে পারে, কিন্তু সে রকম যন্ত্র নিয়ে তো চোরের ভিতরে আসা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সিন্দুক তো দেখছি কাটাও হয়নি।"

নির্মল বললে, "কাটা হয়েছিল বোধ হয়।" বলে সিন্দুকটা খুলে তার পিছনের ডালায় কয়েকটা দাগ দেখিয়ে বলল, "এইখানে welding করা হয়েছে মনে হয় না?"

সৃষ্টিধর পরীক্ষা করে দেখে বললে, "হ্যাঁ, হতে পারে; কিন্তু তবু এত সূক্ষ্মভাবে

কেটে ওয়েল্ডিং করা কি সম্ভব? তা ছাড়া, চোর এখানে বসে কাটলে, weld করলে, এত যন্ত্রপাতি এখানে আনলেই বা কেমন করে, আর এত শব্দ হল তাতে, অথচ কেউ জানতেও পারলে না কেমন করে?"

নির্মল তখন তাকে ভাঙা-দেয়ালের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল পাশের গলিতে। সেখানে একটা ছোট লোহার পাত্র দেখিয়ে বলল, "এটা কি?"

"এ তো অক্সিজেন ব্যারেল। তাহলে এইখানে ব্যারেল রেখে রবারের নল ভিতরে নিয়ে ওয়েল্ডিং করেছে। হয়তো বা এমনি করে ইলেকট্রিক করাত লাগিয়ে কেটেওছে। ও বাবা! এ-চোর তো সহজ নয়!"

সেখানে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারপর নির্মল সৃষ্টিধরকে নিয়ে গেল ব্যাঙ্কে। সেখানে সমস্ত জিনিস সৃষ্টিধরকে তন্ন তন্ন করে দেখালে, তার সঙ্গে অনেক আলোচনা করলে। কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইরকম ভাবে সিন্দুক কাটা ও জোড়া দেওয়া সম্ভব তার সম্বন্ধে অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত সৃষ্টিধর করলে। নির্মল খুব যত্নের সঙ্গে কথাগুলো নোট করে নিলে।

অনেক বেলায় থানায় ফিরে এসে নির্মল সৃষ্টিধরকে বললে, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, কিন্তু আপনার কথায় আমার কি যে সাহায্য হয়েছে তা বলতে পারি না। এখন চুরিটা কেমন করে হয়েছে সে-বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহই নেই। কেবল ঐ যা বললেন, সিন্দুক কাটবার মতো ভারী যন্ত্রপাতি কেমন করে ঘরের ভিতরে গেল? সেই সমস্যাটাই একমাত্র সমস্যা।"

সৃষ্টিধর খানিকটা ভেবে শেষে বললে, "হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে যে, লক্ষ্মীকান্তবাবুর সিন্দুকটা হয়তো কাটবার দরকার হয়নি। ওটা ঠিক ব্যাঙ্কের সিন্দুকের মতো নয়। ওর রঙটা আগাগোড়া চেঁচে ফেললে হয়তো দেখা যাবে যে, ওর গায়ে আগে থেকেই জোড় ছিল। যদি জোড় থেকে থাকে, তবে সে-জোড় হয়তো শুধু খুব শক্তিমান ব্লো-পাইপ দিয়েই খোলা যায়—কাটার দরকার হয় না।"

কথাটা শুনে নির্মল তখনি বের হয়ে গেল আবার। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে সে বললে, "আপনার সন্দেহ ঠিক সৃষ্টিধরবাবু। ঐ সিন্দুকটার পিঠের দিকে যে জোড় আছে সেটা দেখে মনে হয় যে, ওটা কেবল ব্লো-পাইপ দিয়েই খুলে আবার জোড়া হয়েছে।"

একটু পরে নির্মল বললে, "দেখুন সৃষ্টিধরবাবু, যে লোক এই দুটো চুরি করেছে, সে নিশ্চয় আপনার মতো পণ্ডিত-বৈজ্ঞানিক। কি বলেন?"

সৃষ্টিধর বললে, "নিশ্চয়। আমার চেয়ে অনেক বড় বৈজ্ঞানিক। আমি তার কাজটা

দেখে কতকটা অনুমান করতে পারছি যে, কি উপায়ে সে করেছে। কিন্তু ঠিক সেই উপায়টা উদ্ভাবন করবার শক্তি আমার হত না।"

"বুঝতে পারলাম না কথাটা।"

"দেখুন, আমরা বিজ্ঞানের অনেক principle জানি। তাই যে-কোনও বৈজ্ঞানিক একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করে যখন কাজে লাগান, তারপর তা দেখে আমরা তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাখ্যা করে বেশ বুঝে নিতে পারি। যেমন, বায়ুর তরঙ্গের ভেদে শব্দভেদ হয়, এ আমাদের জানা ছিল। সেই তরঙ্গের ভেদ মেপে গ্রাফ দিয়ে দেখবার যন্ত্রও তৈরি হয়েছিল। এডিসন যখন ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করলেন তখন সবাই বুঝতে পারলে যে, এটা আর কিছু নয়, ও-তরঙ্গের ভেদগুলোর মাপ একটা কয়লা-মাখানো কাচে না তুলে তাকে একটা কঠিনতর উপাদানে তুলে নিয়ে আবার সেইটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে সেই তরঙ্গের সৃষ্টি করবার প্রক্রিয়া মাত্র। Principle যে জানে, সে কলটা দেখে চট করে বলে দিতে পারবে যে, এ তো হবেই। কিন্তু সেটা হওয়ানোর জন্যে এডিসনের মাথা দরকার হয়েছিল। তেমনি মোটরগাড়ি, এয়ারোপ্লেন যখন হয়ে গেছে তখন আমার মতো লাখ-লাখ বৈজ্ঞানিক তার Principle ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পেরেছেন, কিন্তু সে-সব উদ্ভাবন করবার শক্তি তাই বলে সবার ছিল না।"

নির্মল বললে, "তা বটে।"

আট

সৃষ্টিধরকে যেদিন প্রথম আদলতে উপস্থিত করা হল সেদিন সে দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তার পক্ষে একজন বড় উকিল নিযুক্ত হয়েছেন। আদালতের হুকুম নিয়ে উকিল এসে তার সঙ্গে হাজতে দেখা করে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে গেলেন। তারপর যখন হাকিমের কাছে তাকে হাজির করা হল তখন সে উকিল তার জামিনের দরখাস্ত করলেন। সৃষ্টিধর দেখলে তার উকিলের পিছনে বসে আছে মহীতোষ।

সর্বতোষবাবু তার রক্ষার জন্য এই বিপুল আয়োজন করেছেন দেখে তার দু-চক্ষু আবার জলে ভরে উঠল।

উকিলবাবু জামিনের দরখাস্তের স্বপক্ষে অনেক আবেদন-নিবেদন করলেন, কিন্তু হাকিম পুলিশ-রিপোর্ট দেখে বললেন, "সর্বনাশ, এ আসামিকে জামিন দেওয়া যেতে পারে না।—পুলিশ-হাজত।"

থানায় ফিরে আসবার পর নির্মল ঘোষ এসে তাকে বললে, "আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি?"

সৃষ্টিধর বললে, "দেখুন নির্মলবাবু, দয়া করে আমায় ঠাট্টা করবেন না। আটক থাকা ছাড়া অন্য অসুবিধা আমার হচ্ছে না, তা আপনি বিলক্ষণ জানেন, আর আটক আপনি রাখবেনই আমায়, কাজেই ও সৌজন্যটুকু ঠাট্টা ছাড়া আর কি বলব।"

নির্মল বললে, "ঠাট্টা কেন মনে করছেন আপনি? আমি সর্বতোষবাবুকে কথা দিয়েছি আপনার যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা দেখব। তাই আপনার থাকবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব বিষয়েই যতদূর সুবিধা হয় তার চেষ্টা করছি। এতে আমি যদি আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা না করি তবে কেমন করে ব্যবস্থা করব আমি?"

"বেশ, যা জিগ্যেস করলেন তার জবাব তো দিয়েছি। আমার কোনও অসুবিধে নেই, আটক থাকা ছাড়া। গরিব আমি, মেসে যেমন থাকি তার তুলনায় রাজার হালে আছি।"

"আটক আছেন আপনি সত্য, কিন্তু কতটুকু? আপনি তো বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এত বড় দুটো মামলার তদারকে আপনি আমায় সাহায্য করছেন। এর যদি আস্কারা করতে পারি আমি তবে এর অর্ধেক-বাহাদুরি আপনার।"

সৃষ্টিধর কোনও কথা বললে না।

তারপর নির্মল বললে, "চলুন, আজ আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। একটা যন্ত্র পাওয়া গেছে।"

"মাপ করবেন, আমার আর যাবার ইচ্ছে নেই।"

"কেন বলুন তো?"

"আপনি তদন্ত করছেন আপনার চাকরির খাতিরে। আমার কি গরজ ও নিয়ে মাথা ঘামাবার?"

নির্মল একটু ভেবে বললে, "আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে আপনার যথোচিত স্বার্থ আছে।"

"থাকে থাক", বলে সৃষ্টিধর চুপ করে রইল।

কিন্তু নির্মল ছাড়লে না। সে তাকে বলে-কয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল সেই ব্যাঙ্কে।

সেখানে স্ট্রং-রুমের ভিতর সে একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলে। একটা প্যাকিং-কেস খোলা রয়েছে আর তার ভিতর রয়েছে কতকগুলো যন্ত্রপাতি।

নির্মল বললে, "দেখুন তো এটা কি যন্ত্র?"

সৃষ্টিধর অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তার কয়েকটা অংশের নাম ও ক্রিয়া বললে, কিন্তু বাকি কিছুই বলতে পারলে না। কেবল বললে, "এ একটা নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র—এর কাজ কি তাও বুঝতে পারছি না, আর এমন যন্ত্রের কথা কখনও পড়িওনি, শুনিওনি।"

নির্মল বললে, "একটু ভেবে দেখুন, এই যন্ত্র দিয়ে ঐ সিন্দুক খোলবার কোনও উপায় হতে পারে কি না?"

সৃষ্টিধর ঘণ্টাখানেক ধরে আবার যন্ত্রটাকে পরীক্ষা করলে, তার খোলা অংশগুলো অনেক রকম চেষ্টা করে জোড়া দিলে। তারপর সে তার প্লাগটা একটা ইলেকট্রিক-পয়েন্টের সঙ্গে জুড়ে দিতেই যন্ত্রটা ভর্‌র্-ভর্‌র্ করে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে লাগল, তার কতক কতক অংশ তেতে লাল হয়ে উঠল।

সৃষ্টিধর বললে, "খুব তীব্র high voltage বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে স্পর্শমাত্র মৃত্যু হতে পারে।" সে প্লাগটা খুলে ফেললে।

তারপর কতকগুলো পুরোনো মোটর-টিউব সংগ্রহ করে সেই যন্ত্রের তারের উপর তা জড়িয়ে একটা হাতল তৈরি করলে। সেই হাতল হাতে করে সে আবার প্লাগটা চালিয়ে দিলে। যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে লাগল তখন সে সন্তর্পণে সেই হাতল দিয়ে ধরে সে-যন্ত্রের একটা অংশ সেই সিন্দুকের পাশে ধরলে। অমনি সিন্দুকের সেই জায়গাটা তেতে লাল হয়ে দেখতে দেখতে সেখান থেকে লোহা টুপ্ টুপ্ করে গলে পড়তে লাগল।

তখন সে প্লাগ খুলে বললে, "আমার বিশ্বাস, এই যন্ত্রের আরও এমন কোনও অংশ আছে যাতে খুব সূক্ষ্ম ধারে এমনি বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে ইস্পাত সূক্ষ্মধারায় গলিয়ে সিন্দুক কেটে ফেলা যেতে পারে! সে অংশটা বোধহয় সেই চোর নিয়ে গেছে। অদ্ভুত এই যন্ত্র!"

নির্মল তখন যন্ত্রটাকে বেশ করে প্যাক করে সিলমোহর করে নিলে।

তারপর ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষা করে আরও কতকগুলো নোট করলে। ব্যাঙ্কের একখানা খাতা ও কয়েকখানা কাগজ নিয়ে থানায় ফিরে এসে সৃষ্টিধরকে রেখে সে গেল আই. বি. আফিসে।

সেখানে গিয়ে নির্মল বললে, "দেখুন, আপনারা সৃষ্টিধর মজুমদারের ফাইলটা একবার দেবেন?"

হেসে ইনস্পেক্টারবাবু বললেন, "আমরা কি ফাইল হাতছাড়া করি কখনও? কেন, কি চান বলুন না!"

"তার বিরুদ্ধে আপনাদের কাছে কার কি রিপোর্ট আছে তাই দেখতে চাই একবার।"

অনেকক্ষণ পরে সেই ফাইল বের হল। অত্যন্ত ছোট পাতলা একটা ফাইল। তাতে স্পাইয়ের নম্বর দেওয়া আছে—নাম নেই।

"এর নাম-ঠিকানা, এর দেওয়া রিপোর্ট, এই সব আমার দরকার।"

ইনস্পেক্টার বললেন, উপর থেকে হুকুম না আনলে দিতে পারেন না।

নির্মল ছুটল তার আফিসে।

নয়

নির্মল আফিসে আসতেই গোবিন্দবাবু বললেন, "কি, কতদূর হল? কিছু কিনারা করতে পারলে?"

"আজ্ঞে, না। এতদিনে কিনারায় যাবার ইশারাটা বোধহয় পেয়েছি। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে।"

গোবিন্দবাবু বললেন, "তুমি ভুল পথে চলছ নির্মল, আমি তো গোড়ায়ই বলেছি সৃষ্টিধর তোমার আসামি নয়, এখন স্থির জেনেছি সে কিছুই জানে না এ-সম্বন্ধে।"

"কেন স্যর?"

"সর্বতোষবাবুর খাতাখানা দেখছিলাম। তার ভিতর যে লেখাগুলো নতুন সেগুলো সৃষ্টিধরের নয়।"

"আজ্ঞে না, সেটা আমিও কাল তার ছাত্রের খাতার ভিতর তার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, লেখাগুলো যার, সে-ই খাতা চুরি করেছিল। তারপর তা থেকে এ দুটো বাড়ির প্ল্যান বের করে নিয়ে এটা সৃষ্টিধরের ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে।"

"তাই সম্ভব। কিন্তু আমার এখনও এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ যায়নি যে, যে ঐ খাতাখানা তাকে দিয়েছে, সৃষ্টিধর হয়তো তাকে জানে, কিন্তু তার নাম প্রকাশ করছে না। তবে আমারও একথা এখন মনে হচ্ছে যে, ও এ-দুটো চুরির একটাও করেনি।"

"বেশ কথা, কিসে তোমার মত বদলাল শুনি।"

"আমি ওকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অনেকবার ঐ দুই জায়গায় নিয়ে গিয়েছি। কেস সম্বন্ধে তার সঙ্গে অনবরত আলাপ করেছি, কখনও কোনও অসাবধান মুহূর্তে সে এমন কোনও পরিচয়ই দেয়নি যে, সে এ-দুই জায়গার এক জায়গায়ও কোনও দিন গেছে বা এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে। প্রথম থেকেই দেখতে পেলাম যে, এ ঘর-বাড়ির কোনও অংশই তার পরিচিত নয়। ঘরে ঢুকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে,

লাইটের সুইচ খুঁজে পায়নি। এমনি অনেক কিছু লক্ষ করে আমি এ-সন্দেহ করেছি। কিন্তু তবু ওকে যে আমি ধরেছিলাম তার জন্যে আমি এক ফোঁটাও দুঃখিত নই।"

"কেন?"

"ও আমার অনুসন্ধানে যে কি সাহায্য করেছে তা বলতে পারি না। ও সত্যি-সত্যি ভালো বৈজ্ঞানিক, আর বিজ্ঞানঘটিত অনেক সমস্যা সমাধান করে আমাকে ও সত্যের সন্ধান দিয়েছে।"

"এখন সন্ধান পেয়েছ তাহলে?"

"পাইনি। পাবার পথে এসেছি মনে হচ্ছে। দুটো clue পেয়েছি বোধহয়। একটা সন্ধান করতে হবে যে, যে-যন্ত্রটা দিয়ে সিন্দুক কাটা হয়েছে, সেটা কে ওই স্ট্রং-রুমে পাঠালে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, কে এই নিরীহ সৃষ্টিধরের নামে আই. বি.-র কাছে রিপোর্ট করলে!"

"প্রথম কথাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আই. বি.-র গোয়েন্দার খোঁজে কি হবে?"

"দেখুন, হারকাটার যে খুনি মামলাটা আমি করেছিলাম, তাতে যারা খুন করেছিল তারাই অন্য-একটা লোককে অজ্ঞান করে সে-ঘরে রেখে দিয়ে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে আমাকে খুনের খবর দিয়েছিল*। আমার বিশ্বাস, এখানেও আসল আসামি নিজের দোষ সৃষ্টিধরের ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আই. বি.-র কাছে ঐ খবরটা পাঠিয়েছে, যাতে সৃষ্টিধরের ঘর খানাতল্লাশি হয়ে খণ্ডিত খাতাখানা ধরা পড়ে। তাহলেই পুলিশ তার পিছনেই লাগবে, আসল আসামি নিশ্চিন্ত থাকবে।"

একটু ভেবে গোবিন্দবাবু বললেন, "আমর মনে হয় না যে, সে নিজে ইনফরমার হয়ে আই. বি.-কে খবর দিতে গেছে। দিয়ে থাকলে অন্য লোক লাগিয়েছে। হ্যাঁ, ও প্যাকিং-কেস সম্বন্ধে কতদূর সন্ধান পেলে?"

"খুব বেশিদূর নয়। ব্যাঙ্কের খাতায় দেখতে পেলাম যে, ঐ বাক্সটা ল্যান্ডিং অ্যান্ড ক্লিয়ারিং এজেন্সি থেকে ঐ ব্যাঙ্কে সেফ-কাস্টডিতে রেখেছে চুরির ঠিক চারদিন আগে। ল্যান্ডিং অ্যান্ড ক্লিয়ারিং এজেন্সির আফিসে এখনও যাইনি। বোধহয় কেউ এ যন্ত্রটা আমদানি করেছে বিদেশ থেকে ওদের দিয়ে, তারপর ওদের উপদেশ দিয়েছে ঐ ব্যাঙ্কের সেফ-কাস্টডিতে রাখতে। সেই আমদানিকারকটি কে সেটা দেখতে হবে।"

"তা বেশ, সে সন্ধান করতে থাক। কিন্তু আর একটা clue আমি আবিষ্কার করেছি সেটা দেখে নাও।"

বলে গোবিন্দবাবু খাতার মাঝখানের একটা পাতা খুলে নির্মলকে দেখালেন। নির্মল দেখলে একটা ঠিকানার ছাপ পড়েছে সেই পাতায়। একটা আরশি সেখানে

---

* গ্রন্থকারের "খুনের জের" দেখুন।

ধরে সে-ছাপটার সোজা প্রতিবিম্ব দেখলে নির্মল!—ঠিকানাটা ৩৬নং গিরিধারী ম্যানসনস। তার নীচে ছ-ছত্তর কালির লেখার অস্পষ্ট ছাপ আছে। আরশির ভিতর যতদূর পড়া গেল তাতে দেখা গেল লেখা আছেঃ

"ছজ্জু ** কলকাতার কাজ হা ** করেছি ** হাজরী ** কেল্লা ** "

গোবিন্দবাবু বললেন, "ভদ্রলোক বোধহয় সেইদিনই তাড়াহুড়ো করে লেটার-হেডিং ছাপিয়ে এনেছিলেন—তার কালিটা কাঁচা ছিল। সেই কাগজে চিঠি লিখতে লিখতে কেউ এসে পড়ে থাকবে, তাই তাড়াতাড়ি এই খাতার মধ্যে কাগজখানা ঢুকিয়ে খাতাটা কোনও ভারী জিনিসের তলায় লুকিয়েছিলেন। তাই এর ভিতর ঐ ছাপটা পড়ে গেছে। যার এ-লেখা তারই লেখা শেষ দু-পৃষ্ঠার হিসাবপত্তর।"

নির্মল বললে, "তাহলে চললাম স্যর গিরিধারী ম্যানসনে। আপনি একটু কমিশনার সাহেবকে লিখে আই. বি.-র ফাইলটা আনাবার চেষ্টা করুন।"

গিরিধারী ম্যানসনে গিয়ে কাউকে পাবে এ-আশা নির্মল করেনি। কেননা, তার বিশ্বাস ছিল যে, যে-লোক সেই চিঠি লিখেছে সে ততক্ষণ হাজারিবাগে চলে গেছে ছজ্জুলালের সঙ্গে দেখা করতে। সে আশা করেছিল যে, সেখানে সে আসামির কোনও সন্ধান অন্তত পাবে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তার মন বিষম দমে গেল। ম্যানসনের সে ফ্লাটটিতে প্রকাণ্ড এক নামজাদা বড়লোক থাকেন। সেখানে লোকজন গমগম করছে। পুলিশের সহজ সন্দিগ্ধতা, এবং তার উপর এতবড় প্রমাণসত্ত্বেও তার একথা মনে করতে কিছুতেই সাহস হল না যে, রায়বাহাদুর রামনারায়ণ মল্লিকের বাড়ি একটা চোর-ডাকাতের আড্ডা হতে পারে। অন্তত বিশেষ পরামর্শ না করে ফট করে এই বাড়িতে তদন্ত করতে ঢুকে পড়াটা সে নিরাপদ মনে করল না। তার দুটি বিশ্বস্ত চরকে সেই বাড়ির উপর নজর রাখতে নিযুক্ত করে কতকটা ভগ্নমনোরথ হয়ে গেল ল্যান্ডিং অ্যান্ড ক্লিয়ারিং এজেন্সির আফিসে।

সেখানে গিয়ে সে দেখলে, ঐ প্যাকিং-বাক্স সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে। প্রেরক ছজ্জুলাল কোম্পানি চালান করেছে কলকাতায় নিজের নামেই। ব্যাঙ্কে রাখবার অর্ডারও দিয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে ছজ্জুলাল কোং। কাজেই এখান থেকে কলকাতার কোনও লোকের ঠিকানা পাওয়া গেল না। যাই হোক ছজ্জুলালের নাম-ঠিকানা নিয়ে সিঙ্গাপুরে অনুসন্ধান করবার জন্য সে সেখানকার পুলিশে এতালা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে।

খবর শুনে গোবিন্দবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সেখানে কোনও সন্ধান পাবে বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, ছজ্জুলালেরও নাম-ঠিকানা সবই ভুয়ো। একটা

জাল নাম দিয়ে মাল পাঠিয়েছে, কেননা, মাল ডেলিভারি নেবার তাদের দরকার নেই, একবার ওকে সেফ-কাস্টডি-ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারলেই হল। এ পথে কিছু পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে না।"

দশ

এদিকে অনেক তদ্বিরের শেষে আই. বি. আফিস থেকে ইনফরমারের নামটা পাওয়া গেল—তার নাম গোকুল ঘোষ।

নির্মলের কাজ হল তখন গিরিধারী ম্যানসন আর গোকুল ঘোষের পিছনে লেগে থাকা।

এদিকে সেই যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্মল বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের ফার্ম ও দোকানে দেখিয়ে বেড়াল! তারা সবাই একবাক্যে বললে যে, এমন কোনও যন্ত্র তারা কখনও দেখেনি, শোনেওনি এর কথা। এর যে-সমস্ত অংশ—সবই জানাশোনা মেকারের তৈরি, সেগুলির সমবায়ে যে-যন্ত্র তৈরি হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন।

সৃষ্টিধর বলেছিল যে, এই যন্ত্রের একটা জায়গায় একটা সূক্ষ্ম নরুনের মতো তীব্র তাপসহ যন্ত্র বসিয়ে নিলে তা দিয়ে হয়তো মোটা-মোটা স্টিলের পাত সোজা কেটে ফেলা যেতে পারে। নির্মল সে-কথা একটা বড় ইঞ্জিনিয়ারের কারখানায় বলতে তারা সেটা খুব সম্ভব মনে করে তেমনি একটা যন্ত্র তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখলে কথাটা ঠিক। খুব পুরু ভালো স্টিল তা দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা যায়। তাদের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "এ যন্ত্রটা অদ্ভুত—এতে অনেক কাজ হতে পারে! যন্ত্রটা যিনি উদ্ভাবন করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এর পেটেন্ট কিনে নিতে পারি আমরা।"

কথাটায় নির্মলের আর-একটা কথা মনে হল। সে ছুটল পেটেন্ট আফিসে। সেখানে গিয়ে শুনতে পেল, এমন কোনও পেটেন্ট কেউ রেজেস্ট্রি করেনি।

সব জায়গায় এমনি বিফলকাম হয়ে সে মহা উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল। সে দেখতে পেলে যে, এমন একটা অপরাধীর পাল্লায় সে পড়েছে, যে কোনও দিক দিয়ে কোনও সন্ধানের নিশানা রেখে যায়নি।

তবে কি সে সত্যি-সত্যিই নিষ্ফল হবে?

ভাবতে রাগে তার গা জ্বলতে লাগল। সে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলে, কিছুতেই নয়। একটা চোর এসে তাকে এমনি ফাঁকি দেবে? তার বুদ্ধির এ অপমান ও পরাজয় সে কিছুতেই স্বীকার করতে সম্মত হল না।

সামান্য একটু ভোল বদল করে নিয়ে নির্মল চলছিল গিরিধারী ম্যানসনের সামনের রাস্তা দিয়ে। মনটা ছিল তার গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের নূতন পথের সন্ধানের চেষ্টা করছিল সে মনে মনে। চারদিককার আবেষ্টনের দিকে তার মোটেই নজর ছিল না।

একটুখানি সম্বিৎ ফিরে আসতে সে দেখতে পেলে—গোকুল ঘোষ ঠিক তার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল।

এখানে গোকুল!

মনটা চট করে চাঙা হয়ে উঠল। একটু তফাতে গিয়ে সে একটা পানের দোকানে সিগারেট কেনবার ছল করে দাঁড়িয়ে গোকুল ঘোষের গতিবিধি দেখতে লাগল।

যা ভেবেছে তাই!

গোকুল ঘোষ ঢুকল গিয়ে রামনারায়ণ মল্লিকের ফ্ল্যাটেই। তার সামনে রাস্তায় বসেছিল একটা ভিখারি। নির্মল গিয়ে ভিখারিকে একটা পয়সা দিল।

"জয় হোক বাবু" বলে ভিখারি মুখ তুলে চেয়েই হেসে বললে "আপনি?"

"হ্যাঁ, চুপ কর—যে লোকটা ঢুকল এখুনি, দেখেছ?" খুব মৃদুস্বরে বললে নির্মল।

"দেখেছি।"

"ও কার কাছে আসে দেখো।"

বলে নির্মল চট করে চলে গেল।

* * *

সৃষ্টিধর তখন জামিনে খালাস হয়েছে। মহীতোষ গিয়ে তদ্বির করে জামিন দিয়ে তাকে খালাস করে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে রেখেছে।

নির্মল তার কাছে এসে বললে, "চট করে একবার আসুন আমার সঙ্গে।" ট্যাক্সি করেই এসেছিল সে, সৃষ্টিধরকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে সে চলল গিরিধারী ম্যানসনের দিকে।

পথে যেতে যেতে নির্মল বললে, "সৃষ্টিধরবাবু, আপনার টাকা করবার একটা পথ হয়েছে।"

সন্দিগ্ধচিত্তে সৃষ্টিধর বলল, "কি রকম?"

"ঐ যে যন্ত্রটা আপনাকে দেখিয়েছিলাম—জানেন সেটার পেটেন্ট নেয়নি কেউ। আপনি যদি চটপট ওর একটা পেটেন্ট নিতে পারেন, তবে মোটা দামে তা বেচতে পারবেন। খদ্দের আছে।"

সৃষ্টিধর বললে, "তার পেটেন্ট আমি নেব কেমন করে? যন্ত্রটা তো আমার নয়!"

"তা জানি, কিন্তু আপনি যদি পেটেন্টের দরখাস্ত করেন তবে হয়তো সে খুব সম্ভব আপত্তি করতে আসবে না, আপনার পেটেন্ট অমনি হয়ে যাবে আর পেটেন্ট বেচে আপনি প্রচুর টাকা পাবেন।"

একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে সৃষ্টিধর বললে, "আমি যে চোর এ-ধারণা আপনার মাথা থেকে এখনও যায়নি দেখছি। নইলে কেমন করে ভাবছেন যে, আমি এমনি করে পরের ন্যায্য পেটেন্ট চুরি করতে চাইব?"

"একে চুরি বলে না। পেটেন্ট চুরি তো দিনরাত হচ্ছে জগতে। একটু-আধটু রদ-বদল করে পরের যন্ত্রের নূতন পেটেন্ট করে কত লোক বড়লোক হচ্ছে। আর আপনি এই হাতের লক্ষ্মীটা অনায়াসে পায়ে ঠেলছেন।"

"কিন্তু, আপনিই বা নিজে এ সম্পদ নিচ্ছেন না কেন? আপনি তো দরখাস্ত করতে পারেন?"

"কিন্তু আমি হলাম পুলিশ-কর্মচারী, আমি এমন একটা যন্ত্র বের করেছি তা বিশ্বাস করে কে? আপনি বৈজ্ঞানিক—করলেও করতে পারেন।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু কোনও রকম চুরিতেই আমার রুচি নেই।"

তারপর একটু থেমে সৃষ্টিধর বললে, "আচ্ছা, আপনারই বা আমাকে বড়লোক করবার জন্য এত শখ কেন? আপনার এতে কি স্বার্থ?"

"দেখুন, স্বার্থ ছাড়াও নির্মল ঘোষ অনেক কাজ করেছে। পুলিশের লোক হলেই লোকে ছোটলোক হয় আপনাদের বোধহয় এমনি ধারণা আছে। কিন্তু অন্তত আমি তত ছোটলোক নই! তাছাড়া, স্বার্থ—হ্যাঁ, তা বলতে গেলে আছে বইকি। আপনি যদি পেটেন্টের দরখাস্ত করেন তবে যে আসল মালিক সে হয়তো এসে আপত্তি করতেও পারে। তাহলেই বাছাধনের হাতে চট করে হাতকড়ি পরিয়ে দিতে পারি।"

সাসূয় হাস্যের সঙ্গে সৃষ্টিধর বলল, "তাই বলুন, আমি পেটেন্টের দরখাস্ত করলেই আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়ে যাবেন, আর অনায়াসে আমার হাতে হাতকড়ি পরাতে পারবেন। এই তো আপনার মতলব?"

নির্মল একবার বিরক্তভাবে সৃষ্টিধরের দিকে চেয়ে কি বলতে গেল। তারপর হেসে সে বললে, "সে মতলব থাকলে ভাবছেন আমার কোনও প্রমাণই নেই?"

চমকে উঠে সৃষ্টিধর বললে, "কি প্রমাণ আছে?"

"আপনাকে বলতে বাধা নেই, কেননা আমি সে প্রমাণে বিশ্বাসও করি না, আপনাকে তাই দিয়ে ফাঁসাতেও চাচ্ছি না। প্রমাণটা হচ্ছে এই যে, ওই যন্ত্রটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস, ওর বিবরণ এখানকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার কেউ জানে না। অথচ আপনি ঐ সম্পূর্ণ অপরিচিত যন্ত্র ঠিক প্রয়োগ করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঠিক যে কাজ ও দিয়ে করা

যায় তাই করে ফেললেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, যে-সব ইঞ্জিনিয়ারিং-ফার্মে ওটা দেখিয়েছি তাদের কেউ আপনার মতো অত তাড়াতাড়ি ওটা কাজে লাগাতে পারেনি। এ থেকে এ-সন্দেহ অনায়াসেই মনে হতে পারে যে, হয়তো ওটা আপনারই তৈরি, না হয় আপনি ও-যন্ত্র আগে থেকেই চিনতেন।"

অবাক বিস্ময়ে সৃষ্টিধর নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে রইল—ভয়ে তার প্রাণ কেঁপে উঠল।

নির্মল হেসে বললে, "কিন্তু সে অনুমান যে ভুল তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। কেননা, যন্ত্রটা যদি আপনার জানা হত তাহলে আপনি ওটা ফিট করতে গিয়ে গোড়ায় যে-সব ভুল করেছিলেন ও যেমন করে হাতড়াচ্ছিলেন তা করতেন না। সে-সব যে শুধু অভিনয় নয়, তার প্রমাণ এই যে, শেষ পর্যন্ত আপনি যন্ত্রটার ঠিক প্রয়োগ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যদি অভিনয় করে ভুল করাই আপনার মতলব হত, তবে আপনি শেষ পর্যন্ত সে অভিনয় বহাল রাখতেন, প্রয়োগটা সফল হতে দিতেন না! বুঝলেন তো এখন, কি কারণে আমি আপনাকে দোষী মনে করছি না! এখন বোধ হয় বিশ্বাস করবেন যে, আমি আপনাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছি না।"

সৃষ্টিধর মনে মনে খুব আশ্বস্ত হতে পারল না।

গিরিধারী ম্যানসনের খানিক দূরে থাকতে গাড়ি থেকে নেমে তারা দুজনে হেঁটে চলল।

হঠাৎ নির্মল বললে, "দেখুন, ঐ সামনে লোকটা আসছে, ওকে ভালো করে লক্ষ করে দেখুন।" বলে নির্মল সৃষ্টিধরের সঙ্গ ছেড়ে অন্য ফুটপাতে গিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগল।

বিস্মিত হয়ে সৃষ্টিধর সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেল, গোকুল ঘোষ আসছে। বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে তার মনে হল একে কোথায় যেন দেখেছে। মনের তলায় হাতড়াতে হাতড়াতে সে পথ চলতে লাগল। নির্মল ঘোষ তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নির্মলের এ আচরণে সৃষ্টিধরের যেমন হল সন্দেহ তেমনি হল ভয়। সে ভাবলে, এ তাকে ফাঁদে ফেলবার বোধহয় কোনও নূতন কল।

ভয়-ব্যাকুল চিত্তে সে একখানা ট্যাক্সি ডেকে চট করে উঠে সোজা সর্বতোষবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠল।

প্রায় তার পিছু-পিছু এল নির্মল ঘোষ, আর একখানা ট্যাক্সিতে। দুটো ট্যাক্সির ভাড়াই নির্মল দিয়ে দিলে।

তারপর নির্মল বললে, "ওকে দেখেছেন কোনও দিন?"

সৃষ্টিধর বললে, "দেখেছি একদিন, অনেকক্ষণ ভেবে মনে হয়েছে।"

"কোথায় দেখেছেন? কবে দেখেছেন?"

সন্দিগ্ধ সৃষ্টিধর বললে, "আগে বলুন কেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

হেসে নির্মল বললে, "পুলিশের লোক তা কি কখনও বলে?"

"তা না হলে আমি বলব না। আপনি নিশ্চয় আমাকে কোনও নূতন প্যাঁচে জড়াতে চাচ্ছেন। আমি কিছু বলব না।"

নির্মল বললে, "আপনি কেন মিথ্যে সন্দেহ করছেন? আপনার সম্বন্ধে যদি আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হতাম তবে কি আমি আপনার জামিনের দরখাস্তে আপত্তি করতাম না?"

"কিন্তু তবু তো আপনি আমার মামলাটা খারিজ করিয়ে দেননি। যদি নিঃসন্দেহই হয়েছেন তবে মামলা তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন না?"

"তবে শুনুন, আমার একটা অনুমান এই যে, এই লোকটা আপনার নামে আই বি.-র কাছে মিথ্যে খবর দিয়ে আপনার ঘর খানাতল্লাশি করিয়েছিল ওর নিজের দোষ আপনার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে। তাই ওর নিজের খবরাখবর আমার জানবার দরকার হয়েছে। আর সেইজন্যই আপনার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিইনি। যতদিন আপনাকে আসামি করে আমরা তদারক করছি ততদিন ওরা নিশ্চিন্ত আছে। আপনার মামলা তুলে নিলে ওরা ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে, তখন আর ওদের সব সন্ধান নাও পেতে পারি।"

সৃষ্টিধর বললে, "বুঝলাম। আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আমার উকিল আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন পুলিশের কাছে কোনও কথা না বলতে। তাঁকে না জিগ্যেস করে তাই কিছু বলব না আপনাকে।"

নির্মল ভারী বিরক্ত হয়ে বললে, "যাকগে, বলে কাজ নেই। সব কথা আমি নিজেই বের করবো'খন। আশ্চর্য এই যে, আপনি নিজের স্বার্থ বুঝতে পারছেন না—নিজেকে সন্দেহমুক্ত করবার এ সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছেন। যাকগে, কিছু বলতে হবে না আপনার। কিন্তু, আমি যে কথা বললাম তাও দয়া করে উকিলকে বলবেন না।"

বলে সে হন হন করে চলে গেল।

এগারো

নির্মলের নিযুক্ত গোয়েন্দারা তাকে যে খবর দিল, আর নির্মল নিজে কয়েকদিন

চেষ্টা করে যে খবর সংগ্রহ করলে তাতে বোঝা গেল যে, গোকুল ঘোষের দুইটি ব্যবসা আছে—আই. বি.-র গোয়েন্দাগিরি আর রায়বাহাদুরের মোসাহেবি।

রায়বাহাদুর বড়মানুষ। তিনি প্রধানত তিন কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রথমত, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তিনি বড় বড় কর্মচারী আর সাহেব-সুবাদের খানা দেন, পার্টি দেন। দ্বিতীয়ত, রেস-কোর্সের তিনি অক্লান্তকর্মী জুয়াড়ি। শুধু কলকাতা নয়, যখন যেখানে রেস হয় সেইখানেই তিনি ছুটে যান আর ভারী-ভারী বাজি রাখেন। তাঁর তৃতীয় পেশা তাঁর বাগান-বাড়ি। সেখানে সময়ে সময়ে সাহেব-সুবার পার্টি দেন, কিন্তু তার অবসরে সে বাগান সরগরম থাকে পাপ-বিলাসের অনলস প্রবাহে। টাকা খরচ করতে তিনি মুক্তহস্ত। গোকুল ঘোষ তাঁর একটি বিশ্বস্ত মোসাহেব। এর বেশি বিশেষ কোনও খবরই পাওয়া গেল না, কিন্তু এ-খবরের সবটাই নির্মলের প্রয়োজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

কেবল একটা খবর যা নির্মলের জানাই ছিল, সেইটাই হল এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দূরবর্তী ক্ষুদ্র দীপশিখা। সেটি এই যে, বিশ বছর আগে রায়বাহাদুর রামনারায়ণ এম. এস-সি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান-বিদ্যার কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সন্দেহ কখনও কারও হয়নি।

প্রমাণের এই অবস্থায় অতবড় একজন সবচিন বড়মানুষকে ঘাঁটানো এত বড় দুঃসাহসের কথা যে, নির্মল সে-কথা গোবিন্দবাবুর কাছেও উত্থাপন করতে সাহস করলে না।

কিন্তু একদিন সে নিজেই হঠাৎ গোকুল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে তার আফিসে নিয়ে এল।

গোকুল ঘোষ তো চটেই লাল। সে নির্মলকে যৎপরোনাস্তি শাসাতে লাগল যে এ কাজের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। সেও পুলিশের লোক, আই. বি.-র গোয়েন্দা। আই. বি.-র বড়সাহেবকে বলে সে এ-অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। তাছাড়া, রায়বাহাদুর এ নিয়ে লাটসাহেবের কাছে দরবার করে নির্মল ঘোষের চাকরিটি খসাবেন।

নির্মল বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে গম্ভীরভাবে তাকে তার আফিসে এনে, একটা সেফের ভিতর থেকে সর্বতোষবাবুর খাতাখানা বের করে আনলে।

"এ খাতা কোথায় পেয়েছিলে তুমি? কে দিয়েছিল তোমায়?" নির্মল গর্জে উঠল।

এক মুহূর্ত গোকুল ঘোষ হকচকিয়ে গেল। আমতা-আমতা করতে লাগল। তারপর বললে, "কিসের খাতা? ওর আমি কি জানি?"

গর্জন করেই নির্মল বললে, "তুমি জান এই যে, এ-খাতাখানা একদিন

সন্ধেবেলায়—পার্কের একটা বেঞ্চের উপর এক ভদ্রলোকের পাশে ফেলে গিয়েছিলে। এর ভিতর একটা স্লিপ লিখে রেখেছিলে। তারপর সে লোকটি যখন বাড়ি গেল, তুমি তার পিছু নিয়ে তার নামধাম জেনে এসে আই. বি.-তে মিথ্যে করে তার নামে রিপোর্ট করেছিলে—এসব তুমিও জান, আমিও জানি। এখন জানতে চাই যে, এ-খাতা তুমি পেয়েছিলে কার কাছে? রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন তোমায়?"

"না। তিনি কেন দিতে যাবেন?"

"তাহলে তুমিই এ-খাতা নিয়ে এর থেকে দু-খানা প্ল্যান খুলে নিয়েছিলে? ব্যাঙ্কে আর লক্ষ্মীকান্ত মিত্রের বাড়িতে তুমি চুরি করেছিলে?" চট করে সিপাই ডেকে নির্মল তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে।

লোকটা আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে, "আমি ও-থেকে কিছুই খুলে নিইনি, আমি অমনি পেয়েছিলাম, আমি কিচ্ছু করিনি।"

"তবে প্ল্যান খুলে নিয়েছিল কে?—রায়বাহাদুর?"

"না। তিনি কেন নেবেন! কে নিয়েছে আমি জানব কেমন করে?"

"কে দিয়েছিল তোমায় বইখানা, সরিয়ে ফেলবার জন্যে?"

"কেউ দেয়নি। ও-বইয়ের কথা আমি কিচ্ছু জানি না।"

"তুমি যা জান তা আমি বলেছি, তাতেই তোমার সাজা পাবার পক্ষে যথেষ্ট! দ্বীপান্তর বাস করতে না চাও তো খাঁটি কথাটি বল। আমার বিশ্বাস, ব্যাঙ্ক লুঠ করা তোমার কাজ নয়। সে কাজ যে করেছে তার সন্ধান দিতে পার তো অল্পে রেহাই পাবে, নইলে পুলি-পোলাও—মুক্তি নেই।"

কিছুক্ষণ বাদে আবার নির্মল বললে, "কিছু বলতে চাও?"

এইবার আবার উগ্রমূর্তি ধরে গোকুল বললে, "কি বলব? সব সাজানো, মিথ্যে মোকদ্দমা। এর একবর্ণ আমি জানি না।'

"হাজত লে-যাও!" বলে নির্মল অন্য কাজে মন দিল।

সিপাই যখন তাকে হাত ধরে নিয়ে চলল তখন গোকুল বললে, "দাঁড়াও—শুনুন। আমি সব বলব যদি আমাকে অ্যাপ্রুভার করেন।"

"শূয়ার!" বলে নির্মল ভ্রূকুটি করে উঠল।

তারপর বললে, "আচ্ছা, বেশ তাই হবে। কি জান আগে বল আমায়!"

গোকুল তখন বলে গেল, "বইখানা আমাকে রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন ঠিক। কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। তাঁর একটি মোসাহেব আছে নবীন বলে। সেই ছোকরা এ বইখানা চুরি করে এনেছিল সর্বতোষবাবুর বাড়ি থেকে। তাই দেখতে পেয়ে বাবু ভারী চটে গেলেন! নবীন তখন তাঁর হাতে-পায়ে ধরতে, রায়বাহাদুর

আমাকে বললেন, 'এ বই তুমি আর কারও হাতে গছিয়ে দিয়ে এস, যাতে ধরা পড়লে সেই পড়ে।' তাই আমি পার্কে গিয়ে একজন খুব অন্যমনস্ক লোক দেখে তার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এর বেশি আমি কিছু জানি না।"

লিখতে লিখতে কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মল বললে, "লে-যাও হাজত! মিথ্যাবাদী কোথাকার!"

"আচ্ছা, লে-যাও!" বলে গোকুল মরিয়া হয়ে গটমট করে চলে গেল।

নির্মল কিছুক্ষণ বসে ভাবলে। তারপর সে বের হল নবীনের সন্ধানে।

বারো

নবীনকে পেল সে রেস-কোর্সে।

গোটাকয়েক ভালো টিপ সংগ্রহ করে নিয়েছিল নির্মল। সে গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নবীনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে তার টিপের জোরে।

তিনটে বেশ ভারী বাজি মেরে নবীন মহাখুশি হয়ে বললে, "বাহাদুর ছোকরা তুমি হে গোপাল! খাসা টিপ তোমার! তোমাকে আর ছাড়ছিনে বাবা! কালকের টিপ কটা বলে দিতে হবে।"

নির্মল বললে, "কালকের কথা কাল দাদা, আজ যে বাজি মারলে সেটা Celebrate করবে চল।"

নবীন ইতিমধ্যেই দু-তিনবার 'বারে' গিয়েছিল, কাজেই মেজাজটা খুব খোশ ছিল। নির্মলকে নিয়ে আবার সে গেল।

তারপর যখন তার বেশ নেশা হয়েছে তখন নির্মল তাকে টিপ দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

সেখানে বসে সে বললে, "একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন, সে নাকি একেবারে টিপের ওস্তাদ—সে যে সেই কোথায় ডুব মেরে গেল তার আর সন্ধান পেলাম না। সে নাকি কোনও দিন ভুল করে না।"

উৎসুকভাবে নবীন বললে, "কে সে?"

"তার নাম গোকুল ঘোষ। কোন এক বড়লোকের মোসাহেব। গিরিধারী-ম্যানসনের সামনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

অট্টহাস্য করে নবীন বললে, "গোকলো? সে বেটা হাম্বাগ—কিচ্ছু জানে না!"

"তাই নাকি? তুমি চেন তাকে দাদা?"

"চিনি না? রোজ দু'বেলা বেটা আমার পাতড়া চাটে রায়বাহাদুরের বাড়ি। ও কিছু নয়—আফিমখোর বেটা।"

"তাই নাকি?—তবে হয়তো বেটা আমায় ঠকিয়েছে। আমাকে বললে কিনা—কাউকে বলবেন না দাদা, শেষে প্রাণে মারা যাব—দোহাই আপনার!"

নবীন ভূয়োভূয়ঃ আশ্বাস দিলে।

নির্মল মৃদুস্বরে বললে, "সে আমায় বলে, সে নাকি সেফ কাস্টডি-ব্যাঙ্কের সিন্দুক কেটে লাখ-লাখ টাকা মেরেছে, আরও সব ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে দেশ-বিদেশে। আমাকে তার ভাগীদার করবে বলে মশায়, এক হাজার টাকা নিয়েছে।"

"তুমি একটা ফুল! ওই হারামজাদার কথায় এতগুলো টাকা ঝেড়ে দিলে! ও শালা জানে কি? কোথায় ছিল ও সেদিন? শুধু এই শর্মাকে নিয়ে ছোটবাবু সে ঘরে ঢুকেছিল। আমিই সে সোনার তাল টেনে বয়ে নিয়ে এসেছি!"

"তাহলে আপনি!—আচ্ছা, আপনি দয়া করে শিখিয়ে দেবেন আমায়?"

ঘাড় নেড়ে নবীন বললে, "সে আর হবার জো নেই। সে কলটা আমরা ফেলে এসেছি—তা থাকলে পারতাম, ও কল স্—স্—সৈ—রী—ক—রতে ফারে—"

নবীন এতক্ষণ যে কথা বলছিল তা স্খলিত হলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল—এখন যা বললে তা একেবারে তার মুখে জড়িয়ে গেল এমন ভাবে যে কিচ্ছু বোঝা গেল না। নির্মল কান খাড়া করে শুনলে, "অ—ত্—ল্—অ—স্—ল্—ভোঁইস ইম্—ইন্—জি—"

বলতে বলতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধানের এত কাছাকাছি এসে এমনি খেই হারিয়ে যাওয়ায় নির্মল ভারী বিরক্ত হল।

মাতালটাকে গিরিধারী ম্যানসনসে পাঠিয়ে দিল সে। হয়তো কাল আবার নবীনকে পেতে পারে, কিন্তু প্রতি-মুহূর্তের বিলম্বে তার ভয় হচ্ছিল। গোকুল গ্রেপ্তার হয়েছে এ খবরটা পেলে, আসামি যেই হোক সামলে যাবে। তাছাড়া, নেশা কেটে গেলে নবীনই বা কাকে কি বলবে তার ঠিকানা কি?

তখনি সে হাজত থেকে গোকুলকে এনে তাকে আবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

গোকুল তখন দারুণ হাই তুলছে আর ছটফট করছে।

নির্মল বলল, "মৌতাতের সময় বয়ে যাচ্ছে—না?"

গোকুল একটা প্রচণ্ড হাই তুলে বললে, "যাচ্ছে!—গেছে কোন কালে। মরে যাব বাবু, একটু দেবেন?"

"দেব, যদি সত্যি কথা বল।"

"ধর্মত বলছি বাবু, যা জানি সব বলেছি আমি, এর বেশি কিছু জানি নে।"

"কয়েকটা কথা জান, সেই কটা বললেই এইটে পাবে।" বলে নির্মল একটা আফিমের কৌটো খুলে দেখালে।

গোকুলের চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলতে লাগল—বিঁধে রইল সেই কৌটোর ভিতর। হাত বাড়িয়ে সে বললে, "দিন দয়া করে—একটু দিন, প্রাণ বাঁচান।"

"অতুল বোস কোথায় থাকে?"

"অ্যাঁ" বলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে।

কৌটোটা হাতে নাচাতে নাচাতে নির্মল বললে, "বল শিগগির!"

অনেকক্ষণ পরে সে বললে, "ইঞ্জিনিয়ার অতুলবাবুর কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যে সিন্দুক-কাটা যন্ত্র তৈরি করেছিল ছোটবাবুর জন্যে।"

প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে গোকুল কিছুক্ষণ নির্মলের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, "দেখুন, যে আপনাকে বলেছে, সে সব খাঁটি কথা বলেনি। আমি সব বলব—আপনি দয়া করে আমাকে অ্যাপ্রুভার যদি করেন। এত হাঁড়ির খবর আর কেউ বলতে পারবে না। করবেন বলুন? তাহলে সব বলব।"

আফিমের কৌটোটা আর-একটু এগিয়ে ধরে নির্মল বললে, "অ্যাপ্রুভার করা আমার হাত নয়। কিন্তু সব সত্যি কথা যদি বল, তবে আমি চেষ্টা করে দেখব।"

"তবে লিখে নিন", বলে গোকুল বলতে আরম্ভ করলে আর নির্মল খস্‌খস্ করে লিখে যেতে লাগল।

একটু বলেই গোকুল বললে, "একটু দিন দয়া করে, নইলে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক বলতে পারছি নে।"

একটু ভেবে নির্মল তাকে একটু আফিম দিলে।

লিখতে লিখতে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "নবীনের বাড়ি কোথায়?"

"চব্বিশ পরগনায়।"

"কোন গ্রামে?"

"গ্রামের নামটি ঠিক মনে হচ্ছে না।"

"বটে, আচ্ছা, বলে যাও।"

আবার খানিক পরে সে চট করে জিগ্যেস করল, "ছজ্জুলাল তখন কোথায় ছিল?"

গোকুল একটু চমকে উঠল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললে, "কই মশাই, ছজ্জুলাল বলে তো কাউকে জানি না!"

আর খানিকটা লেখার পর নির্মল বললে, "নবীন তোমাকে চিঠি লিখেছিল?"

"আজ্ঞে না।"

"ছোটবাবুর চিঠি তুমি পেয়েছিলে?"

"কই না। ছোটবাবু তো কোনও চিঠি লেখেননি।"

খাতা বন্ধ করে নির্মল বললে, "তুমি যা বলছ তার অর্ধেক বানাওট। আর দরকারি সব কথা চেপে গেছ। এতে হবে না। তুমি ছজ্জুলাল!"

একটু হাঁ করে গোকুল চেয়ে রইল শুধু।

নির্মল অনুমান করেছিল, ছজ্জুলাল বোধহয় একটা ছদ্মনাম—সে তাই সাহস করে বলে ফেললে কথাটা এই ভেবে যে, তার অনুমান যদি সত্য হয় তবে গোকুলের হঠাৎ চমক লেগে যাবে, আর তাতেই তার কথাটা প্রমাণ হয়ে যাবে। গোকুলের ভাব দেখে সে স্থির করলে যে, ছজ্জুলাল নামে চিঠিপত্র লেখা হত এই গোকুলকেই, আর সেই অনুমান করে সে স্থির করলে যে, চট করে গোকুলের বাড়ি খানাতল্লাশি করা দরকার।

তাই সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে একখানা সার্চ-ওয়ারেন্ট বের করে অবিলম্বে বের হল তার বাড়ি খানাতল্লাশি করতে।

কতক কাগজপত্র হস্তগত করে ফিরে এসে সে গোবিন্দবাবুর কাছে একখানা শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র তার দুটি সিপাই নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়ল।

তেরো

চব্বিশ পরগনার দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতর পাঁচহাজারী গ্রাম। এককালে হয়তো এখানে কোনও পাঁচহাজারী মনসবদার ছিলেন, কিন্তু এখন এখানে সামান্য কয়েকঘর দুর্ধর্ষ চাষি আছে, যারা বাঘের সঙ্গে আর বেনো-জলের সঙ্গে সমান লড়াই করে জমির আবাদ করে। চাষিদের বসতি থেকে কিছু দূরে একটা জঙ্গলের ভিতর একটা ভাঙা-বাড়ির স্তূপ আছে; লোকে তাকে বলে, কেল্লা। মাঝে-মাঝে যখন গ্রামে বাঘ আসে, তখন ঐখানটাই হয় তার আস্তানা।

কেল্লার নীচেই একটা খাল বয়ে গেছে, জোয়ারে সে-খালে জল থাকে অনেক, কিন্তু ভাটার সময় একটা সূক্ষ্ম রেখা মাত্র বয়ে যায়। সেই খালের ভিতর দিয়ে একখানা ছোট ডিঙ্গি এসে প্রায় সূর্যাস্তের সময় ভিড়ল। নির্মল তার দুটি সিপাই নিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে নামল।

জঙ্গল ভেঙে কিছুদূর যেতে না যেতে মাঝিরা বলল, "বাবু, ফিরে আসুন শিগগির! বাঘ এসেছে।"

নির্মল পিছন ফিরে দেখতে না-দেখতে মাঝিরা হুড়মুড় করে নৌকা ঠেলে নিয়ে গেল অনেকদূরে। বাঘ তখন খালধারে বেরিয়ে পড়েছে দেখে তাদের আর নৌকা সেখানে রাখতে সাহস হল না।

এক মুহূর্ত নির্মল ভড়কে গেল। তাই তো, এই সম্ভাবনাটা তার মনেই হয়নি। বাঘের সামনে রিভলভারে কোনও কাজ হবে না। রাইফেল আনা উচিত ছিল। তার ও তার সিপাইদের সবার সঙ্গেই অস্ত্রের মধ্যে আছে শুধু রিভলভার! নির্মল ঘেমে উঠল।

পরমুহূর্তেই সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে। কোনওমতে কেল্লার ভিতর ঢুকতে পারলে হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারবে। তাই প্রাণপণে ছুটতে লাগল তারা।

তাদের পায়ের শব্দ শুনে বাঘ ফিরে তাকাল। তারপর মন্থর পদে সে তাদের শব্দ লক্ষ করে অগ্রসর হল। কেল্লার প্রাচীরের কাছে এসে নির্মল দেখল সামনে খাড়া-দেয়াল। তার ভিতরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজতে হবে হয়তো অনেক ঘুরে। কিন্তু ততক্ষণ বাঘ তাদের দেখতে পেয়েছে, আর মনে হল যেন ছুটতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে ঘুরে প্রবেশপথ খুঁজে পাবার আগেই বাঘ যে তাদের ঘাড় মটকাবে, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

নির্মল তার দুটি সঙ্গী নিয়ে চটপট একটা গাছে উঠে পড়ল। গাছের খুব উঁচু ডালে বসে নীচে ব্যাঘ্রের নিষ্ফল আস্ফালন দেখতে দেখতে সে বুদ্ধি ঠিক করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সে ধীরে ধীরে একটা লম্বা ডাল বেয়ে অগ্রসর হল। ডালটা কেল্লার প্রাচীর অতিক্রম করে গেছে।

তখন সূর্য অস্ত গেছে। বাইরে তখনও বেশ আলো, কিন্তু বনের ভিতর গাছের তলায় অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে। নির্মল তার একজন সঙ্গীকে বললে বাতি জ্বালাতে। নির্মলের নিজের সঙ্গে টর্চ ছিল, কিন্তু তার একটি সঙ্গীর গায়ে ঝোলানো ছিল ছোটখাটো একটা সার্চলাইট। সঙ্গীর হাত থেকে জ্বালানো সার্চলাইট নিয়ে নির্মল সাঁ করে বাঘের চোখের উপর আলো ফেলে দিলে। তার চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলতে লাগল, কিন্তু বাঘটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনে একসঙ্গে বাঘের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল তাদের রিভলভার।

চোখের উপর গুলি খেয়ে হক্‌চকিয়ে বাঘটা একটা ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল। নির্মল অনেকক্ষণ সার্চলাইটটা চারদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু বাঘ আর দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নির্মল তার এক সিপাইয়ের লম্বা পাগড়ি খুলে খুব

কষে বাঁধলে ডালের সঙ্গে। তারপর সেই পাগড়ি বেয়ে তারা তিনজনে আস্তে-আস্তে নেমে গেল দেয়াল ডিঙিয়ে কেল্লার ভিতরে।

কেল্লার ভিতর রাশি-রাশি ভাঙা-ইটের স্তূপ। তার ভিতর আস্ত কোনও ঘর আছে বলে মনে হল না। তারপর টর্চ ও সার্চলাইট জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখতে পেল একটা ঘর—বোধহয় আস্তাবল-গোছের ছিল সেটা, তার চারদিকেই বেশ মজবুত দেয়াল আছে, কিন্তু সামনের দেয়ালে যে প্রশস্ত খোলা দরজা, তার কপাট-টপাট কিছু নেই।

চারদিকে ছড়ানো ইট-কাঠ লোহা-পাথর যা পাওয়া গেল, সেইগুলো স্তূপ করে ফেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তারা সেই দরজাটার উপরে ছোট্ট একটা ফাঁক রেখে ভরে ফেললে; এই নবোদ্ভাবিত দুর্গের ভিতর তারা আশ্রয় নিলে। নির্মল স্থির করলে আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে।

আলো জ্বেলে ঘরের মেঝেটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ফেলে তাদের সঙ্গে খাবার জিনিসপত্তর যা ছিল বের করে খেতে খেতে নির্মল বলল, "কি হে ইয়াকুব, একটা বুদ্ধি বাতলাও! এখানেই বসে থাকব সারা রাত্তির?"

ইয়াকুব বললে, "হুকুম হয় তো আমি একবার বেরিয়ে চারদিক ঘুরে দেখে আসি কোনও সন্ধান মেলে কি না?"

"তারপর, বাঘ যদি সন্ধান পায়—তবে?"

"সার্চলাইট দেখলে বাঘ এগুবে না। তাছাড়া, একটা বড় করে আগুন জ্বালা যাক।"

"কিন্তু তাতে এখানে যদি তারা কেউ থাকে, তবে টের পেয়ে যাবে যে!"

বিষণ সিং বললে, "হুজুর, একদম বসে না থেকে এই ঘরেরই দেয়ালগুলো একটু একটু ভেঙে দেখি না, এর আশে-পাশে কোনও সন্ধান মেলে কি না?"

নির্মল বললে, "সে বুদ্ধি মন্দ নয়।"

বিষণ সিং তার থলে থেকে সিঁধ কাটবার যন্ত্রপাতি বের করে একটা দেয়ালের উপর কাজে লেগে গেল। ইয়াকুব আর একটা দেয়াল নিলে।

বিষণ হঠাৎ থেমে গিয়ে কান খাড়া করে ইশারা করলে।

সেদিককার দেয়ালের অনেকটা ইট তখন খোলা হয়ে গেছে, বড়জোর এক-ইট ব্যবধান হয়তো বাকি আছে। সেইখানে কান পেতে নির্মল শুনলে, মানুষের আওয়াজ।

খুব সন্তর্পণে নিঃশব্দে কয়েকটা ইট সরিয়ে যে ফাঁক হল, তার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নির্মল দেখতে পেলে, এই ঘরের পিছনে আছে মাটির তলায় একটা

কুঠরি, তার ছাদের কাছ-বরাবর নির্মলের তৈরি গর্তটা হয়েছে। সেই ঘরের মেঝেয় কয়েকটা সিন্দুক আছে আর তার আশেপাশে গোটাকয়েক লোক একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে কি কথাবার্তা কইছে।

মাথা বের করে নিয়ে সে ফাঁকের মুখে ইট চাপা দিয়ে নির্মল ভাবতে লাগল এখন কি করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কিছু দূরে—মনে হল শ-খানেক লোকের চেঁচামেচি শোনা গেল—সে এক বিষম হুল্লোড়!

চমকে উঠে নির্মল তার সিপাইদের সঙ্গে ছুটে গেল দরজার দিকে। ইট-কাঠের স্তূপ দিয়ে তাকে বন্ধ করা হয়েছিল, রিভলভার বাগিয়ে তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে তারা চেয়ে রইল, আবশ্যক হলে আত্মরক্ষা করবার জন্য।

হল্লাটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। মানুষের চিৎকার, কেরোসিন-টিন পেটার আওয়াজ, সব মিলে ক্রমে একটা কান-ফাটানো কলরব শোনা গেল।

তারপর দেখতে দেখতে সে-ঘরের সামনেটা প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কলরব প্রচণ্ডভাবে চলতে লাগল।

অনেকক্ষণ এমনি কলরব হচ্ছে অথচ কিছু দেখা যাচ্ছে না। কি হচ্ছে জানবার জন্যে নির্মলের ব্যগ্রতা ভয়ানক উগ্র হয়ে উঠল। সে বললে, "তোমরা থাক, আমি একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসি।"

পাঠান ও শিখের সম্মিলিত শক্তি টেনে রেখে নির্মলকে এই দুঃসাহসিকতা থেকে নিবৃত্ত করলে।

নির্মল হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। রাত্রি সবে একটা। এখনও ভোর হতে অনেক বাকি!

ইটের পাঁজার উপর উবু হয়ে রিভলভার চেপে ধরে বসে থাকতে থাকতে নির্মলের হাত-পা-কোমর কনকন করছিল। সে নেমে এসে ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়ল।

বসেই সে চমকে উঠল। সে জায়গায় তার রিভলভারের ঠোকা লেগে যে আওয়াজ বেরুল, সেটা যেন ফাঁপা মনে হল। সে আরও গোটা-কয়েক টোকা দিয়ে দেখল জায়গাটা ফাঁপাই বটে।

সে একাই খুঁড়তে লাগল সেখানটা, সিপাই দুটো দোরে পাহারায় বসে রইল।

নির্মলের বেশি খুঁড়তে হল না। দু-প্রস্থ ইট সরাতেই সে দেখতে পেলে যে, তার নীচে ফাঁপা। তলায় একটা খিলান ছিল—নোনায় খেয়ে তা ধসে পড়েছে। তার তলায় দেখা গেল, সুড়ঙ্গ-পথ।

তলায় ইটের উপর সন্তর্পণে পা রেখে নির্মল একটু নেমে ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার চেষ্টা করলে।

ঠিক সেই সময় বাইরের কোলাহল ভীষণ হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বাঘের প্রচণ্ড গর্জন। তারপর গোটা-কয়েক গুলির আওয়াজ।

ইয়াকুব মুখ ফিরিয়ে বললে, "হুজুর, এ আর কিছু নয়, গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে বাঘ মারতে এসেছে"—

কিন্তু কোথায় হুজুর?

ইয়াকুব স্তম্ভিত হয়ে বিষণ সিংকে বললে, "আরে, সাব কাঁহা গয়া।"

টর্চ জেলে দুজনে দেখলে ঘরের ভিতর নির্মল নেই। দেখলে, মেঝের খানিকটা খোঁড়া হয়েছে, তার তলায় অন্ধকার গহ্বর!

স্তম্ভিত হয়ে ইয়াকুব ছুটে গেল ভিতরের দেয়ালের ফাঁকের দিকে। সেখানকার ইট সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, নীচের ঘরে সেই লোকগুলো নির্মলকে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

তখন তাড়াতাড়ি তারা দুজনে বুদ্ধি করে সেইখানকার আরও ইট সরিয়ে ঘুলঘুলিটা বড় করে তার ভিতর দিয়ে মুখ ও রিভলভার-সুদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "খবরদার! হাত উঠাও, নেই তো গোলি করেঙ্গে।"

চারটে লোক নির্মলকে বাঁধছিল। বাঁধা তাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, শুধু গেরোটা দেওয়া বাকি। হঠাৎ শূন্য থেকে এই আদেশ শুনে তারা থমকে আস্তে-আস্তে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল। তারা চারদিকে চাইতে লাগল তাদের আক্রমণকারীর সন্ধানে। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় এত উঁচুতে সিপাইদের দেখা গেল না। তাই তারা বিমূঢ় হয়ে রইল।

আরও দুটো লোক সিন্দুকের আড়ালে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। ইয়াকুব বললে, "বাবুর বাঁধন খুলে দাও একজন।"

একজন সে আদেশ পালন করতে অগ্রসর হল।

এমন সময় হঠাৎ পর পর তিন-চারটে গুলির আওয়াজ হল। বিষণ সিং-এর হাতে একটা গুলি লেগে তার রিভলভার পড়ে গেল।

সিন্দুকের আড়ালে যারা লুকিয়ে ছিল তারাই কেবল শব্দ লক্ষ্য করে এলোমেলোভাবে গুলি করে বিষণ সিংকে জখম করতে পেরেছিল!

বিষণ সিং-এর রিভলভারটা পড়তে দেখে তারা ভাবলে শত্রু নিরস্ত্র হয়েছে। তখন তাদের সবাই ছুটে বের হতে গেল সেই গহ্বর থেকে আহত শত্রুকে বন্দী

করবার জন্য। ইয়াকুব চটপট তার রিভলভার ঝেড়ে দিলে। তাতে দুজন কাৎ হয়ে পড়ল, কিন্তু আর চারজন কোথায় লুকিয়ে গেল।

ইয়াকুব চট করে সার্চলাইট জেলে সেই ঘরের উপর ফেললে, কিন্তু চারজন লোককে কোথাও দেখা গেল না। যখন সে সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে তখন—হঠাৎ তার পিছন থেকে এসে দুটো লোক ইয়াকুবকে চেপে ধরলে। এরা উঠে এসেছিল সুড়ঙ্গ-পথে, নির্মল মেঝে খুঁড়ে যে ফাঁক করেছিল সেইখান দিয়ে। ইয়াকুব বা বিষণের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না।

ইয়াকুব হাত ঘুরিয়ে রিভলভার ছুঁড়ে একটাকে জখম করলে, বিষণ সিং তার খোঁড়া হাত নিয়ে কাতরানি ভুলে গিয়ে তার রিভলভার বাঁ-হাতে ছুঁড়ে আর একজনকে মারলে। কিন্তু তারপর আর দুজন তাদের বন্দী করে ফেললে।

এই দুটো সিপাইর সঙ্গে আততায়ীরা যখন ধস্তাধস্তি করছে, তখন হঠাৎ পিছন থেকে দুমদুম করে কয়েকটা পিস্তলের আওয়াজ হল। আহত হয়ে আততায়ীরা পড়ে গিয়ে চেয়ে দেখলে সাক্ষাৎ যমের মতো দু'হাতে দুই রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্মল!

* * * *

নির্মল যখন নীচের সুড়ঙ্গ-পথ দেখবার জন্য সাবধানে পা বাড়াচ্ছিল, তখন যে-ইটখানার উপর সে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানা হঠাৎ ধসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে নির্মল পড়ে গেল অনেকটা নীচে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর।

বাইরের কোলাহলে, ইয়াকুব বা বিষণ সিং সে-শব্দ শুনতে পেল না, কিন্তু সুড়ঙ্গের শেষ মাটির তলার ঘরে বসে আততায়ীর দল শব্দ শুনে ছুটে গেল।

চোট পেয়ে নির্মল তখন বেহুঁশ হয়ে গেছে। তাই এরা নির্বিবাদে তাকে তাদের গুপ্ত-গৃহে নিয়ে গিয়ে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হবার আগেই হল বিঘ্ন। তখন নির্মলের জ্ঞান হয়েছে।

তারপর আততায়ীরা যখন দুজন জখম আর চারজন সে-ঘর থেকে বের হয়ে গেল, তখন নির্মল আস্তে-আস্তে তার অসম্পূর্ণ বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে গেল উপরের ঘরে। দু-হাতে গুলি ছুঁড়ে সে সব-কটাকে কাবু করলে। ইয়াকুব ও বিষণ সিংকে মুক্ত করে বিষণ সিং-এর হাত পরীক্ষা করে দেখলে যে, আঘাত সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর হয়নি। সে যত্ন করে তাকে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে তার হাতটা স্লিং-এ ঝুলিয়ে দিতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল, অনেকগুলো লোক হুড়মুড় করে তাদের এ-ঘরের দরজার ইট-কাঠ হৈ হৈ করে সরাচ্ছে। দেখতে দেখতে দরজা ফাঁক হয়ে গেল।

নির্মল এক-হাতে টর্চ, এক-হাতে রিভলভার নিয়ে রুখে দাঁড়াল।

যেটুকু ফাঁক হয়েছিল তার ভিতর দিয়ে একটা রিভলভার-বাগানো হাতের পিছনে যে এল, নির্মল টর্চের আলো তার মুখে ফেলে দেখলে—গোবিন্দবাবু।

চৌদ্দ

আফিসে বসে গোবিন্দবাবু বললেন, "ভাগ্যে তোমার কথা শুনিনি আমি। তুমি তো আমাকে খাড়া হুকুম দিয়ে গেলে বায়বাহাদুরের বাড়ি খানাতল্লাশ করতে। তা করলে আজ কি হত ভেবে দেখ।"

"তা ঠিক স্যর, কিন্তু তাই বলে আপনি অতুল বোসের বাড়ি সার্চ করে গ্রেপ্তার করালেন না—সে যে ফস্কে গেল!"

"তা যে করিনি সেজন্যে একটুও আপশোস হচ্ছে না আমার। তুমি খবর দিয়ে গেলে তুমি যাচ্ছ পাঁচহাজারী। জায়গাটা তুমি চিনতে না, আমি জানতাম। ওখানে বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে হয়। সেখানে তুমি গেছ শুধু রিভলভার নিয়ে। তাই মনে করলাম যে, বাঘের মুখ থেকে তোমাকে রক্ষা করাটা সবার আগে দরকার, তাই রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে যত শিগগির পারলাম চলে গেলাম।

"গিয়ে যা খবর শুনলাম, তাতে ভারী ভয় খেয়ে গেলাম! শুনলাম তোমার নৌকোর মাঝি এসে খবর দিয়েছে যে, তোমরা কেল্লার জঙ্গলে ঢুকেছ, তারা তোমাদের কাছাকাছি এক বাঘ দেখে গাঁয়ের লোককে ডাকতে এসেছিল। খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক যার যা হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শুনতে পেলাম দুটো বন্দুক আছে তাদের, সে শট্‌গান, রাইফেল নয়। মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা তোমাদের আস্ত পাবে কি না, ঘোর সন্দেহ হল। ছুটে গিয়ে দেখলাম তারা বাঘটাকে beat করে বের করেছে, গুলিও করেছে, কিন্তু বাঘ তাতে ঘায়েল হওয়া দূরে থাকুক, মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আমরা তখনি দু-দিক থেকে দুটো রাইফল দিয়ে তাকে শেষ করে দিলাম। তারপর শুনলাম তোমাদের তারা দেখেনি! তাই কেল্লাটা ঘেরাও করে তোমাকে beat করতে লাগলাম! তোমার গুলির আওয়াজ শুনে শেষে এদিকে ছুটে এসে দেখলাম, তুমি একাই ওদের সাবাড় করেছ। এমন বামাল সমেত এত বড় একটা গ্রেপ্তার অনেকদিন হয়নি।—বাহাদুর ছোকরা তুমি!"

"কিন্তু তবু আমার দুটো আপশোস রয়ে গেল। দশ হাজার টাকার মাল ওরা সরিয়েছে—আর অতুল বোস হাতছাড়া হয়ে গেছে। সে গেল কোথায়?"

"শুনেছি, সে পশ্চিমে কোথায় গেছে! কিন্তু সে যে এর ভিতর আছে তার সন্ধানই বা কোথায় পেলে, আর তার প্রমাণই বা কি?"

"সন্ধান প্রথম পেলাম ওই নবীনের কাছে। নামটা সে এমন জড়িয়ে বললে যে, প্রথমে বুঝতে পারলাম না। তারপর আন্দাজ করে নিয়ে খপ করে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম গোকুলের কাছে। সে যা উত্তর দিলে তাতে বুঝলাম, অতুল বোসই আসল লোক। গোকুলের বাড়িতে খানাতল্লাশি করে অতুল বোসের লেখা একখানা চিঠি পেলাম, তাতে সে তার কলের কথাটা রায়বাহাদুরকে স্মরণ করিয়ে দিতে গোকুলকে বলেছে। তাতেই তার ঠিকানাও পেলাম। কিন্তু তার বেশি দরকারি একটা খবর পেলাম বলে আমি অতুল বোসকে আপনার ভরসায় রেখে তখনি ছুটে গেলাম। কেননা আমার সন্দেহ হয়েছিল যে গোকুল গ্রেপ্তার হবার কথা টের পেলেই ওরা সাবধান হয়ে যাবে। কাজেই যা কিছু করবার, তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

"কি খবরটা পেলে, শুনি?"

"জানলাম যে নবীনের বাড়ি, পাঁচাহাজারী। আপনি যে খাতার ভিতর একটা চিঠির ছাপ দেখিয়েছিলেন, মনে আছে তো? তাতে 'হাজারী' কথাটা ছিল। তাই আমরা হাজারীবাগে সন্ধান করেছিলাম। নবীনের লেখা একখানা পোস্টকার্ড পেলাম গোকুলের বাড়িতে, সেটা সে লিখেছে 'পাঁচহাজারী' থেকে। তখনি আমার মনে হল যে ও-চিঠির ওই "হাজারী"—হাজারীবাগের নয়, পাঁচহাজারীর। তারপর সর্বতোষবাবুর খাতার ছাপটা আবার পরীক্ষা করে দেখলাম, 'পাঁচহাজারী' সম্ভব। জুরিস্‌ডিক্‌শন লিস্ট থেকে পাঁচহাজারী খুঁজে বের করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম।"

"বেরুলে সুন্দরবনে, তিনজনে শুধু রিভলভার নিয়ে! এটা দুঃসাহসিকতার চেয়ে বেশি—একেবারে গোঁয়ারতুমি।"

"কিন্তু আমার ভরসা ছিল আপনার উপর। আপনাকে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যেতে লিখে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই জানতাম যে, রাত পোহাবার আগেই আপনি গিয়ে পড়বেন, আর বিপদে পড়ি—উদ্ধার করবেন।" বলে নির্মল কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুর দিকে চেয়ে হাসলে।

গোবিন্দবাবু বললেন, "সে সুযোগই বা দিলে কই? উদ্ধার করবার আগেই তো তুমি উদ্ধার হয়ে বসেছিলে। তবে হ্যাঁ, আমি যদি গিয়ে না পড়তাম তবে ফেরবার পথে বাঘের পেটে যেতেও পারতে। যাক গে, একটা চিঠি দেখাই তোমায়।"

চিঠিখানা সেফ-ডিপজিট-ব্যাঙ্কের। তাদের নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্য পুলিশ-কর্মচারীদের ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিয়ে তারা কর্মচারীদের ২০,০০০ টাকা পুরস্কার দেবার জন্য গভর্নমেন্টের অনুমতি চেয়েছে। গভর্নমেন্ট সেই চিঠি পুলিশ-

কমিশনারকে এবং পুলিশ-কমিশনার ডিটেকটিভ-ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছেন। পুরস্কারের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা তা এখন গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন।

নির্মলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে বললে, "যদি ওই অতুল বোসটাকে ধরতে পারতাম!"

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। গোবিন্দবাবু রিসিভার হাতে নিয়ে শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি টেলিফোনে বললেন, "যাক, ষোলকলা সম্পূর্ণ হল তাহলে। নির্মল তো ওই জন্যে মনমরা হয়ে রয়েছে।"

উগ্র-কৌতূহলের সঙ্গে নির্মল বলল, "অ্যাঁ? কি স্যর? অতুল বোসের খবর?"

"হ্যাঁ, কোর্ট-ইনস্পেক্টারবাবু ফোন করলেন যে, অতুল বোস আজ কোর্টে এসে surrender করেছে। তাকে এখনি এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

নির্মল আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বললে, "বস, এইবার আর কোনও গ্লানি নেই আমার মনে।"

আধঘণ্টা পরে ইঞ্জিনিয়ার অতুল বোস পুলিশের হেফাজতে এসে পৌছুলেন।

অতুল বোস সম্প্রতি আমেরিকা থেকে সিঙ্গাপুর ঘুরে কলকাতায় এসেছেন। আমেরিকায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দশ বছর বড় বড় কারখানায় কাজ করে এসেছেন তিনি। পাতলা ছিপছিপে লোকটি, কিন্তু তাঁর চালচলন কথাবার্তায় দৃঢ়তা ও দম্ভ যেন ছিটকে পড়ছে।

অতুল বোস এসেই বললেন, "What's all this nonsense?"

নির্মল তাঁকে বললে, "আপনি খুব বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল ইঞ্জিনিয়ার।"

অতুল বেশ উদ্ধতভাবে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়! এদেশে আমার মতো কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার কেউ নেই।"

"খুব আশ্চর্য উদ্ভাবনী-শক্তি আপনার।"

"হ্যাঁ। আমেরিকার মতো দেশেও নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করে আমি বহু প্রশংসা পেয়েছি।"

"তা এত বুদ্ধি আপনার, এটা সৎকাজে নিযুক্ত না করে এমন করলেন কেন? আপনি যা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, লাখ টাকায় তার পেটেন্ট এখুনি বিক্রি করতে পারেন—তা না করে—"

হো হো করে হেসে উঠে অতুল বোস বললেন, "লাখ টাকা! বলেন কি মশায়! আমেরিকায় আমাকে বছরে ত্রিশ হাজার ডলার রয়ালটি দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি।"

"কিন্তু তা না করে এ-কাজ করতে গেলেন কেন আপনি?"

ভ্রূকুটি করে অতুল বোস বললেন, "কি কাজ যে করেছি, তা আমার চেয়ে আপনারাই বেশি জানেন দেখছি। তাই নিয়ে আপনারা ওয়ারান্ট করেছেন, হুলিয়া করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু কি সেইটা বুঝতে পারছি না। একটু খোলসা করে আমাকে বলবেন কি?"

নির্মল হেসে বললে, "আমরা অনেকটাই জানি, কিন্তু তবু আপনার চেয়ে বেশি জানি সে স্পর্ধা করতে পারি না! সেফ-ডিপজিট-ব্যাঙ্কে যে ভয়ানক চুরি হয়ে গেছে—"

"সে খবর এখানে এসে আজ শুনলাম। আর তাই নিয়েই আপনাদের এ হুলিয়া তাও মোটামুটি শুনেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক এই যে, আপনি আপনার যন্ত্র দিয়ে তার সেফ কেটে চুরি করেছেন।"

অতুল বোস ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, "Silly! Of all preposterous things, এমন খেয়াল আপনাদের মাথায় এল কেমন করে?"

গম্ভীরভাবে নির্মল বললে, "আপনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন?"

"শুধু অস্বীকার করি না, I consider it the most lunatic suggestion in or out of Bedlam."

"আপনার যন্ত্রটা ঐ ব্যাঙ্কের সেফ-কাস্টডিতে ছিল?"

"সম্ভব। আমার সঙ্গে টাকা ছিল না বলে সিঙ্গাপুরে ফেলে এসেছিলাম। সেখান থেকে রায়বাহাদুর সেটা আনাবার ব্যবস্থা করবেন কথা ছিল।"

"আনা যে হয়েছিল তা আপনি জানেন না?"

"না। আমি তার আগেই পশ্চিমে গিয়েছিলাম আর-একটা যন্ত্র আমার সঙ্গে ছিল তাই নিয়ে। ওটা এদেশে তৈরি করবার একটা প্রকাণ্ড কারখানা করব মনে করে টাকা তুলবার চেষ্টায়ও গিয়েছিলাম।"

"রায়বাহাদুরের একটি মোসাহেব আছে—গোকুল, তাকে চেনেন?"

"বিলক্ষণ চিনি। সে তো বলেছিল যে রায়বাহাদুরের কাছে কারখানার জন্য মোটা টাকা আদায় করে দেবে আমাকে। তার জন্য আমি তাকে চিঠি লিখেছি বার বার।"

নির্মল এবারে একটু চিন্তিত হল। সে বললে, "আপনি তাহলে বলতে চান যে আপনি এই steel cutter আবিষ্কার করে নিজেই কারখানা করে এটা তৈরি করবেন বলে দেশে এসেছিলেন। সিঙ্গাপুরে এ যন্ত্রটা রেখে এসেছিলেন—সেখান থেকে গোকুলের মারফৎ রায়বাহাদুরকে দিয়ে ওটা আনান। ওটাকে সেফ-কাস্টডি ব্যাঙ্কে পাঠাবার ব্যবস্থা তাঁরাই করেন। আপনি ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানেন না।"

"ঠিক।"

"কিন্তু আপনার ও যন্ত্রের ব্যবহার কেউ জানলে কি করে।"

"কেন? আমার আর-এক সেট যে যন্ত্র ছিল তা দিয়ে অনেককে এর ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছি। রায়বাহাদুরের বাড়িতেই দিয়েছি একদিন।"

"কিন্তু এই যদি আপনার মতলব ছিল, তবে আপনি এটার পেটেন্টের দরখাস্ত করেননি কেন?"

"দরখাস্ত! আমি ওর পেটেন্ট নিয়েছি আমেরিকায়। আর এখানে দরখাস্ত করবার জন্য সব specification দিয়ে পেটেন্ট এজেন্সি গডফ্রি কোম্পানিকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছি। তারা কেবল সামান্য কিছু ফি'র টাকা নিয়ে গোলমাল করে এতদিন ফেলে রেখেছে।"

নির্মলের কপাল ঘেমে উঠল। সে বললে, "তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

তাঁকে নিয়ে গডফ্রি কোম্পানির আফিসে গিয়ে নির্মল দেখল অতুল বোসের কথা সত্য। অনেকদিন আগে তিনি গডফ্রি কোম্পানিতে দরখাস্ত করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। তারপর অতুল বোসের বাড়ি গিয়ে তাঁর চিঠিপত্রের ফাইল থেকে সিঙ্গাপুরের ছজ্জুরাম কোম্পানির চিঠি, আমেরিকার পেটেন্ট প্রভৃতি সব দেখে শুনে স্থির জেনে এল যে, অতুল বোস সম্পূর্ণ নির্দোষ।

"মাপ করবেন মিঃ বোস, আপনাকে অযথা কষ্ট দিয়েছি আমি।—আর-একজনকে আমি ভুল করে কষ্ট দিয়েছি, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দেব। সে এখানকার এম. এস-সি. কিন্তু আপনার যন্ত্র সম্বন্ধে আপনার বিনা উপদেশে সমস্ত কথা এমন স্পষ্ট করে বুঝেছে সে যে শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন। সে নিজেই একদিন ঐ যন্ত্রের demonstration দিয়েছে।"

"Really! তাহলে সে লোকটি তো ভালো দেখছি। কোথায় সে?"

"তাকে আর আপনাকে আজ একসঙ্গে খালাস করিয়ে দেব। তখনই আপনি তার পরিচয় পাবেন। যদি পারেন তবে তাকে আপনি আপনার অ্যাসিস্টান্ট করে নেবেন।"

"বেশ! বেশ! কাজের লোক যদি হয় নিশ্চয় করব।"

* * * *

ব্যাপারটা মামলায় যা প্রকাশ হল সে এই ঃ

রায়বাহাদুরের আশ্রিত একজন আত্মীয় লোক ছিল, তাকে সবাই বলত ছোটবাবু। লেখাপড়া সে বেশিদিন করেনি, কিন্তু কল-কব্জা সে বুঝত বেশ। রায়বাহাদুরের

মোটর মেরামত থেকে রেডিও মেরামত সবই সে করত। কিন্তু লোকটা ছিল বিষম অলস ও দুশ্চরিত্র।

অতুল বোস যখন আমেরিকা থেকে এসে তাঁর যন্ত্র দেখান তখন ছোটবাবু কৌতূহলী হয়ে সেটা দেখেছিল আর তখনি তার মাথায় খেলেছিল একটা বড় ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুম লুঠ করবার কল্পনা। নবীনের সঙ্গে পরামর্শ করে সে ব্যাঙ্কগুলোয় ঘোরাফেরা করতে লাগল।

একদিন সর্বতোষবাবুর বাড়িতে সে গিয়েছিল। সর্বতোষ সেদিন তাঁর অভ্যাসমতো তাঁর খাতা খুলে তাঁর সব কীর্তির কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে সেফ-ডিপজিট-ব্যাঙ্কের নাম শুনে ছোটবাবু সেইদিনই হাত চালিয়ে খাতাখানা সরিয়েছিল। তারপর দরকারি প্ল্যানগুলো খুলে নিয়ে খাতাখানা চালান করেছিল গোকুলের মারফৎ সৃষ্টিধরের কাছে।

আগে থেকেই নবীন তাকে বলে রেখেছিল যে, তাদের দেশে যে কেল্লা আছে সেখানে মাল রাখলে কেউ জানতে পারবে না। প্ল্যান পরীক্ষা করে ছোটবাবু একটা অদৃশ্য স্থানে সামান্য একটা সিঁধ কেটে স্ট্রং-রুমের দুই দেয়ালের ফাঁকে প্রবেশ করে কেমন করে ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তার মতো আর-দশজনকে পথ নাই দেখালাম।

* * * *

আসামিদের বিচার হয়ে যাবার পর সৃষ্টিধর, অতুল বোসের কারখানায় বেশ ভালো কাজ পেল।

Collect More Books >
From Here


চিত্রমন্তার মন্দির
শ্রী অখিল নিয়োগী
ছায়া কালো কালো
হারানো বই
শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
ডি.লিট.